বুনো হাঁসের পালক

সমরেশ মজুমদার

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

রমাপ্রসাদ বণিক
স্নেহাস্পদেষু

বুনো হাঁসের পালক

বাথটবের ঈষৎ উষ্ণ জল এখন ফোমে ভর্তি। হরিশ মল্লিক তার তলায় শুয়ে। চারধারে ঝক্‌ঝকে আলো। পায়ের দিকের দেওয়াল জুড়ে আয়না। সেখানেও হরিশের মুখ।

ব্যাপারটা হরিশের কাছে নতুন নয়। কিন্তু পাইনউড হোটেলের বাথটবে শুয়ে এই মুহূর্তে তার মনে হল জীবনে এত আরাম সে কখনও পায়নি। নরম-গরম জল প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে ওই বোধটি সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সে চোখ বন্ধ করে পড়েছিল অনেকক্ষণ। এই সময় টেলিফোন বাজল। ছোট তোয়ালেটা রিসি-ভারের ওপর ফেলে সেটাকে কানে নিয়ে এসে হরিশ বলল, 'হ্যালো!'

'স্যার, এভরিথিং অল রাইট। আপনি আর আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিন।'

'কটা বাজে?'

'আটটা। লোকাল নিউজ পেপাররা সবাই আসছে, ক্যালকাটা দিল্লি বোম্বাই-এর প্রতিনিধিরা আসছেন। এছাড়া শহরের সব ভি. আই. পি.।'

'গুড। অনন্ত, কলকাতায় গিয়ে আমি পার্টি দেব। এখানে এসব করার কোন মানে নেই বলে তোমরা ভেবেছিলে। তবু আমি খরচ করছি। কেন, জানো?'

'জানি স্যার। আপনি পাহাড় থেকে নামবার পরেই একটা আনন্দ করতে চান।'

'গুড। আমি ইউনিটের সবার সঙ্গে আনন্দটা শেয়ার করতে চাই। কলকাতায় যে পার্টি হবে সেখানে প্রোডাকশন বয়দের ডাকতে পারব না। কিন্তু কলকাতায় না পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা সবাই এক ফ্যামিলির লোক, তাই না?' হরিশ জবাবের অপেক্ষা না করে রিসিভার ঝুলিয়ে রাখল। তারপর মাথায় জল ঢালল সে। ভেজা চুলে আয়নায় নিজেকে দেখল, পৃথিবীর সব চেয়ে সুখী মানুষের মুখ। যাকে বলে অসাধ্য সাধন করেছে সে।

প্রথম দুটো ছবি চলেছিল যেমন বাংলা ছবি চলে। শরৎচন্দ্রীয় গল্প ভেঙে আজও বাংলা ছবি তৈরি হয় দর্শক ধরবার জন্যে। তৃতীয় ছবিটিও একই ধারায় হত, কিন্তু হঠাৎ গল্প হাতে এসে গেল। প্রায় গানস অফ নাভারোন গোছের গল্প। মানস সরোবরের তলায় লামাদের লুকিয়ে রাখা সোনা হীরে রত্ন উদ্ধারের একটা অভিযানের টান-টান কাহিনী। বাংলায় অভিযানের ছবি হয় না। হিন্দীতেও। ভাল গল্পই নেই ও বিষয়ে। একমাত্র বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড় ছাড়া। তা সে-গল্প ছবিতে আনার ব্যাপারে অনেক ঝামেলা।

হরিশ মল্লিক পুরো একটা দিন সময় নিয়েছিল মন ঠিক করতে। গল্পটি যদি ঠিকঠাক তোলা যায় তাহলে বক্স অফিসের সব রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে। টাকার গন্ধ পেলেই শরীর আনচান করে ওঠে। হরিশ গন্ধটা পেল। কিন্তু মানস সরোবরে স্যুটিং করতে ভারত সরকার এবং চীনা সরকারের অনুমতি চাই। আকাশকুসুম শব্দটাও ওই অনুমতি পাওয়ার চেয়ে কাছাকাছি।

খবরটা ফাঁস হয়ে যাওয়ামাত্র ইন্ডাস্ট্রি জুড়ে হাসাহাসি শুরু হয়ে গেল। পাগল ছাড়া কেউ এই রকম ছবির কথা ভাবে না। আত্মীয় বন্ধুরা তো দূরের কথা হরিশের স্ত্রী শিবানী পর্যন্ত বাধা দিতে লাগল। আর তত জেদ বাড়তে লাগল হরিশের। সে অসম্ভবকে সম্ভব করবেই। মানস সরোবর না পাওয়া গেলে একটা বিকল্প কিছু খুঁজে বের করতেই হবে।

এইচ এম প্রোডাকশনের প্রথম দুটো ছবির পরিচালক অনন্ত সেনের বয়স হয়েছে এবং হাতে গোটা আটেক ছবি। লোকটার খ্যাতি বেড়েছে কারণ সে প্রোডিউ-সারের টাকা ফিরিয়ে দেয়। হরিশ তৃতীয় ছবির ক্ষেত্রে তাকে বাতিল করল।

বারো থেকে চৌদ্দ হাজার ফুট ওপরে পাহাড় এবং বরফ ভেঙে অভিযাত্রী দল মানস সরোবরে নানান রোমাঞ্চকর ঘটনার মধ্যে দিয়ে রত্ন উদ্ধার করতে যাবে। এমন কাহিনীর পরিচালককে হতে হবে উচ্চাভিলাষী, কর্মঠ, যুবক এবং ইমাজিনেটিভ। বাংলা ছবির বস্তাপচা ফর্মুলা ভুলে যেতে হবে তাকে। অনন্ত সেনদের কর্ম নয়। হরিশ নাস্তানাবুদ হল পরিচালক খুঁজে বের করতে।

উত্তমকুমার মারা যাওয়ার পর একটা নায়ক পাওয়া যায় না, একটা মেয়ে নেই যাকে নায়িকা ভাবা যায় এবং একজন তরুণ পরিচালক টালিগঞ্জে খুঁজে পাওয়া যায় না, যার ওপর আস্থা রাখা যায়। ফেস্টিভ্যাল ফিল্ম করিয়েদের দিয়ে সাধারণ মানুষের জন্যে ছবি করানো যায় না, আবার সিঁথির সিঁদুর মার্কা পরিচালকদের দিয়ে এই ছবির কাজ করানোর কথা ভাবা অসম্ভব। কেউ কেউ বলেছিল, 'পঁচিশ

লাখ খরচ করছ, ছবিটা হিন্দীতে করাও।' কিন্তু ফাঁদে পা দেয়নি হরিশ। কলকাতায় বসে হিন্দী ছবি তৈরি করে সর্বভারতীয় রিলিজ অসম্ভব। সার্কিটেই বিক্রি হবে না! তাছাড়া এই ছবি করতে হবে এক লটে। পুরো টিম বেরিয়ে যাবে মাস তিনেকের জন্যে। ছবি শেষ করে ফিরবে। কোন বোম্বের অভিনেতা তাকে এত সময় দেবে না।

প্রায় হাল ছেড়ে দেবার অবস্থায় বসন্ত সোমের সঙ্গে পরিচয় হল হরিশের। এক সকালে আর্য গুপ্ত তাকে ফোনে বলল বিকেলে রক্সিতে আসতে। আর্য একটি দামী পত্রিকার সিনেমা সম্পাদক। রক্সিতে পুনা থেকে পাশ করা বসন্ত সোমের ডকুমেন্টারি ছবি দেখতে যাবে সে। ডকুমেন্টারী ছবি যারা তৈরি করে তাদের সম্পর্কে খুব পরিষ্কার ধারণা ছিল না হরিশের। কিন্তু ছবিটি দেখার পর সে সোজা হয়ে বসল। দীর্ঘকাল সমুদ্রে নৌকোয় বাস না করলে এমন ছবি তৈরি করা অসম্ভব।

ছবি দেখার পর ওরা তিনজন একটা হোটেলে বসেছিল। হরিশ চুপচাপ শুনেছিল আর আর্য বসন্তকে ছবির ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিচ্ছিল। যে ছবি ভাল লাগে তাতে সামান্য খুঁতও সহ্য করতে পারে না আর্য। বেচারা বসন্ত ভীষণ মুষড়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত কথা বলেছিল হরিশ, 'এখন কি ছবি করছেন ?' বসন্ত ম্লান হেসে-ছিল, 'এক বন্ধুর টাকায় এই ডকুমেন্টারি করেছিলাম। তাও তো দেড় বছর হয়ে গেল। তারপর দরজায় দরজায় একটা ছবির জন্যে ঘুরে মরছি। নতুন পরিচালককে কেউ পাত্তাই দিতে চায় না। আমার সামনে কোন ভবিষ্যৎ নেই এই মুহূর্তে।'

'কি করবেন ?' হরিশ ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'আমৃত্যু লড়ে যাব। আমি হাল ছেড়ে দেব না।'

'গুড!' হরিশ হেসেছিল, 'আপনি কাল সকালে আমার বাড়িতে আসুন। আমি একটা লড়াই করব বলে তৈরি হচ্ছি। এ ব্যাপারে একজন লড়াকু পরিচালক খুঁজছি। আসুন, কথা বলব।'

তোয়ালে টেনে নিয়ে বাথটব ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হরিশ। পায়ের তলায় কার্পেট। অতএব ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই। অবশ্য গত তিন মাসে যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে সে এবং তার ইউনিটের কেউ জীবনে ঠাণ্ডাকে ভয় পাবে না। জিরো ডিগ্রীর নিচেও তাদের কাটাতে হয়েছে অনেকদিন। দিনের পর দিন শুধু দুবেলা টিন-ফুড খেতে

হয়েছে। গায়ের চামড়ায় ঠান্ডার আঁচড় চমৎকার বসানো। তার ওপর আছে নানা-রকম এ্যালার্জি। আয়নায় নিজেকে দেখে কিন্তু মন খারাপ হল না হরিশের। দিন দশেক পরিচর্যা করলে ঠিক হয়ে যাবে চামড়া। কিন্তু তিনজন প্রোডাকশন বয়ের ফ্রস্টবাইট হয়েছে। তাদের সাততাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কলকাতায়। পুরোন দিনের অভিনেতা হিরণ্য বসুর বুকে ঠান্ডা বসে গিয়েছিল। কোনমতে কাজ শেষ করে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার দিন দশেক পরে ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন। এসব খবর ওরা ক্যাম্পে বসেই পেয়েছিল। মন খারাপ হলেও কিছু করার ছিল না। ইউনিটের প্রত্যেকের রোখ চেপে গিয়েছিল যে করেই হোক ভালভাবে কাজ শেষ করতে হবে। এই স্পিরিটটা না থাকলে ছবি শেষ হত না। বাঙালী ছেলেমেয়েরা অভিজ্ঞতা ছাড়াই অত ওপরে বরফের মধ্যে কাজ করতে চাইবে—কে কবে শুনেছে।

চুল মুছতে মুছতে হরিশ আয়নার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওয়েল, আই অ্যাম গ্রেটফুল টু বসন্ত।' কিন্তু বসন্তকে নির্বাচন করেছিল কে? এই শর্মাই তো। ইন্ডাস্ট্রির সবাই বলেছিল এত বড় ছবির ভার ওরকম নিউকামারকে দেওয়া শুধু পাগলামি নয়, আত্মহত্যার সমান। কথাগুলো বসন্তকে শোনালে সে জবাব দিয়েছিল, আমি কাজ করে এর উত্তর দেব দাদা। আপনি যে সুযোগ দিয়েছেন তার জন্যে সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। আমাকে প্রমাণ করতেই হবে নিজের দাম কতটা।

শুধু বসন্ত নয়, চিত্রনাট্যকার স্বরূপ ঘোষকে নিয়ে দুবার এসেছিল সে লোকেশন দেখতে। এ অঞ্চলে সরোবর নয় কিন্তু পাহাড়ের ভেতর একটা জলাশয় রয়েছে। পায়ে হেঁটে নয়, যতটা জীপ যায় ততটা গিয়ে শেরপাদের কাছে খবর নিয়ে একটা ম্যাপ তৈরি করা হয়েছিল। সেই বুঝে চিত্রনাট্য। এবার স্যুটিং-এ এসে অনেকটা মিল পেলেও পরিস্থিতি অনুযায়ী চিত্রনাট্যের পরিবর্তন করেছে বসন্ত। কোন ব্যাপারে বাধা দেয়নি হরিশ। একজন পরিচালককে তার কাজের জায়গায় কখনই বিরক্ত করা উচিত নয়। কিন্তু বসন্ত তার সঙ্গে প্রতি রাত্রে আলোচনা করত পরের দিনের স্যুটিং সম্পর্কে। ছেলেটি সত্যি ভাল।

•

শোওয়ার ঘরে এল হরিশ। খুব তাজা লাগছে এখন। কদ্দিন পরে স্নান। আজ ভোরে এখানে পৌঁছেই তাকে ছুটতে হয়েছিল এয়ারপোর্ট। পুরো ছবির এক্সপোজড্ র-স্টক ম্যাড্রাসে পাঠানোর ব্যবস্থা করে আসতে হল। এখান থেকে কোন ফ্লাইট সরাসরি ম্যাড্রাস যায় না। কিন্তু প্রসাদ ল্যাবরেটরির সঙ্গে তার ব্যবস্থা করা আছে। এয়ারপোর্ট পাল্টে পাল্টে যাতে কালই পৌঁছে যায় তার

জন্যে যোগাযোগ করতে হয়েছে। ওই ক্যানগুলো স্টিলের ট্রাঙ্কে ভরে এমন ভাবে পাঠাতে হয়েছে যাতে কর্মচারীরা খারাপ ভাবে ফেলে দিলেও ক্ষতি হবে না কিছু। এটি এখন তার প্রাণ। এই পাহাড়ি আবহাওয়ায় কদিন রাখলে অবশ্য ক্ষতি হত না তেমন, কিন্তু এক্সপোজড মাল যত তাড়াতাড়ি ল্যাবে পাঠানো যায় তত ভাল। চুল আঁচড়ে নিল হরিশ। সাড়ে আটটা বাজতে এখনও মিনিট কুড়ি দেরি। হরিশ মনে মনে স্থির করল আজ একটা ঘোষণা করবে। যদি ছবি হিট করে তাহলে ইউনিটের প্রত্যেকের সারাজীবনের চিকিৎসার দায়িত্ব নেবে সে। এতে ওদের উপকার যেমন করা হবে তেমনি একটা মহান মহান ভাবও দেখানো যাবে।

পঁচিশ লক্ষ টাকা। নিজের সারা জীবনের সঞ্চয়, এমন কি বাড়িটা বন্ধক রেখে টাকাটার ব্যবস্থা করেছে সে। কোন ফিনান্সারের কাছে হাত পাতেনি। শিবানীও ব্যাপারটা জানে না। আজ সে সফল। কোন ঝুঁকি নেয়নি বসন্ত। প্রতিটি শট অন্তত চারবার নেওয়া আছে। সেই সব এতক্ষণে পেঁছে গেছে ম্যাড্রাস। কাল সকালেই সেই প্রাণ-ভোমরা যাবে ল্যাবে।

সুটকেশ খুলে অনেকদিন বাদে একটা ভাল সুট বের করল হরিশ। পাহাড়ে তো এক বস্ত্রে থাকতে হত। হিরো অরিন্দম আর হিরোইন কল্পনা জিনসের ওপরেই ছিল। ওরা তবু আজ দুপুরে স্নান করতে পেরেছে। তার তো সারা দিন এয়ারপোর্ট যাতায়াতেই গেল। প্যান্টটা নামিয়ে হরিশ বুঝল কোমর সরু হয়েছে। না হবার কোন কারণ নেই। শেষ পনের দিনে তো সভাজগতের সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না। নিচ থেকে সবজি চাল আর মাংস কিনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা তো অবশিষ্ট ছিল না। টিন-ফুডে আর কত পেট ভরে ?

বসন্ত ইউনিটটা তৈরি করেছিল খুব ভেবেচিন্তে। সার্টটা গলিয়ে নিয়ে শিস দিল হরিশ। এ যেন ডেভিড নিভেনের ইউনিট। কোন্ টাই পরা যায় ? চওড়াটা বেছে নিয়ে টিভি চালিয়ে দিল সে। চমৎকার গান হচ্ছে তো। বুঝতে সময় লাগল ওটা খাসি ভাষা। সুর অবিকল ইংরেজির। গাইবার ভঙ্গিটাও। ছেলেটিকে মাইকেল জ্যাকসন খুব প্রভাবিত করেছে।

বসন্তের ইউনিটের ক্যামেরাম্যান পুনের ছেলে। অন্তত গোটা দশেক শট নিয়েছে জীবন বিপন্ন করে। ক্যামেরা ইউনিট, আলো, প্রোডাকশন বয় থেকে আরম্ভ করে জেনারেটার বয় পর্যন্ত লড়াকু ছেলে, বসন্ত মেপে মেপে তৈরি করেছিল ইউনিট। না হলে হতো না কাজটা। মুস্কিল হল অভিনেতা অভিনেত্রী নির্বাচন করা নিয়ে। বসন্ত চেয়েছিল পুনে এবং গ্রুপ থিয়েটারের ছেলেমেয়েকে

নিয়ে কাজ করবে। ওই একবারই ওকে মনে করিয়ে দিতে হয়েছিল হরিশকে সে ফেস্টিভ্যালে পাঠাবার জন্যে ছবি তৈরি করছে না। তেমন ভূমিকায় ওদের নিতে তার আপত্তি নেই কিন্তু প্রথম সারির চরিত্রগুলোয় কিছু স্টার রাখতেই হবে।

উত্তমবাবু চলে যাওয়ার পর বাংলার কোন অভিনেতার নামে টিকিট বিক্রি না হলেও কিছু করার নেই। এই বাছাই পর্বটি ভালভাবে চুকে গিয়েছিল অরিন্দম রাজি হতে। কয়েকটি সুপারহিট ছবি আর দুজন বিখ্যাত পরিচালকের কাছে কাজ করে অরিন্দম বেশ নাম করেছে। গ্ল্যামার নেই কিন্তু ও যে ভাল অভিনেতা তা প্রমাণিত। চরিত্রটি শুনে বলেছিল, 'দূর মশাই, এই রোল উজবুক না হলে কেউ ছাড়ে! বরফ টরফ দেখাবেন না! তবে হ্যাঁ, লাস্ট শট দেবার আগে যদি মরে যাই খুব আফশোস করব স্বর্গে গিয়ে। সেটুকু দেখবেন।'

সব ছবির ডেট বাতিল করে ও দলে এল। হিরোইন কল্পনা কয়েকটা টিভি সিরিয়াল করে নাম করেছিল। যাদবপুরের মেয়ে। অরিন্দম বরফের ওপরে থাকতে হবে বলে কিন্তু কিন্তু করেছিল প্রথমে। কিন্তু হোয়ার ঈগলস ডেয়ার ছবিটি দেখে এসে রাজি হয়ে গেল। হিরণ্য বসু আর দীপক সেনকে রাজি করাতে খুব ঝামেলা হয়েছিল। কিন্তু বৃদ্ধের ভূমিকায় ওদের ছাড়া ভাবতে পারা যায়নি। যে টাকা দিয়েছে হরিশ তা ওঁরা সারা জীবনে কোন ছবিতে পাননি। ভিলেন করেছে গ্রুপ থিয়েটারের ছেলে। ছোকরার খুব নাম হবে। হাটে বাজারে ছবির পর অজিতেশবাবুর নাম যেমন বহুগুণ প্রচারিত হয় এরও তাই হবে।

পঁচিশ লাখ টাকা তিন মাসে ফুরুত! কিন্তু আসবে কত? মহাত্মারা বলেন কোন্ ফিল্ম হিট করবে তা নাকি আগাম বলা যায় না। কিন্তু এই গল্প, এই মাউন্টিং, এই অভিনয় দেখে নিশ্চিন্তে বলা যায় কোটি ছাড়িয়ে যাবে হিসেবটা। সমস্ত শরীর গরম হয়ে গেল। মদ কিংবা সিগারেট ছোঁয় না হরিশ। মেয়েমানুষের নেশাও নেই। কেউ কেউ বলে ফিল্ম লাইনে এই রকম মানুষই টাকা রাখতে পারে। হরিশ হাসল, দেখা যাক!

তবে হ্যাঁ, কোন কার্পণ্য করেনি সে। বসন্ত চেয়েছিল ইউনিটটা বড় না করতে। শিল্পী এবং টেকনিক্যাল হ্যান্ডস্ ছাড়া কলকাতা থেকে কাউকে না নিয়ে আসতে। প্রোডাকশন বয় কুলি, ঠাকুর চাকরদের এই শহর থেকে নিয়োগ করতে বলেছিল। কিন্তু প্রোডাকশন ম্যানেজার অনন্ত কোন ঝুঁকি নিতে চায়নি। কলকাতা ছেড়েছিল সাতচল্লিশ জনের ইউনিট। আর এই শহর থেকে যখন যাত্রা করেছিল তারা তখন দলটা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল পঁয়ষট্টিতে। কুড়িটা তাঁবু, প্রত্যেকের

জন্যে স্লিপিং ব্যাগ, গোটা দশেক খচ্চর, তিনটে জেনারেটার, প্রচুর কেরোসিন তেল থেকে শুরু করে ওই পান্ডববর্জিত বরফের দেশে প্রত্যেককে যতখানি আরামে রাখা সম্ভব ততখানির জন্যে যা জিনিসপত্র দরকার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে দুজন ডাক্তার আর প্রচুর ওষুধপত্র। ইট্স এ রেকর্ড। কোন বাংলা ছবির স্যুটিং-এ এই আয়োজন করা হয়নি।

হ্যাঁ, কষ্ট হয়েছে প্রচুর। পাহাড় ভাঙা, ঠিকমত খেতে না পাওয়া, পেটের গোলমাল থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়তে হয়েছে অনেকবার। সব চেয়ে খারাপ লাগত বিকেল ফুরিয়ে গেলেই। একটা লম্বা রাত তাঁবুর মধ্যে বসে থাকা যে কি যন্ত্রণার তা ইউনিটের সবাই বুঝেছে। রান্না আর খাওয়া-দাওয়ার কাজের জন্যে জেনারেটার চালানো হত না। বসন্ত চেয়েছিল সেটা স্যুটিং-এর জন্যেই রেখে দিতে। সূর্যের আলোর ওপর নির্ভর করে সারাদিন স্যুটিং করা কখনই যায় না। অনন্ত গ্যাস পাইপের ব্যবস্থা করেছিল। শেষের দিকে তাও ফুরিয়ে এসে-ছিল।

দুটো তাঁবুতে একলা থাকত হরিশ আর অরিন্দম। বাকিরা মিলে মিশে। দল যেমন এগিয়ে যেত তেমনি সংসার তুলে নিয়ে নতুন করে পাতা হত। মেয়েদের তাঁবু ছিল একটাই। এই ছবিতে দুটি নারী চরিত্র। কল্পনার সঙ্গে থাকত নীতা।

বাঙালী যে কটি মেয়ে বোম্বেতে নাম করেছে পার্শ্বচরিত্রে নীতা তাদের একজন। ভাল নাচতে পারে, ভ্যাম্প চরিত্রে মাঝে মাঝে সুযোগ পায়। মেয়েটার আদলে পাহাড়ি ছাপ আছে। লম্বা ছিপছিপে। বসন্ত একেই নির্বাচিত করেছিল। ভাল একটা চরিত্রের জন্যে যে মেয়ে বোম্বেতে হাপিত্যেশ করছিল সে তো প্রস্তাবটা লুফে নেবেই। কিন্তু তারপরেই বায়নাক্কা করেছিল সে সঙ্গে হেয়ার ড্রেসার এবং এসকর্ট নেবে। অনেক বোঝানোর পর মেয়েটা রাজি হয়েছিল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি লোকেশনে পৌঁছানোর পর অনন্তকে উত্ত্যক্ত করেছিল সব চেয়ে বেশি ওই নীতা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা নায়িকা কল্পনা যা চায়নি ভ্যাম্পের চরিত্রে অভিনয় করতে এসে নীতা তাই দাবি করেছিল।

খাওয়া, পোশাক থেকে শুরু করে ফাইভ স্টার হোটেলের কমফর্ট চৌদ্দ হাজার ফুট ওপরে যে চেয়ে বসে তার মাথা কতখানি সুস্থ তাতে সন্দেহ হয়েছিল হরিশের। তখন অরিন্দম দায়িত্ব নিয়েছিল নীতাকে সামলাবার। নীতা ঠান্ডা হয়ে-ছিল। কিন্তু ইউনিটে একটা চাপা হাসি চলত প্রায়ই। প্রায় রাত্রেই কল্পনাকে একা থাকতে হয় তাঁবুতে। অরিন্দম এবং নীতা নাকি গল্প না করতে পারলে রাত কাটে

না। বসন্ত খুব চটে গিয়েছিল। হরিশ ওকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে। তাদের কাজ স্যুটিং শেষ করা। সন্ধ্যের পর কেউ কি করছে তা দেখার দরকার নেই যতক্ষণ না সেই কাজের কারণে পরের দিনের স্যুটিং-এ ব্যাঘাত হচ্ছে। এখানে যারা এসেছে তারা কেউ নাবালক নয়। শুধু কল্পনা বলেছিল, 'হরিশদা, ফিল্ম করছে বলে কি রুচিটাকেও বিসর্জন দিতে হবে ? ভাবলেই সব গা গুলিয়ে ওঠে।'

যাক, ওসব পাট এখন চুকেছে। আগামীকালই পুরো ইউনিট রওনা হবে কলকাতায়। নীতা চলে যাবে বোম্বে। ডাবিং-এর সময় দেখা হবে। বসন্ত পুরো এডিটিং ডাবিং ম্যাড্রাসেই করতে চায়। টেকনিক্যালি ছবিটা চমৎকার না হলে মুস্কিল। একটা পিন পড়ার শব্দও দর্শকের কানে পৌঁছে দিতে হবে।

দরজায় নক্ হল। জুতো পরা হয়নি হরিশের। তবু এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল সে, খুলেই কপালে ভাঁজ ফেলল। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে নীতা বলল, 'ওমা, তুমি তৈরি হওনি ?'

'হচ্ছি, কি ব্যাপার ?'

'বাঃ, দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলব ? একটু ভেতরে যেতে দাও।' বলতে বলতে নীতা ঘরে ঢুকে পড়ল। হরিশ বুঝতে পারে না ফিল্মের মেয়েরা আলাপের পরদিনই কি করে স্বচ্ছন্দে তুমি বলতে শুরু করে। বাপের বয়সী মানুষকেও তুমি বলতে শুনেছে সে।

আয়নায় নিজেকে দেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে নীতা বলল, 'আমাকে কমপেনসেশন দিতে হবে।'

'কেন ? কি হয়েছে ?'

'সমস্ত গায়ে ইরাপশন। স্নান না করে করে। এর পর বোম্বেতে গিয়ে যখন জামা খুলতে হবে তখন আমি কাজ পাব ? অমন করে দেখছ কেন ? বিশ্বাস হচ্ছে না ?'

'না-না ঠিক আছে। এ তো সবারই হয়েছে। দিন সাতেকের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।'

'সাতদিন আমি বেকার থাকব ?'

হতাশ গলায় হরিশ বলল, 'দ্যাখো ওটা তোমার কি কারণে হয়েছে আমি জানি না। তবু বলছ যখন তখন কিছু বাড়িয়ে দেব। তবে দয়া করে কথাটা আর কাউকে বল না।'

চোখ বন্ধ, ঠোঁটে হাসি, মাথা নেড়ে নীরবে না বলল নীতা। তারপর চোখ

খুলে বলল, 'তোমার মত বেরসিক লোক আমি কোথাও দেখিনি। ভাগ্যিস অরিন্দম ছিল নইলে ওই বরফে পাগল হয়ে যেতাম। সত্যি বলছি, আগে বুঝতে পারিনি এত কষ্ট হবে। তাহলে রাজিই হতাম না। তবে তুমি মাল বানাবে। দেখো।'

'থ্যাঙ্কস। এবার আমাকে তৈরি হতে দাও নীতা।'

'হও না, কে আটকাচ্ছে। তৈরি হয়ে লেটস গো টুগেদার।'

হরিশ মাথা নাড়ল, 'না, তা পারি না। অরিন্দম কষ্ট পাবে।'

হঠাৎ খিলখিলিয়ে হেসে উঠল নীতা। হাসি থামাতে তার সময় লাগল, 'তুমি একটা—।' জিভে শব্দ করল সে, 'পাহাড়ে যা হয়েছে ওটা একটা খেলা। অরিন্দম ভাল করেই জানে। উই নেভার টাচড্ আওয়ার হার্টস। আমার ওটা এখনও ভার্জিন আছে।'

'বুঝলাম। কিন্তু পার্টিতে যাওয়ার আগে আমার অনেক কাজ আছে। তোমাকে তো সাত দিনের কমপেনসেশন দিচ্ছি। নাউ, কেটে পড়।'

নীতা উঠে কাঁধ নাচাল। কয়েক পা দরজার দিকে এগিয়ে বলল, 'আমাকে কেমন দেখাচ্ছে ?'

'বিউটিফুল।'

'তবু হিরোইনের রোলে ভাবতে পারলে না। তোমার হিরোইন কিন্তু টিঁকবে না। ম্যাক্সিমাম আর দু-তিনটে ছবি। ওরকম সজনেডাঁটা চেহারার হিরোইন টিঁকতে পারে না।' নীতা গট গট করে বেরিয়ে গেল।

বসন্ত এটাই চেয়েছিল। কল্পনার শরীরে লাস্য নেই। কিন্তু মুখখানি ভারী মিষ্টি। ওর তুলনায় নীতার শরীর তো ঝড় তুলবে। কিন্তু বসন্তের ভাবনামত সহানুভূতি পাবে কল্পনা। দর্শক চাইবে অরিন্দম কল্পনাকেই ভালবাসুক। অঙ্কটা যদি মিলে যায় তাহলে কোন চিন্তা নেই। তিনটে ছবিব পরে যদি কল্পনা আউট হয়ে যায় যাক না। তাতে এইচ এম প্রোডাকশনসের কোন ক্ষতি হবে না।

জুতোর ফিতে বাঁধতে যাওয়ার আগে টেলিফোন বাজল। রিসিভার কাঁধে রেখে তোয়ালে চেপে জুতো পরতে পরতে হরিশ জানান দিল, 'হ্যালো।'

'বসন্ত বলছি দাদা।'

'বল।'

'আপনি তৈরি ? আমি ব্যাঙ্কোয়েট হল থেকে কথা বলছি।'

'আর কয়েক মিনিট। সবাই এসে গেছে।'

'প্রায় সবাই। অনন্ত যা কাণ্ড করেছে।'

'কেন ?'

'মিনিস্টারদের পর্যন্ত নেমন্তন্ন করে বসেছে। দুজন ইতিমধ্যে এসে গেছেন।'

'গুড। আমি না যাওয়া পর্যন্ত তুমি অ্যাটেন্ড করো। আর হ্যাঁ, শোন, আমি ওখানে একটা অ্যানাউন্সমেণ্ট করতে চাই। ছবি হিট হলে প্রত্যেকের মেডিক্যাল খরচ আমি দেব।'

'বাঃ চমৎকার দাদা। খুব আনন্দ হল।'

'বাই দ্য বাই, প্রোডাকশনস বয়গুলো ভাল জামাপ্যাণ্ট পরে এসেছে তো ?'

'ভাল মানে, ওরা ওদের সেরাটাই পরেছে। এখানে আসতে পেরে খুব খুশি। নিতাই, যে বড়ুয়া সাহেবের আমল থেকে কাজ করে আসছে, বলছিল এভাবে কোন প্রোডিউসার তাদের মানুষের সম্মান এর আগে দেয়নি। দেরি করবেন না দাদা।'

রিসিভারটা রেখে দিয়ে টিভির দিকে তাকাল হরিশ। শনিবারের সন্ধ্যায় তার প্রথম দুটো ছবি টিভিতে দেখানোর সময় এখনও হয়নি। অথচ শিবানীর খুব ইচ্ছে প্রথম ছবিটা যাতে টিভিতে দেখানো হয় তার ব্যবস্থা করতে। ছবিটা সেকেন্ড রিলিজেও ভাল ব্যবসা করেছে। একবার টিভিতে দেখিয়ে দিলে পাবলিক হলে টিকিট কেটে দেখতে যাবে আর ? ক'টাকা পাওয়া যাবে টিভি থেকে ? ওই যন্ত্র থেকে আপাতত যত দূরে থাকা যায় তত মঙ্গল।

বিদেশী পারফিউমের ওপর হরিশের অনেককালের পক্ষপাতিত্ব। 'পয়েজন'-এর শিশিটা তুলে নিয়ে সযত্নে শরীরে ছিটিয়ে নিল সে। আঃ। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরার সময় একটা বড় স্প্যানেল শেষ হয়েছে গন্ধ ঢাকতে। কিন্তু 'পয়েজন'-এ হাত দেয়নি। এই বস্তু ব্যবহার করা যায় আজকের মত পার্টিতে যাওয়ার সময়। গন্ধটা নাকে এলেই হৃদয় প্রফুল্ল হয়ে যায়।

সার্টের কলার তুলে টাই-এর নটটা বাঁধতে যেতেই ওর দৃষ্টি আবার টিভির ওপর গেল। খবর হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে হরিশের সমস্ত শরীর সাদা হয়ে এল। মাথা ঝিমঝিম, গলা শুকনো এবং বুকের বাঁ দিকে চিনচিনে অনুভূতি। কোনরকমে শরীরটাকে সোফার ওপর ছেড়ে দিয়ে সে ভূতগ্রস্ত ভঙ্গিতে টিভির দিকে তাকিয়ে রইল। পৃথিবীর কোন শব্দ তার মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া তুলছিল না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে হাঁসফাঁস করে উঠল। যেন গভীর জলের তলায় কেউ তাকে ঠেসে ধরেছে। সে প্রাণপণে জলের ওপর নাক তুলে নিঃশ্বাস নিতে চাইছে। টিভিটার দিকে এক পলক তাকিয়ে সে কোনমতে দরজার দিকে টলতে টলতে যাচ্ছিল। তার চিন্তাশক্তি এই মুহূর্তে অকেজো। শুধু একটা জেদ শরীরটাকে বহন করছিল।

দরজা খোলা রেখেই হরিশ টালমাটাল পায়ে দৌড়াচ্ছিল করিডোর দিয়ে।

বিরাট হলঘরের দরজায় পৌঁছাবার আগে তাকে দেখে অনন্ত ছুটে এল, 'কি হয়েছে স্যার, আপনার কি হয়েছে?'

হরিশ কথা বলতে চেষ্টা করল। তার গলা থেকে গোঁ গোঁ আওয়াজ ছিটকে এল। হাঁটু দুটো এবার আচমকা নড়বড়ে হয়ে গেল। অনন্ত তাকে দুহাতে ধরে যখন হলঘরে পৌঁছে চিৎকার করছে তখন জমজমাট পার্টিটা আচমকা নিস্তব্ধ হল। নিমন্ত্রিতরা গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে অবাক হল।

টাই ফাঁসের মত গলায় ঝুলছে। হরিশের মুখে ব্লটিং-এর রঙ। বসন্ত ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছে, 'কি হয়েছে দাদা, এমন করছেন কেন?'

হরিশ কথা বলার চেষ্টা করতে করতে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিল। অনন্ত ছুটে গেল ডাক্তার ডাকতে। দশ আঙুলে বসন্তের শরীর আঁকড়ে ধরে হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল হরিশ।

বসন্ত হতভম্ব। চল্লিশ পেরিয়ে যাওয়া একটি স্বাস্থ্যবান মানুষ এইভাবে যখন কাঁদেন তখন শোকের কারণ ভয়াবহ ধরে নেওয়া উচিত। কে মারা গেল? সে ঝুঁকে হরিশের দুটো কাঁধ ধরে বলল, 'দাদা, এত আপসেট হচ্ছেন কেন? আমাকে বলুন, কি হয়েছে?'

তখন আমন্ত্রিতরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে ওদের ঘিরে। কৌতূহলী মুখে সবাই দেখতে চাইছে হোস্টকে, ছবির প্রযোজককে। কান্নাটা শব্দহীন হলেও হরিশ কথা বলতে পারছিল না। তার গলায় যেন মাংসপিণ্ড উদ্ধত হয়ে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করছিল। এই সময় অনন্ত ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে এসে চিৎকার শুরু করল, 'সরে যান, একটু সরে যান প্লিজ।'

গরুর লেজ নাড়ার মত ভিড়টা একটু দুলে উঠতেই অনন্ত ডাক্তারকে নিয়ে সেঁধিয়ে এল ভেতরে। নাড়ি দেখে, বুকে স্টেথো লাগিয়ে চিন্তিত মুখে ডাক্তার

বললেন, 'ওঁকে ওঁর ঘরে নিয়ে চলুন। মনে হচ্ছে হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে না। কিন্তু বিছানায় শুইয়ে দিন ওঁকে।' ব্যাগ খুলে একটা ছোট কৌটো থেকে ট্যাবলেট বের করে হরিশের মুখে গুঁজে দিয়ে ডাক্তার বললেন, 'কুইক। আপনারা নিয়ে যান, আমি একটা ইঞ্জেকশন নিয়ে চলে আসছি।' বসন্ত, অনন্ত, ভিলেন হরিশকে ধরতে যেতেই অরিন্দম হাত লাগাল। নীতা কপালে ভাঁজ তুলে বলল, 'ইট্স প্রিমিটিভ! স্ট্রেচার নেই এই হোটেলে?'

লোকটা ঘামছে খুব। শার্ট জবজবে হয়ে গেছে এর মধ্যে। ঘরে পৌঁছে ওরা খোলা দরজা এবং টিভি দেখতে পেল। হরিশকে শুইয়ে দিয়ে অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল মাথার কাছে এসে, 'হরিশবাবু, কেমন লাগছে এখন? অনন্ত টিভিটা বন্ধ কর তো ভাই।' টিভিতে তখন সিরিয়াল হচ্ছিল। অনন্ত সেটাকে বন্ধ করতেই হরিশের মুখ থেকে একটি শব্দ ছিটকে এল। অরিন্দম বসন্তের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেসটা কি বলুন তো? তিন মাসে তো এইরকম কিছু হয়নি।'

বসন্ত মাথা নাড়ল। এই উপসর্গগুলো কি স্ট্রোকের পূর্বলক্ষণ? হরিশ মল্লিকের যদি স্ট্রোক হয়ে যায় তাহলেই সর্বনাশ। এখনও অর্ধেক কাজ বাকি ছবির। ম্যাড্রাসে নেগেটিভ তৈরি হয়ে কলকাতায় এলে কাটাকাটি করতে হবে। তারপর ডাবিং, মিক্সিং, রিরেকর্ডিং, মিউজিক বসানো—এন্তার কাজ বাকি। এবং এই কাজগুলো স্যুটিং করার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থের নিয়মিত যোগান না থাকলে মুস্কিলে পড়তে হবে। এই অবস্থায় যদি হরিশ মল্লিক মারা কিংবা স্থবির হয়ে যায় তাহলেই—। বসন্ত ব্যাপারটা ভাবতে পারছিল না। তার এতকালের স্বপ্ন যখন সার্থক হতে যাচ্ছে তখন হরিশের ওদুটোর কোনোটাই হতে পারে না। সে ঘরের অন্য মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই, দয়া করে আপনারা ব্যাঙ্কোয়েট হলে অপেক্ষা করুন।'

নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত হোটেল কর্মীরা মদ পরিবেশন করবে এই আশায় কেউ কেউ সেখানে চলে গেল। হরিশ চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। সদ্য কামানো গালে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তেই ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন, 'কি আশ্চর্য! এত ভিড় কেন? ইউ মাস্ট লিভ হিম।'

যাঁরা ছিলেন তাঁরা সামান্য নড়লেন মাত্র।

ডাক্তার হরিশের কবজি ধরে এক মুহূর্ত থমকে থেকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কেমন লাগছে আপনার?'

হরিশের দুচোখ গড়িয়ে দ্বিতীয়বার জল গড়িয়ে এল। ডাক্তার আর দেরি

করলেন না। ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে অরিন্দমকে বললেন, 'মনে হচ্ছে আচমকা ওঁর নার্ভে কিছু আঘাত করেছে। স্ট্রোক হতে পারত, হয়নি। ঘুমের ওষুধ দিলাম। রাতটা ঘুমিয়ে কাটালে সকালে ফ্রেশ হয়ে যাবেন। চিন্তার কিছু নেই।'

ডাক্তার বেরিয়ে গেলে বসন্ত প্রথম কথা বলল, 'থ্যাঙ্কস গড। মাথা ঘুরে গিয়েছিল আমার।' অনন্ত শায়িত হরিশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম! এরকম কেস তো এর আগে দু-তিনবার দেখেছি। নবীনা ছবি রিলিজ করল মিনার বিজলিতে। সত্য সাহা ছিলেন প্রোডিউসার। ম্যাটিনি ভাঙার পর দর্শকরা যেই গালাগাল দিতে দিতে বের হল অমনি আমাকে আঁকড়ে ধরলেন সত্যবাবু। পাঁচ মিনিটেই সব শেষ।'

কল্পনা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল হরিশের পায়ের কাছে; বলল, 'অনন্তবাবু, এই সব কুকথা না বললেই ভাল হয়। চলুন এখান থেকে। লোকটাকে ঘুমোতে দিন।'

অরিন্দম চিবুকে আঙ্গুল ঘষে যেন নিজের মনেই জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু কি কারণে শক পেলেন ভদ্রলোক? কোন ফোন-টোন এসেছিল কলকাতা থেকে?'

অনন্ত চট করে উঠে টেলিফোন তুলে হোটেল-অপারেটরকে জিজ্ঞাসা করল হরিশের ঘরে কলকাতা থেকে কল এসেছিল কিনা। উত্তর পেয়ে রিসিভার নামিয়ে সেটা জানিয়ে দিল। বসন্ত বলল, 'তিন মাস ধরে পাহাড়ে পরিশ্রম তো কম করেননি উনি। সুখী মানুষ। ভেতরে ভেতরে কাহিল হয়ে পড়েছিলেন সেটা বুঝতে পারেননি। এটা যদি চোদ্দ হাজার ফুট ওপরে হত তাহলে—।'

দরজায় দাঁড়িয়ে নীতা বলল, 'এখন এই ইফ আর বাটগুলো ছাড়ুন তো বসন্ত-বাবু। ওঁকে ঘুমোতে দিন। চলুন পার্টিটাকে বাঁচিয়ে দিই।'

সবাই যখন ঘর ছেড়ে যাচ্ছে তখন হরিশ আবার শব্দ করল। সে উঠে বসার চেষ্টা করতেই কল্পনা ছুটে এল, 'কোন অসুবিধে হচ্ছে হরিশদা।'

হরিশ এই প্রথম সাড়া দিল মাথা নেড়ে, 'না।' তারপর কোনরকমে উচ্চারণ করল, 'জল।'

কল্পনা জল দিতে যাচ্ছিল, অনন্ত নিষেধ করল, 'না না দিদি, জল দেবেন না। স্ট্রোকের আগে জল দিতে নেই।' কল্পনা অসহায়ের মত তাকাতেই শব্দ ছিটকে বেরুল হরিশের গলা থেকে, 'জল, জল!' কল্পনা আর দ্বিধা করল না। সযত্নে খানিকটা জল খাইয়ে দিল হরিশের মাথার পেছনে একটা হাত রেখে। সেটা বুক দিয়ে নামার পর কয়েকবার ঢোক নিলেন হরিশ।

বসন্ত কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগছে এখন দাদা?'

'আমি মরে গেছি বসন্ত, আমি মরে গেছি !' আচমকা বসন্তের ডান হাত দুহাতে জড়িয়ে ধরে কাঁকিয়ে কেঁদে উঠল হরিশ মল্লিক। ওকে কথা বলতে দেখে প্রত্যেকের মুখ থেকেই যেন স্বস্তির শব্দ ছিটকে উঠল।

অরিন্দম দ্রুত বিছানার পাশে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে বলুন তো ?'

মাথাটা বুকের ওপর কিছুটা যেন ঝুলে রইল হরিশের। তারপর একটা কান্না গিলতে গিলতে উচ্চারণ করল, 'আমার সব টাকা শেষ, সব পরিশ্রম, সব স্বপ্ন— ।' কথাটা গিলে নিয়ে মুখ তুলে হরিশ বলল, 'আমি ফতুর হয়ে গেলাম।' বুক কাঁপিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে একটা আঙুল টিভি-র দিকে উঁচিয়ে হরিশ জানাল, 'নিজের কানে শুনলাম।'

অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'কি শুনলেন ?'

'প্লেনটা ভেঙে পড়েছে !'

'প্লেন ?' বসন্ত চট করে টিভিটা দেখে নিল, 'কোন্ প্লেন ?'

'যে প্লেনে আমাদের পুরো ছবির এক্সপোজড্ ক্যান ছিল।' কান্নায় গলা বুজে এল। আর তখনই বসন্ত চিৎকার করে উঠল, 'কি বলছেন আপনি ?' তার চোখের সামনে হোটেলের ঘরটা দুলতে লাগল। সে দুহাত বাড়িয়ে এক পা এগিয়ে সোফায় বসে পড়ল, 'নো। ইট্স ইম্পসিবল !'

ঘরে তখন পিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। অরিন্দম চট করে ঘড়ি দেখে উঠে গিয়ে টিভি খুলল। ইংরেজিতে খবর চলছে। প্রায় শেষ দিকে। খেলার খবর। অরিন্দম মুখ ফিরিয়ে বসন্তকে দেখল। কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে বসন্ত। হরিশ ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল। খবর শেষ করার আগে পাঠক আবার বললেন, 'বিশেষ বিশেষ খবরগুলো আবার শুনুন। আজ দুপুরে শিলং থেকে কলকাতা-গামী বায়ুদূত বিমানটি নিখোঁজ হয়ে যায়। আশঙ্কা করা হচ্ছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যে বিমানটি দিকভ্রষ্ট হয়। পাইলটের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার আগে তিনি বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন। কুড়ি জন যাত্রী এবং ক্রু সমেত বিমানটি হিমালয়ের কোন অংশে ভেঙে পড়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সন্ধানের কাজ চলছে।' টিভি বন্ধ করে অরিন্দম প্রশ্ন করল, 'এই প্লেনে যে আমাদের ছবির এক্সপোজড্ ক্যান যাচ্ছিল তা আপনাদের কে বলল ?'

অনন্ত বলল, 'কথাটা ঠিক। কারণ যে প্লেনটা সকালে কলকাতা থেকে এখানে আসে সেটাই ফিরে যায়। ওটা ছাড়া কলকাতার অন্য কোন ফ্লাইট নেই।'

কল্পনা তখন বসন্তের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, 'আমাদের তিন মাসের পরিশ্রম'

সব জলে চলে গেল ?'

বসন্ত মুখ থেকে হাত সরিয়ে বলল, 'জলে নয় কল্পনা, ছাই হয়ে গেল।'

কল্পনা যেন কিছু বলার জন্যেই বলল, 'একবার খোঁজ নিলে হয় না ?'

'খোঁজ ?' অনন্ত মাথা নাড়ল, 'হরিশবাবু নিজে এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে থেকে প্লেনে তুলে দিয়ে এসেছেন। খোঁজ নিয়ে কি লাভ ?'

অরিন্দম কথাটায় আস্থা রাখল না। রিসিভার তুলে অপারেটরকে বলল, 'এয়ারপোর্ট দিন।' অপারেটর জানাল এয়ারপোর্টের লাইন পাওয়া যাচ্ছে না। আর তখনই একজন দৌড়ে এসে খবর দিল, 'মিনিস্টাররা সবাই এসে গেছেন।'

বসন্ত মুখে হাত দিয়ে বসেছিল! আচমকা চিৎকার করে বলল, 'বন্ধ কর অনুষ্ঠান, সবাইকে বলে দাও চলে যেতে।'

অরিন্দম বলল, 'বসন্তবাবু, উত্তেজিত হবেন না। হরিশবাবুর অবস্থা তো দেখছেন। এখন ঠাণ্ডা মাথায় সমস্ত বিষয়টা ভাবতে হবে।'

'ঠাণ্ডা মাথা ? আপনি তো একথা বলবেনই। আপনারা বছরে দশটা ছবিতে কাজ করেছেন, একটা গেলে ক্ষতি হয না। কিন্তু আমার কাছে এইটে ছিল পরশ-মণির মত। উঃ, এত চেষ্টা—এত পরিশ্রম।' বিড়বিড় করতে লাগল বসন্ত।

অরিন্দম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের অন্যান্যদের মুখ দেখে নিল। তারপর সহজ মুখে হাসল, 'আমি বুঝতে পারছি আপনার এবং হরিশবাবুর অবস্থা। কিন্তু আজ যাঁরা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন তাঁদের সসম্মানে ফিরিয়ে দেওয়া কর্তব্য। তারপর, আমার অনুরোধ, একবার এয়ারপোর্টে গিয়ে খবরটা যাচাই করা।'

'টিভিতে মিথ্যে বলবে কেন ?' অনন্ত জিজ্ঞাসা করল।

'মিথ্যে নয়, আমাদের ক্যানগুলো ওতে ছিল কিনা সেইটে যাচাই করা দরকার। আসুন বসন্তবাবু। মনে হচ্ছে হরিশবাবুর ওপরে ইঞ্জেকশন কাজ শুরু করেছে।'

অরিন্দম বসন্তের হাত ধরতে সে কোনরকমে উঠল। হরিশের চোখ বন্ধ। শরীর স্থির। মাঝে মাঝে বুক কেঁপে উঠছে। সেদিকে তাকিয়ে কল্পনা জিজ্ঞাসা করল, 'হরিশবাবুর জন্যে একজন অ্যাটেণ্ডেণ্টের ব্যবস্থা করা দরকার।'

অনন্ত বলল, 'আমি দেখছি দিদি, ম্যানেজারকে বলছি।'

খবরটা যে এখানেও পেঁছে গেছে তা হলঘরে ঢুকেই বুঝতে পারল ওরা। একজন মিনিস্টার এগিয়ে এসে অরিন্দমকে বললেন, 'খবরটা এই মাত্র পেলাম। ওই প্লেনে যে আপনাদের পুরো ফিল্ম ছিল— । ব্যাড লাক।"

একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কি সমস্ত এক্সপোজড ফিল্ম

এক সঙ্গে পাঠিয়েছেন? না কি পার্ট গেছে?'

'স্যুটিং শেষ হয়ে যাওয়ার পর নিচে নেমে এসে পার্ট পার্ট করে পাঠাবো কেন? আপনারা জানেন না এই তিন মাস কি কষ্ট করে ছবিটা তোলা হয়েছিল। আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যাডভেঞ্চার ছবি হিসেবে এটাকে চিহ্নিত করা হত। বসন্তবাবু দারুণ কাজ করেছিলেন। আমরাও সাধ্যমত অভিনয় করেছি। কিন্তু—।' অরিন্দম এই মুহূর্তে কথা খুঁজে পেল না। আর একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কি ছবির সমস্ত খরচ ক্যান পাঠাবার সময় ইন্সুরেন্স করিয়ে নিয়েছিলেন?'

অরিন্দম মাথা নাড়ল, 'এটা আমার জানা নেই। প্রযোজক স্বয়ং এয়ারপোর্টে গিয়েছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই সেই রকম ব্যবস্থা করেছেন।'

'আপনাদের ক্যান যদি ওই প্লেনে থেকে থাকে তবে ক্ষতির পরিমাণ কত?'

বসন্ত এবার উত্তর দিল, 'পৃথিবীর কোন অর্থে এর মূল্যায়ন করা যাবে না। স্বপ্ন যখন বাস্তবায়িত হয় তখন আপনারা কোন মূল্য ধরবেন? হ্যাঁ, আমার প্রযোজকের কুড়ি পঁচিশ লক্ষ টাকা অলরেডি খরচ হয়েছে। কিন্তু আমাদের ধারণা কোটির উপরে ব্যবসা করত ছবিটা। সেটাও তো হিসেবের মধ্যে আনতে হবে।'

অরিন্দম বলল, 'অতএব ভদ্রমহোদয় এবং মহিলাগণ, আমাদের এই দুঃসময়ে আপনারা পাশে আছেন বলে আমরা কৃতজ্ঞ। আজকের অনুষ্ঠান মাঝপথেই থামিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি বলে দুঃখিত। প্রযোজককে ঘুমের ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে। আমরা এখনই এয়ারপোর্টে যাচ্ছি।'

হোটেল থেকে বের হবার আগে কয়েকবার সিটি অফিসকে টেলিফোনে ধরার চেষ্টা করা হল। কিন্তু রাতের এই সময়ে পাহাড়ি শহরের সিটি অফিস কোন সাড়া দিল না।

পাহাড়ি শহরে সন্ধ্যে থেকেই ঠান্ডা বাড়তে আরম্ভ করে। এখন দশটা। অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা হোটেলেরই। ড্রাইভার ছোকরা বেশ চটপটে। সে দরজা খুলে দিতেই অরিন্দম, বসন্ত পেছনে উঠল। সামনে প্রোডাকশন ম্যানেজার অনন্ত। গাড়িটা যখন সবে স্টার্ট নিয়েছে তখন কল্পনাকে দৌড়ে সিঁড়ি ভাঙতে দেখা গেল। দরজা খুলে পেছনে উঠে সে বলল, 'আমিও যাব।'

অনন্ত মুখ ফিরিয়ে বলল, 'এত রাত্রে দিদি, আপনি!'

'গত তিনমাসে তো কখনও বলেননি একথা অনন্তবাবু। এই ছবিটার সঙ্গে

আমার ভাগ্য জড়িয়ে আছে। সেটা কিরকম তা এয়ারপোর্টে গিয়ে নিজের কানে শুনতে চাই।'

কল্পনা একটু উষ্ণ গলায় বলল। কেউ জবাব না দিতে ড্রাইভার অ্যাক্সিলেটারে চাপ দিল। ঘুমন্ত শহর আরও নিঝুম। টিমটিমে পথের আলোগুলোকে চমৎকার ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। গাড়ি খুব সন্তর্পণে শহর ছাড়ছিল। হঠাৎ অরিন্দম বলল, 'আমি ভাবতে পারছি না। এতদিনের পরিশ্রম এইভাবে ভগবান নষ্ট করে দেবেন?'

অনন্ত মাথা নাড়ল, 'যখন যায় তখন এইভাবেই যায় দাদা। হয়তো ওই প্লেনে বোমা রাখা ছিল। আমাদের তো কয়েকটা ক্যান গিয়েছে, প্লেনে কতগুলো প্রাণ ছিল বলুন তো!'

'স্টপ ইট!' আচমকা চিৎকার করে উঠল বসন্ত, 'প্রাণ গিয়েছে? অনন্তবাবু, অনেক বছর ধরে তো প্রোডাকশন ম্যানেজারি করছেন, বলতে পারেন এত ঝুঁকি নিয়ে কটা বাংলা ছবি তৈরি হয়েছে আজ পর্যন্ত? বলুন!'

'একটাও না স্যার।' সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল অনন্ত।

'দশটা প্রাণ জন্মাল, বড় হল, মারা গেল। পৃথিবীর মানুষের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি তাতে হবে না। কিন্তু এই ছবিটি থাকলে দশ কোটি মানুষ—।' কথা শেষ না করে দুহাতে মুখ ঢাকল বসন্ত।

এরপর অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ। হেডলাইট অন্ধকার কাটছে। সুন্দর রাস্তায় মসৃণ এগোচ্ছে গাড়ি। শীতবস্ত্র থাকা সত্ত্বেও বন্ধ জানলা দিয়েও যেন ঠান্ডা চুঁইয়ে ঢুকছে। তিন মাস অত উঁচুতে বরফের মধ্যে থেকে ঠান্ডার সঙ্গে যে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল এক দিনের হোটেলের আরামে সেটা কেটে গেছে। অরিন্দম ড্রাইভারের দিকে তাকাল। শিস দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। বাঁ দিকে সেই বিশাল লেক অন্ধকার সত্ত্বেও দৃশ্যমান। মুখ ঘোরাতে অনেক পেছনে দুটো হেড লাইট দেখতে পেল সে। ডাইনির চোখ কি একেই বলে?

দেখতে দেখতে অনেক ছবি হয়ে গেল। অথচ কলেজের শেষেও সে জানত বাকি জীবন কাটবে অধ্যাপনা করে। কোথা থেকে কোথায়! না অরিন্দমের উত্তমকুমারের ইমেজ নেই। তার নামে টিকিট বিক্রি হয় না! কিন্তু সে যে অভিনয় করে তা দেখে কেউ হ্যাক থুঃ বলে না। প্রতিটি চরিত্র নিয়ে সে ভাবে।

নায়কের রোমাণ্টিক ইমেজ নষ্ট করার জন্যে সে নিজেই কি দায়ী? মাঝে মাঝে অরিন্দমের তাই মনে হয়। উত্তমবাবুর অভিনয় করার কথা ছিল একটি ছবির দুটি চরিত্রে। বৃদ্ধ জমিদার এবং তার ভৃত। কোন কারণে তাঁর সম্ভব হয়নি কাজটা।

করার। অরিন্দম তখন সবে তিরিশ পেরিয়েছে। বিখ্যাত পরিচালক প্রস্তাবটা দিতেই সে কেঁপে উঠেছিল। এত বড় চরিত্র চ্যালেঞ্জ হিসেবে লুফে নিয়েছিল। ছবি রিলিজ হবার পর প্রতিটি বাঙালী প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল। কিন্তু সেই থেকেই নিজের রোমান্টিক ইমেজের কবর খোঁড়া হয়ে গেল।

না, তার জন্যে এখন চল্লিশে এসে কোন আফশোস নেই অরিন্দমের। ঈশ্বর তার ওপর বারংবার আঘাত হেনেছেন। কিন্তু সে তবু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

হরিশ মল্লিকের এই ছবিটিতে কাজ করতে এসে তার মনে হয়েছিল নিজেকে নতুন করে প্রমাণিত এবং প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে। এখন প্রতিদিন যেসব ছবিতে সে কাজ করে তার বাকি গল্পটাই শোনার ইচ্ছে হয় না। অনেক সময় ছবির নামও মনে থাকে না। কিন্তু এই ছবিটার সঙ্গে সে নিজের অজান্তেই এত গভীর ভাবে জড়িয়ে গেছে যে ফিল্ম নষ্ট হওয়া সহ্য করতে পারছে না। অরিন্দম চোখ বন্ধ করে পেছনে মাথাটা হেলিয়ে দিতেই তীব্র হর্নের শব্দ শুনতে পেল।

পেছনের গাড়িটি প্রায় ঘাড়ের কাছে এসে পেঁৗছেছে। তার হেডলাইটের আলোয় চারপাশ আলোকিত। তাড়াতাড়িতে যাবার তাড়ায় সে সমানে হর্ন বাজিয়ে চলেছে। অরিন্দম ড্রাইভারকে বলল, 'ওকে তুমি সাইড দিচ্ছ না কেন? যেতে দাও ওকে!'

ড্রাইভার বলল, 'রাত্রে এইভাবে ওভারটেক করে যাওয়া বেআইনী। শালা মরবে।'

বলতে বলতে সে গাড়িটি বাঁ পাশে নিয়ে যেতেই পেছনের গাড়িটি উল্কার গতিতে বেরিয়ে গেল। যেটুকু দেখা গেল গাড়িটিতে দুজন বসে আছে। তার একজন নারী।

অরিন্দম কল্পনার দিকে তাকাল। খুব টেনস্‌ড হয়ে বসে রয়েছে। মেয়েটা ভাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী বলে নয়, স্বপ্ন দেখার বয়সে রয়েছে এখনও। বাজারে গুজব অরিন্দমের হাতে কোন নায়িকার নিস্তার নেই। অরিন্দম হাসল। কল্পনা নিশ্চয়ই কথাটাকে সমর্থন করবে না।

বাঁক ঘুরতেই এয়ারপোর্ট দেখতে পেল ওরা। আজ বাইরে আলো দেওয়া হয়েছে। এত রাত্রেও প্রচুর গাড়ি সেখানে। শীতার্ত বাতাস উঠে আসছে হু হু করে নিচের উপত্যকা থেকে। গাড়ির দরজা খুলতেই টের পেল ওরা। অরিন্দম দেখল যে গাড়িটা তাদের ওভারটেক করেছিল সেটা ঠিক তাদের সামনেই পার্ক করা রয়েছে।

ওরা বারান্দায় উঠতেই প্রচুর মানুষ এবং চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতে পেল। উদ্বিগ্ন আত্মীয়স্বজন বন্ধুরা এসেছে নির্দিষ্ট প্লেনটির খবর জানতে। কর্তৃপক্ষ সমানে বলে যাচ্ছেন যে তাঁদের কাছে কোন খবর নেই। সন্ধানী দল এই অন্ধকারেও সার্চ লাইট ফেলে পাহাড়ে পাহাড়ে খুঁজে যাচ্ছে। খবর এলেই তা জানানো হবে। কিন্তু একথায় কেউ শান্ত হতে রাজি নন। একজন বৃদ্ধা মাটিতে বসে মাথা চাপড়ে কেঁদে চলেছেন সমানে।

বসন্ত এসব দেখে বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে তো কোন লাভ নেই।'

ইতিমধ্যে অরিন্দমকে চিনতে পেরেছে বাঙালীদের কেউ কেউ। মুহূর্তে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। অরিন্দম অবাক হয়ে দেখল এই শোক এবং উদ্বেগের সময়েও মানুষের ফিল্মস্টার দেখার প্রবণতা নষ্ট হয়ে যায় না। ওপাশ থেকে কেউ চিৎকার করে উঠল, 'আপনার কেউ ওই প্লেনে ছিল নাকি অরিন্দমবাবু?'

অরিন্দম জবাব না দিয়ে বসন্তকে বলল, 'চলুন ভেতরে গিয়ে খোঁজ নিই।'

নিরাপত্তারক্ষীরাও অরিন্দমের প্রতি জনতার আকর্ষণ লক্ষ্য করছিল। ফলে যে এলাকায় সাধারণের জন্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ সেখানেও অরিন্দমরা প্রবেশাধিকার পেল।'

টেবিলে গোটা তিনেক টেলিফোন নিয়ে কয়েকজন অফিসার অত্যন্ত ব্যস্ত। প্রতি মুহূর্তে অন্যান্য এয়ারপোর্ট থেকে যে খবর আসছে তা নিয়েও পর্যালোচনা চলছে। একজন অফিসার অরিন্দমকে চিনতে পেরে হেসে বললেন, 'বলুন!'

অরিন্দম একবার ভাবল বসন্তের পরিচয়টা দেবে কিনা। কিন্তু মত পাল্টে নমস্কার করে বলল, 'দয়া করে যদি দুটো তথ্য আমাদের দেন তাহলে খুশি হব!'

'বলুন বলুন।'

'এখান থেকে দুপুরে যে প্লেনটি ছেড়েছিল তার খবর পাওয়া যায়নি?'

'এখন পর্যন্ত না। প্লেনটি বাংলাদেশে ঢোকার আগেই ঝড়ের মুখে পড়ে। পাইলট জানিয়েছিলেন ফেরা যাবে না। তিনি আরও উত্তরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তারপর আর কোন যোগাযোগ সম্ভব হয়নি।' অফিসার জানালেন।

'এই অবস্থায় কি আশঙ্কা করা যায়—'

'যায়। আবার যায়ও না। ঘটনাটা ঘটবার পর যে সময় কেটে গেছে তাতে প্লেনটির ভেসে থাকা সম্ভব নয়। অত তেলই নেই। কোন এয়ারপোর্টে ফোর্স ল্যান্ডিং করেনি। ঝড় এড়াতে যদি উত্তরে সরে যায় তাহলে এক হতে পারে কোন-

মতে মাঠেঘাটে নেমেছে। তাহলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। সেটা হলেও খবর আসত। কারণ প্লেনের ট্র্যান্সমিটার নষ্ট হবার কথা নয়। যদি ঝড়ে কোন পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খায়, ইন ফ্যাক্ট, আমরা সেইটেই আশঙ্কা করছি।'

'কেউ বেঁচে থাকতে পারে না অমন হলে?'

'ধাক্কা খেলে, না।'

'আমার দ্বিতীয় জ্ঞাতব্য, আজ দুপুরে আমরা কিছু এক্সপোজড ফিল্ম পাঠিয়েছিলাম মাদ্রাজে। সেগুলো কি প্লেনে তোলা হয়েছিল?' অরিন্দম ঠোঁটে জিভ বোলাল।

'বুকিং থাকলে না পাঠাবার কোন কারণ নেই।' অফিসার উঠে গিয়ে একটা লিস্ট তুলে নিলেন ফাইল থেকে, 'কি নামে যাচ্ছিল?'

অনন্ত সব বিবরণ দিতে ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'ইয়েস। গিয়েছে। ষাট হাজার ফুট এক্সপোজড ফিল্ম। ষাট হাজার টাকার ইন্সুরেন্স।'

'ষাট হাজার?' বসন্ত চিৎকার করে উঠল, 'কি বলছেন আপনি?'

'তাই তো লেখা আছে। কেন, ওর দাম কি আরও বেশি?' অফিসার চোখ ছোট করলেন।

'ইম্‌পসিবল! র-স্টকের দামই তো ওর তিনগুণ!'

'কিছু করার নেই! ইন্সুরেন্সের পেমেণ্ট অ্যাভয়েড করার জন্যে অনেকে কমিয়ে দাম লেখান। আপনারা কি এখানে স্যুটিং করতে এসেছিলেন?'

মাথা নাড়ল অরিন্দম। তারপর বলল, 'থ্যাংকস।'

স্খলিত পায়ে ওরা যখন বেরিয়ে আসছিল তখন উদ্বিগ্ন জনতা সমানে জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছে, 'দাদা, কি বলল? সত্যি অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে? অ্যাকসিডেণ্ট কোথায় হল দাদা?'

কোন কথার জবাব না দিয়ে ওরা গাড়ির কাছে চলে এল। বসন্ত হাঁটতে পারছিল না আর। তাকে ভেতরে তুলে নেওয়া হল। এবং তখনই কল্পনা কেঁদে উঠল শব্দ করে। অরিন্দম ওর দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। এভরিথিং ফিনিশ্‌ড, এভরিথিং। কাল দুপুরের ফ্লাইটটা ছাড়বে তো। আজ সকালে এখানে পেঁছেই ভেবেছিল প্লেন ধরবে। ভাগ্যিস ধরেনি। শরীরে শীতল রক্ত বইল যেন। কালকের ব্যাপারটা জানার জন্যে সে পা বাড়াল। গাড়িগুলোর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চাপা গর্জন কানে আসতেই থমকে গেল সে। মহিলা কণ্ঠ বলছে, 'ইডিয়ট! ইউ মাস্ট ফাইন্ড হিম। ওর ব্রিফকেসেই সমস্ত কাগজপত্র আছে। চুরি করে

পালিয়েছিল। উইদাউট দ্যাট আমি হেল্পলেস। ওটা না পেলে তোমার কোন আশা নেই, মনে রেখ।'

এবার পুরুষটি বলল, 'আই নো, কিন্তু লোকেশনটা এরা বলছে না। প্লেন কোথায় ভেঙে পড়েছে জানলে আমি এখনই রওনা হতাম।'

'বলছে না? কি করে বলাতে হবে যদি না জানো তাহলে লিভ মি। আই উইল ফাইণ্ড দ্যাট।'

কথাগুলো বলতে বলতে ভদ্রমহিলা গটগটিয়ে যে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন সেটার দিকে তাকিয়ে চিনতে পারল অরিন্দম। পুরুষটি ছুটে গেল। চলন্ত গাড়ির দরজা তার জন্যে খোলা হল না। উল্কার গতিতে ফিরে যাচ্ছিল গাড়িটা। এরাই আসার পথে তাদের ওভারটেক করেছিল।

অরিন্দম অন্ধকারে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দেখছিল। ভদ্রমহিলা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর কাঁধ নাচিয়ে চিৎকার করল, 'আমি—আমি এসব পারব না। মেয়েছেলের এত মেজাজ আমি সহ্য করি না!'

অরিন্দমের ইচ্ছে হল এগিয়ে গিয়ে বলে সেটাই তো করছেন মশাই, কিন্তু সে পা বাড়াল না। লোকটার বয়স মধ্য-তিরিশে। স্বাস্থ্য ভাল। অবশ্য ঠাণ্ডা এড়াতে যে জ্যাকেটটা পরে আছে সেটা অনেকখানি আড়াল করে রেখেছে। এবার লোকটি এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর দিকে ফিরল। যে জায়গাটায় প্লেন ভেঙে পড়েছে সেই জায়গার হদিস চাইছেন মহিলা একটা ব্রিফকেসের জন্যে। হদিশ যারা দেবে তাদের মুখ খোলাবার কায়দা জানতে বলে গেলেন এই লোকটাকে। ব্রিফকেসে কি কাগজ ছিল তিনিই জানেন কিন্তু ওই সুন্দরী মহিলাটির মত আচরণ করতে হিম্মতের দরকার হয়। কিন্তু ব্রিফকেসের আশা ভদ্রমহিলা করছেন কি করে? অত ওপর থেকে পড়ার পর বস্তুটি তো পাউডার হয়ে যাবে। এবং তখনই অরিন্দমের মনে পড়ল কানাডা থেকে উড়ে সমুদ্রে ভেঙে পড়া এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেন কণিষ্ক-র কিছু

জিনিসপত্র উদ্ধার করার পর একটি বিখ্যাত ব্যাগ কোম্পানি বিজ্ঞাপন দিয়েছিল এই বলে, তাদের তৈরি ব্যাগ কিছুতেই ভাঙে না, এমনকি বিমান ভেঙে পড়লেও নয়।

লোকটিকে অনুসরণ করে অরিন্দম আবার এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এ ঢুকল। ভিড় বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে কাঁপা হাতে সিগারেট বের করে ধরাল লোকটা। জনতা এখন প্রায় হতাশ হয়েই একটু একটু করে কমছে। একজন অফিসার দ্রুত বেরিয়ে আসছিলেন লোকটা তাকে দেখে হাত নাড়তেই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গেলেন।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার ? ডিউটি শেষ ?'

'হ্যাঁ। আজ তো এমারজেন্সি ব্যাপার! আপনারা এখানে ? মিসেস সেনকেও দেখলাম একটু আগে আপনার সঙ্গে। কেউ ছিল প্লেনে ?' অফিসারের গলা নামল।

'হ্যাঁ, মিস্টার সেন।' লোকটা জবাব দিল।

'মাই গড! মিসেস সেন কোথায় ?' চারপাশে তাকালেন অফিসার।

'ওঁকে আমি ফিরে যেতে বললাম। ঠাণ্ডায় টেনশন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে শরীর খারাপ হবে। তাছাড়া এখনও আশা আছে যখন তখন—। উনি চলে গেছেন।'

'আই সি। কিন্তু এখানে আর অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই।'

'লাভ নেই বলছেন ?'

'ইয়েস। একটু আগে খবর এসেছে ওটা সিকিমের বর্ডার পেরিয়ে ক্র্যাশ করেছে। কারণ ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের একটা গোপন ঘাঁটিতে আমাদের পাইলটের শেষ মেসেজ ধরা পড়েছে। ওই পাহাড়ে ফোর্স ল্যান্ডিং অসম্ভব। অবশ্য একথা মিসেস সেনকে বলার দরকার নেই এখনই।'

'না-না। তা কখনও বলে! আফটার অল স্বামী বলে কথা। কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গায় প্লেনটা ভেঙে পড়েছে তা যদি বলেন, মানে যদি আমাদের যেতে হয়!' লোকটি অনুরোধ করল।

'সেটা জানা গেলে তো এতক্ষণ রেসক্যু পার্টি নেমে যেত। শয়ে শয়ে মাইল শুধু বরফ, যাওয়ার কোন পথ নেই। কাল বিকেল নাগাদ ডিটেলস পেয়ে যাব।' অফিসার এগিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ লোকটিকে ছুটে অফিসারের কাছে আবার পেঁছাতে দেখল অরিন্দম। দূরত্ব বেশি থাকায় সংলাপ শুনতে পেল না কিছু কিন্তু হাত পা নাড়ার পর লোকটা যখন অফিসারের সঙ্গে বায়ুদূতের স্টাফ কারে

গিয়ে উঠল তখন বোঝা গেল শহরে ফেরার ব্যবস্থা করে নিতে পেরেছে লোকটা।

গাড়িতে উঠে বসামাত্র ড্রাইভার ইঞ্জিন চালু করল। দরজা খোলার সময় জ্বলা আলোয় ভেতরের মানুষগুলোকে অসহায় ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখেছিল অরিন্দম। বসন্ত না নড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কালকের ফ্লাইট ছাড়ছে ?'

'ওই যা!' অরিন্দম পেছন ফিরে এয়ারপোর্টের আলো আবছা দেখল।

কল্পনা জিজ্ঞাসা করল, 'সেকি! আপনি গেলেন অথচ জিজ্ঞাসা করেননি!'

'একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আই অ্যাম সরি।' নিজের ভুলের জন্যে হাসল অরিন্দম।

অনন্ত বলল, 'এখানে তো কিছু হয়নি। প্লেনের টিকিট কাটা আছে যখন তখন— ।'

অরিন্দম রহস্য করে বলল, 'কিন্তু কল্পনা দেবী, যদি কালকের প্লেনটাও কোথাও ভেঙে পড়ে ?'

কল্পনা বলল, 'খামোখা কু গাইছেন। দুর্ঘটনা ঘটনা নয়।'

'সাবাস মেয়ে।' অরিন্দম জানলায় চোখ রাখল। মেঘ জমছে আকাশে। অন্ধকার আরও ঘন হচ্ছে। প্লেনটা তাহলে ভেঙেই পড়েছে। ছবির আর কোন আশা নেই। চিন্তাটা মাথায় আসতেই শরীরে অস্বস্তি ফিরল। সে মুখ না ঘুরিয়ে বলল, 'বসন্তবাবু, এটা আপনার প্রথম ফিচার ছবি। আমি তো এ বেলা এই পরিচালকের ও বেলা সেই পরিচালকের ছবিতে কাজ করে যাচ্ছি। ঠিকই বলেছেন, ছবিগুলোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিজের পার্টটুকু ঠিকঠাক করে আনা। আমি যে সিনে নেই সেই সিনে কোন্ অভিনেতা আছেন তারও খোঁজ রাখি না। মেশিনের মত হয়ে গেছি মশাই ছবি করতে করতে সবই ঠিক। আবার পয়সা না নিয়েও বন্ধুদের ছবিতে কাজ করে দিই তো! তিনমাস ধরে চুপচাপ সমস্ত কষ্ট সহ্য করে পরিশ্রমও করে যেতে পারি। আসলে কি জানেন, ছবির চরিত্রটা যদি ভাল লেগে যায় তাহলে ছবিটার সঙ্গে ইনভলবমেণ্ট তৈরি হয়ে যায়। যেমন এই ছবির ক্ষেত্রে হয়েছে।'

একটানা সুন্দর গলায় অন্ধকার দেখতে দেখতে কথাগুলো বলছিল অরিন্দম। বসন্ত খুব নির্জীব গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'মাঝ রাত্রে হঠাৎ এইসব বলছেন কেন ?'

'বলছি। ঘটনাটা প্রথম শোনার পর আপনি আমাকে বলেছিলেন, আপনারা বছরে দশটা ছবিতে কাজ করছেন, একটা গেলে কোন ক্ষতি হয় না। ঠিক কথা। কিন্তু সব সময় তো জীবন অঙ্কের হিসেব চলে না মশাই। আমি যখন বৃদ্ধ হব

তখন অনেক ছবির কথা ভুলে যাব কিন্তু এই দেখতে না পাওয়া ছবিটার কথা চিরদিন মনে থাকবে। এক্ষেত্রে সত্যি আমার কষ্ট আছে।' অরিন্দমের গলাটা শেষদিকে ধরে এল।

কল্পনা প্রতিবাদের গলায় বলল, 'না দেখতে পাওয়া ছবি বলছেন কেন? এখনও তো শেষ কথা শুনিনি।'

অরিন্দম একটু আগে অফিসারের মুখ থেকে উচ্চারিত খবরটা এদের শোনাতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। রাত পোহালেই সবাই জানতে পারবে। কিন্তু এই রাতটুকুতে যদি আশা থাকে তাহলে কিছুটা স্বস্তিতে ঘুমাতে পারবে সবাই। সেইটুকুই সে এই মুহূর্তে দিতে পারে।

সকালবেলা রেডিও নতুন কোন খবর দিল না।

মালপত্র নিয়ে প্রোডাকশনস ম্যানেজার অনন্ত রওনা হয়ে যাবে গৌহাটির উদ্দেশ্যে। ওর সঙ্গে টেকনিকাল স্টাফ এবং দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পীরা শহর ছাড়বে। কাল সারা রাত বসন্ত ঘুমাতে পারেনি। ভোরের ঠান্ডা গায়ে মেখে সে হোটেলের বাগানে নেমে এসে অরিন্দমকে দেখতে পেল। অরিন্দম শালমুড়ি দিয়ে সিগারেট খেতে খেতে বাঁধানো রাস্তা ধরে বাগানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মাটির দিকে তাকিয়ে। দূর থেকে দেখে বসন্তর মনে হল লোকটা ঠিক নায়ক-নায়ক নয়। যখন সে নিজে ডকুমেন্টারি করছে তখন অরিন্দমের কাছে তার পাত্তা পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু সে যখন এই ছবির পরিচালক তখন অরিন্দম তাকে ঠিকঠাক সম্মান দিয়ে গেছে। স্যুটিং-এর সময় মতবিরোধ ঘটলেও শেষ পর্যন্ত তার বক্তব্যই মেনে নিয়েছে। এখনকার অনেক নায়ক যখন কিছু না থাকতেই শুধু নামের জোরে ডিকটেটার তখন অরিন্দম ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই। কিন্তু লোকটা এই সাতসকালে বাগানে পায়চারি করতে করতে কি ভাবছে! চেহারা দেখে বসন্তর মনে হল অরিন্দমও রাত্রে ঘুমায়নি।

মুখোমুখি হতে অরিন্দম চোখ তুলে দেখল, 'অ! আপনি! আচ্ছা বসন্তবাবু, আপনারা ক্যানগুলো ঠিক কিভাবে পাঠিয়েছিলেন বলুন তো!'

'অনন্ত বলছে ক্যানগুলো একটা স্টিলের বাক্সে পুরে ভেতরে প্যাকিং দিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে না লাফাতে পারে। স্টিলের বাক্সটাকে ঢোকানো হয়েছিল একটা বড় এয়ারটাইট বাক্সে।' বসন্ত জবাব দিল।

'কি ধরনের বাক্স সেটা?' ভ্রূ কোঁচকালো অরিন্দম। 'ঠিক বাক্স নয়, স্যুটকেস।

আধুনিক স্যুটকেস যেমন হয় আর কি। বত্রিশ ইঞ্চি। লক দুটো টেনে দিলে ভেতরে হাওয়াও ঢুকতে পারে না।' বসন্ত একটি নামী স্যুটকেস কোম্পানির নাম করল।

নামটা কানে যাওয়ামাত্র উত্তেজিত হল অরিন্দম, 'ঠিক বলছেন আপনি ?'

'হ্যাঁ। ওরা যখন এয়ারপোর্টে ওগুলো পাঠাবার জন্যে রওনা হল, তখন আমি দেখেছি। আসলে হরিশদার কাছে একটা এক্সট্রা স্যুটকেস ছিল। সেইটেই কাজে লেগেছিল।'

বসন্তের হাত জড়িয়ে ধরল অরিন্দম, 'তাহলে, তাহলে, হয়তো সব আশা নষ্ট হয়ে যায়নি বসন্তবাবু। ক্যানগুলো আমরা ফেরত পেতেও পারি। শুধু জানি না ধাক্কা লাগার পর প্লেনে আগুন জ্বলেছিল কিনা। তার টেম্পারেচার কতটা। ফিল্ম তো খুব ডেলিকেট, আগুন কিংবা উত্তাপের কাছে। সেইটে যদি সহ্য করতে পারে, কিংবা ধরুন আগুন লেগেছে সামনের দিকে আর আমাদের স্যুটকেসটা ছিল পেছনের ক্যারিয়ারে। আগুন স্পর্শ করার আগেই নিচে গড়িয়ে পড়েছে, তাহলে, স্টিল দেয়ার ইজ এ হোপ।'

'কিন্তু ঠিক কি ঘটনা ঘটেছে তা তো—।'

'ঘটনাটা ঘটেছে।'

'মানে, আমি একটু আগে নিউজ শুনেছি।'

'জানি না। কিন্তু কাল আপনাদের বলতে চাইনি, এয়ারপোর্টেই আমি শুনে এসেছি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে সিকিম বর্ডার পেরিয়ে।' অরিন্দম খবরটা বলল।

'সিকিম বর্ডার। কোথায় ?' বসন্তের মাথা ঘুরছিল আবার।

'সেই কোথায়টা জানা যাচ্ছে না। জানার জন্যে এর মধ্যে অনেকেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। একটা ব্রিফকেসকে অটুট পাওয়ার আশায় যখন অন্যেরা ছটফট করতে পারে তাহলে একটা বড় স্যুটকেস, যারা বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, প্লেন থেকে পড়েও ভাঙে না, তা উদ্ধার করার কথা আমরা কেন ভাবব না।' অরিন্দম সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বসন্তের কানে যেন কিছু ঢুকছিল না। অরিন্দম তাকে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঈষৎ ঝাঁকাল, 'আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন বসন্তবাবু ?'

'সত্যি প্লেনটা ভেঙে পড়েছে ?' বিড় বিড় করল বসন্ত।

'হ্যাঁ, ভেঙে পড়েছে। মনে রাখবেন ওই প্লেনে কুড়িজন যাত্রী এবং কর্মচারীরা ছিলেন। তাঁদের প্রাণের দাম আমাদের স্যুটকেসের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি।

ঘটনাটা যদি ঘটে থাকে তাহলে সেই প্রাণগুলো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। হরিশবাবু কেমন আছেন?'

'আমি আধঘণ্টা আগে গিয়েছিলাম। তখনও ঘুমুচ্ছিলেন।'

যে প্লেনটি কলকাতা থেকে ভোরে প্যাসেঞ্জার নিয়ে উড়ে আসে সেটিই আরও দুটো জায়গা ঘুরে ফিরে যায়। গতকালের দুর্ঘটনার জন্যে একটি এয়ারক্রাফট নষ্ট হয়েছে। ফলে আজকের ফ্লাইট চালু থাকবে কিনা এই সন্দেহের নিরসন হল। সিটি অফিস জানাল, ফ্লাইট বাতিল হয়নি। সমস্ত ইউনিট নিয়ে অনন্ত গাড়িতে রওনা হয়ে গেল ট্রেন ধরতে ঘণ্টা চারেক দূরের স্টেশন থেকে। ওদের যাওয়ার মুহূর্তে হরিশ মল্লিক ধীরে ধীরে সামনে এসে দাঁড়াল। ইঞ্জেকশনের প্রভাবে সারা রাত ঘুমিয়ে থাকা সত্ত্বেও মানুষটিকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। ইউনিটের একটি প্রোডাকশন বয় যে কলকাতায় পেঁছেই অন্য ছবিতে কাজ করতে যাবে, তার চোখেও জল এসে যাচ্ছিল হরিশকে দেখে।

প্লেনে যাচ্ছে মোট সাতজন। পুরনো দিনের অভিনেতা সুবোধ গাঙ্গুলি কলকাতা ছাড়ার আগে কড়ার করিয়ে নিয়েছিলেন যে তিনি ট্রেনে আসা যাওয়া করতে পারবেন না। কিন্তু গতরাত্রে খবরটা শোনার পর থেকেই তিনি বেশ কয়েকবার অনন্তকে অনুরোধ করেছেন তাঁর ফেরার ব্যবস্থা ট্রেনেই করতে। কিন্তু অনন্ত রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে না এই যুক্তিতে তাঁকে কাটিয়ে দিয়েছে। হোটেল ছেড়ে গাড়ি দুটো যখন এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হল তখন সুবোধবাবুর কোমর শিরশির করছে। নার্ভাস হয়ে গেলেই তাঁর ওইরকম হয়। চল্লিশ দশকে প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে একটি ছবিতে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান তিনি। দু মিনিটের কাজ। কিন্তু ক্যামেরার সামনে প্রমথেশবাবু যখন চোখ তুলে প্রথমবার তাকিয়েছিলেন তখনই কোমরে ওই অনুভূতিটা এসেছিল। তারপর থেকে আর ওটা যাচ্ছে না। নার্ভাস হয়ে গেলেই জানান দেয়। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'এসব ঘটনার পর আজ ট্রেনে গেলেই হত।'

এই গাড়িতে বসন্ত, হরিশ, সুবোধবাবু আর কল্পনা, পেছনেরটায় অরিন্দম, ভিলেন, নীতা।

আজ সকালে ডাক্তার আর একপ্রস্থ দেখে গেছেন হরিশকে। প্রয়োজনীয় ওষুধ দিয়ে গেছেন। হরিশ হাঁটাচলা করছে বটে কিন্তু কথা বলছে খুব কম, সব সময় বিমুনিভাব যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে ওকে।

কল্পনা বলল, 'এসব ঘটনা রোজ না হলেও, ঘটে, কিন্তু ঘটে বলে প্লেন বন্ধ

করে দিতে হবে ?’

সুবোধবাবু বললেন, ‘না, তা বলছি না। সময়টা খারাপ যাচ্ছে। এই খারাপ সময়টা কেটে না যাওয়া পর্যন্ত—! আমার কি ! তিনকাল কাটিয়ে এসেছি। ক্যাপিটাল খরচ, এখন শুধু ইণ্টারেস্টের দিন কাটানো। তোমাদের বয়স কম, তোমাদের কথা ভেবেই বলা।’

পেছনের গাড়িতে জানলায় হেলান দিয়ে বসেছিল অরিন্দম চোখ বন্ধ করে। তার পাশে নীতা। সামনে ড্রাইভারের পাশে ভিলেন বসে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা চিন্তা করাই হাস্যকর। ফিল্ম দাহ্যবস্তু হিসেবে খুবই বিপজ্জনক। একটা প্লেনে আগুন লাগলে, সিনেমায় যা দেখা যায়, তাতে দুর্ঘটনার সময় আগুন না লাগার কোন কারণ নেই, সেক্ষেত্রে এক্সপোজড ফিল্ম আপসেই গলে যাবে। কিংবা, না গললেও যদি তা পাওয়াও যায় প্রিণ্টই করা যাবে না। অবশ্য বিশেষজ্ঞরা একথা ভাল জানবেন। কলকাতায় ফিরে গিয়ে বসন্তকে বলতে হবে খোঁজ নিতে। আজ সকালে যখন হরিশকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল কেন অত অল্প টাকার ইন্সুরেন্স করিয়েছিল ক্যানগুলো বুক করার সময় তখন ভদ্রলোক জবাব দিয়েছিল, ‘গ্রহের ফের। পয়সা বাঁচাতে গিয়েছিলাম—।’ স্বীকারোক্তি সঠিক কিন্তু আর তো কিছু করার নেই। ষাট হাজার টাকা এই মুহূর্তে ষাট টাকার মতো শোনাচ্ছে।

হঠাৎ অরিন্দমের পায়ের ওপর চাপ পড়তেই সে চোখ খুলল। নীতা বসে আছে এক হাত দূরে কিন্তু তার বাঁ পা এগিয়ে এসেছে। চোখাচোখি হতেই নীতা হাসল, ‘কি ভাবছ ?’

উত্তর দিল না অরিন্দম। মৃদু হাসল। নীতা ঠোঁট কামড়ে নিয়ে বলল, ‘তোমার ওই হাসিটা বড্ড সিডাকটিভ। ওই জন্যেই মেয়েরা মরে।’

অরিন্দম চট করে সামনের দিকে তাকাল। যে গলায় কথা বলল নীতা তাতে ওদের না শোনার কোন কারণ নেই। ভিলেন ছেলেটি গ্রুপ থিয়েটারের আউটডোরে আলাপ হওয়ার পর ছোকরা তাকে দাদা বলে দূরত্ব রেখেছে। এখন তো সব বুঝে গেল, সংলাপ শোনে তো শুনুক। অরিন্দম উত্তর দিল, ‘তুমি আর কোথায় মরলে।’

‘পুরো আউটডোরটাই তো মরে রইলাম। কাল রাত্রে তোমাকে খুব এক্সপেক্ট করছিলাম।’

‘কাল রাত্রে ? মাই গড !’

‘কেন ?’

'কাল যে ঘটনা শুনেছি তারপর—।' অরিন্দম মুখ ফিরিয়ে নিল।

'যা ঘটেছে তাতে আমাদের কিছু করার ছিল না। এক জীবনে কত প্রিয় অপ্রিয় মানুষ মারা যায়। সেই ঘটনার পর তাহলে সারাজীবন ধরে শোক পালন করে যাও না কেন?' নীতা মাথা নাড়ল, 'তাছাড়া উই আর প্রফেশন্যাল। কত ছবি তো পুরো তোলার পরও হাজার ঝামেলায় রিলিজ করে না। তার বেলা? এই ছবিও রিলিজ করবে না। ব্যস!'

হঠাৎ ভিলেন মুখ ফেরাল, 'অরিন্দমদা, আমি এ ব্যাপারে কথা বলতে পারি?'

অরিন্দম বলল, 'আমি জানি তুমি কি বলবে। কাউকে কনভিন্সড করে তোমার কি কোন লাভ হবে?'

চেক ইন করে মালপত্র হাতছাড়া হবার পর অরিন্দম হরিশের পাশে এসে দাঁড়াল। হরিশ কাঁচের দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে পাহাড় দেখছিল। এত সুন্দর এয়ারপোর্ট ভারতবর্ষে খুব কম আছে। সবুজ উপত্যকা নেমে গেছে বাঁ দিকে। নীল আকাশ নেমে এসেছে যেন মাথার ওপরে। অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'শরীর এখন কেমন?'

'ঠিক আছে।' হাসবার চেষ্টা করল হরিশ, 'কিন্তু আমি কিছুতেই মানতে পারছি না ঘটনাটা।'

অরিন্দম কথা বলল না। ঘেরা ঘর বলেই ঠাণ্ডা লাগছে না। অথচ গরম জামা খোলাও যাবে না প্লেনে না ওঠা পর্যন্ত। হরিশ নিজের মনে বলল, 'ছবিটা শুরু করার আগে এত লোক বাধা দিয়েছিল শুধু আমিই বুঝতে পারিনি। কিন্তু জানেন অরিন্দমবাবু, সকাল থেকে আমার মাথায় আর একটা চিন্তা ঢুকেছে।'

'কি চিন্তা?' অরিন্দমের মনে হল লোকটা যেন স্বাভাবিক নয়।

'কাল রাত্রে টিভিতে খবরটা শোনার আগের মুহূর্তেও আমি ছিলাম স্বাভাবিক। আমার হাত পা সমস্ত শরীরের একমাত্র মালিক ছিলাম আমি। কিন্তু খবরটা কানে যাওয়ামাত্র আবিষ্কার করলাম আর একজন আমার হাত নাড়তে দিচ্ছে না আমাকে, জিভ শক্ত করে ধরে শব্দ উচ্চারণ করতে দিচ্ছে না। পায়ের শক্তি চলে গেছে। আমি আমার মালিক নই। আমার সব কিছু যেন অন্যের নিয়ন্ত্রণে আর আমি এতকাল তার কেয়ারটেকার হয়েও মালিক ভাবতে ভালবাসতাম।' হরিশ মল্লিক কথাগুলো বলছিল থেমে থেমে। অরিন্দম মানুষটাকে আপাদমস্তক দেখল। তারপর সান্ত্বনা দেবার গলায় বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। শরীর তার সিস্টেমে

চলে। সিস্টেম বিকল হলে—।'

'না মশাই, সিস্টেম-টিস্টেম না। দেয়ার ইজ এ পাওয়ার, যা আমাদের কণ্ট্রোল করে। আমাদের প্রত্যেকের ভাগ্যও সেই শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে। প্লেন দুর্ঘটনাও তারই ইচ্ছায়।'

অরিন্দম সরে এল। বোধহয় এই পর্যায় থেকেই মানুষের দুটো প্রতিক্রিয়া ঘটে। হয় তাবা প্রচণ্ড ঈশ্বরবিশ্বাসী হযে সংসার ত্যাগ করে, নয় মস্তিষ্ক স্বাভাবিক রাখতে পারে না।

কলকাতার প্লেন এখনও এসে পে'ছিয়নি। যাত্রীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। দমদম বা বড় এয়ারপোর্টের সঙ্গে এর তফাত ছোট বলেই আইনের আঁটোসাঁটো ভাবটা নেই বললেই চলে। দুটো খোপ রয়েছে যেখানে সিকিউরিটি চেকিং হয়, কিন্তু ওই পর্যন্তই।

যাত্রীদের অনেকেই নীতাকে চিনতে পেরে তার অটোগ্রাফ নিচ্ছে। বোম্বের এক-জন সাইড অ্যাকট্রেসেব কদর কলকাতার নায়কের চেয়েও বেশি। অবশ্য যারা শুধু হিন্দী ছবি দ্যাখে তারা নীতাকে চিনবেই। অরিন্দম ভিড় বাঁচিয়ে বাইরে আসতেই একটি তরুণী এগিয়ে এল, 'নমস্কার। আপনাকে এখানে দেখব ভাবতে পারিনি। স্যুটিং-এ এসেছিলেন?'

এই সময় অরিন্দমের অভ্যস্ত ভঙ্গি হল গালের দেওয়াল আলতো কামড়ে ঈষৎ মাথা নাড়া।

তরুণী বলল, 'আপনার সবুজ বাগানের অভিনয় আমার দারুণ লেগেছিল।'

'থ্যাংকস।' শব্দটা উচ্চারণ করে ও হাঁটা শুরু করল। সবুজ বাগান। ওই ছবিটা যদি এই মেয়ের ভাল লেগে থাকে তাহলে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ওই ছবিটাই তার রোমাণ্টিক হিরোর ইমেজ নষ্ট করতে সাহায্য করেছে।

হঠাৎ অরিন্দম সোজা হয়ে দাঁড়াল। কালকের ছুটন্ত গাড়িটা এয়ারপোর্টের সামনে থামল। সেই ভদ্রমহিলা, তিনিই, গটগট করে নেমে এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর ভেতরে চলে গেলেন। মহিলার পরনে জিনসের প্যাণ্ট, ব্যাগী সার্ট। কোন গরম জামা নেই। হাতে একটা ছোট ব্যাগ। চোখে এই আধারোদেও রোদচশমা চাপানো। রাত্রে ভাল বুঝতে পারেনি কিন্তু এখন মনে হল ইনি ইচ্ছে করলেই বোম্বে ফিল্মে নায়িকার ভূমিকা পেতে পারেন। যদিও বয়স তিরিশের কোঠা ছুঁয়েছে কিন্তু পদক্ষেপে কোন আলস্য নেই।

আজ গাড়িতে ড্রাইভার আছে। ড্রাইভারের পাশ থেকে সেই লোকটি নামল.

যাকে মহিলা গতরাতে এখানে ফেলে গিয়েছিলেন। লোকটি একবার মহিলাকে দেখে নিয়ে দুটো বড় স্যুটকেস দু হাতে ঝুলিয়ে অনুসরণ করল। অরিন্দম মাথা নাড়ল, তাহলে এঁরা একই প্লেনে কলকাতায় যাচ্ছেন। উই মাস্ট ফাইন্ড হিম। ওটা না পেলে তোমার কোন আশা নেই এটা মনে রেখ। শব্দগুলো যে গলায় বলা তা কোনদিন ভুলতে পারবে না অরিন্দম।

এই সময় আকাশে শব্দ বাজল। যাত্রীদের ব্যস্ততা শুরু হল। ধীরে ধীরে শূন্য থেকে নেমে এল বিমানটি। পাক খেয়ে স্থির হতেই সিকিউরিটি চেকিং-এ যাওয়ার জন্যে অনুরোধ এল।

আজ যারা যাচ্ছে তাদের সবাই গতকালের দুর্ঘটনা নিয়ে কথা বলছে। এক ভদ্রলোক বললেন, 'আমার পক্ষে ঈশ্বর আছেন। এর আগে দুবার অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি। কালকের ফ্লাইটে আমারও যাওয়ার কথা ছিল। প্লেনটা ধরতে পারিনি। পারলে আজ আমি কোথায়!'

অরিন্দম চোখ রাখছিল। ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন একপাশে। এই ভিড়, ব্যস্ততা, কোন কিছুতেই তাঁর আকর্ষণ নেই। মহিলার পাশে সেই লোকটি। তখন কলকাতা থেকে আসা যাত্রীরা বেরিয়ে আসছে প্লেন থেকে। অরিন্দম ধীরে ধীরে ভীড় কাটিয়ে এগিয়ে গেল লোকটির দিকে। একটা হলঘরে সবাই গায়ে গায়ে বলে বাঙালীদের অনেকেই অরিন্দমকে দেখছিল ঘুরে ঘুরে। সেই তরুণীটিকে দেখতে পেয়ে ইশারায় ডাকল অরিন্দম। এবং সে তৎপর হয়ে কাছে পৌঁছুবার আগেই রোদচশমার সঙ্গীর পাশে দাঁড়িয়ে গেল সে।

তরুণী মুখ খোলার আগেই অরিন্দম বলল, 'তখন স্যুটিং-এর কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন না? হ্যাঁ, ভাই, এবার এমন একটা ছবি করছি যা কখনও করিনি। কিন্তু মন খুব ভাল নেই।'

'কেন? কিছু হয়েছে?' তরুণী উদ্বিগ্ন।

'হ্যাঁ। গতকাল যে প্লেনটা ভেঙে পড়েছে তাতে আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক ছিলেন। উনি আগে জানতেন না যে আমি এখানেই আছি। কালই জানতে পেরে এয়ারপোর্টে যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যান। ভদ্রলোককে খুব উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল তখন। শুধু একটা ব্রিফকেস নিয়ে রওনা হন। যাওয়ার আগে আমাকে কয়েকটা কথা বলেছিলেন। তখন তো জানতাম না কি ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু কথাগুলো ভুলতে পারছি না।' টেনে টেনে গল্পটা বলার সময় অরিন্দম আড়চোখে দেখে নিল লোকটি শক্ত হয়ে গেছে।

তরুণী জিজ্ঞাসা করল, 'ভদ্রলোক কি বলেছিলেন ?'

'সেটা বলা ঠিক হবে না। আসলে আমার সঙ্গে ওঁর দুবার দেখা হয়েছিল কলকাতায়। ওঁর পরিবারের কাউকেই চিনি না। কথাগুলো ওঁর পরিবারসংক্রান্ত, ব্যক্তিগত।'

অরিন্দম কথা শেষ করামাত্র লোকটি ঘুরে দাঁড়াল, 'এক্সকিউজ মি, ভদ্রলোকের নামটা কি ?'

'কেন বলুন তো।' অরিন্দম হেসে জিজ্ঞাসা করল। রোদচশমার মালিক তখনও উদাসীন হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে। তাঁর কানে কথা পৌঁছচ্ছে না।

এবার ইতস্তত করল লোকটি, 'না মানে, এই শহরের লোক হলে চিনতে পারব।'

'কি হবে চিনে!' মাথা ঝাঁকাল অরিন্দম। তারপর সবাইকে উপেক্ষা করে নিজের দলের কাছে ফিরে গিয়ে ওপাশে তাকাতেই দেখতে পেল লোকটি মহিলার কানের কাছে মুখ নামিয়ে কিছু বলে যাচ্ছে। বক্তব্যটা এত দূরে দাঁড়িয়েও তার অজানা নয়। শেষ করামাত্র রোদচশমা চাবুকের মত মুখ ফেরাল এদিকে। সাপের ফণাও যে সুন্দর তা আর একবার অনুভব করল অরিন্দম।

নিচে পাহাড়। প্লেন উড়ে যাচ্ছে মসৃণ ভঙ্গিতে। অরিন্দম দেখল তার পাশের আসনে বসে হরিশ জানলায় মুখ চেপে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ নড়ে উঠল হরিশ, 'আচ্ছা, অরিন্দমবাবু, ধরুন, ভেঙে পড়া প্লেনে আগুন লাগার আগেই আমাদের স্যুটকেসটা ছিটকে পড়েছে পাহাড়ের খাঁজে। স্যুটকেসটা ভাঙেনি। তাহলে, তাহলে ওটাকে যদি খুঁজে বের করা যায়—আপনি বুঝতে পারছেন ?'

মাথা নাড়ল সে, 'আমিও একই কথা ভাবছি হরিশবাবু।'

হঠাৎ তার দুটো হাত জড়িয়ে ধরলো হরিশ, 'প্লিজ, প্লিজ আমার পাশে দাঁড়ান। উই মাস্ট ট্রাই। দাঁড়াবেন না ?'

অরিন্দম উত্তর দেওয়ার আগেই একটা শরীর প্যাসেজে তার পাশে থমকে দাঁড়াল, 'এক্সকিউজ মি, আপনার টেলিফোন নম্বরটা জানতে পারি ?'

ভেঙে পড়া বিমানটির হদিশ ভারতীয় বিমানবাহিনী শেষ পর্যন্ত পেল। পাহাড়ের যে অঞ্চলে বিমানটির পতন ঘটেছে সেখানে অবতরণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পনের হাজার ফুট ওপরে পাহাড়ের খাদে বরফের সঙ্গে মিশে রয়েছে টুকরোগুলো। তাও তার এলাকা প্রায় মাইলখানেক জুড়ে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ওইরকম দুর্ঘটনার পরে কোন মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। বস্তুত বিমানটি টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। তবু অনুসন্ধানী হেলিকপ্টার চেষ্টা করেছিল কাছাকাছি নামতে কিন্তু সেরকম জায়গা খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রকৃতিও সেখানে নিজের খেয়ালে চলে, তুষারঝড় অঙ্ক না কষে বয়ে যাচ্ছে। আবহাওয়ার উন্নতি হলে প্রায় একশো কিলোমিটার ট্রেকিং করে সম্ভবত সেখানে পেঁছানো যাবে। কিন্তু তাতে যে সময় লাগবে তাও কম নয়। এবং তারপরে অকুস্থলে পেঁছে কিছু পাওয়া যাবে বলে কর্তৃপক্ষ মনে করছেন না।

খবরের কাগজগুলোয় কদিন থেকে শুধু এই নিয়ে লেখালেখি চলছে। সাধারণ একটি বিমান কেন এইরকম দুর্ঘটনায় পড়বে? এটা কি কোন অন্তর্ঘাতমূলক কাজ না যান্ত্রিক দোষ। তাঁরা জোর দিচ্ছিলেন তদন্তের জন্যে। যে এলাকায় ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে, যে বিমানবন্দর থেকে বিমানটি ছেড়েছে সেই অঞ্চলে কোনরকম অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মের হদিশ এর আগে পাওয়া যায়নি। অতীতের বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে ওই সংস্থার বিশেষ বিমানগুলো সম্পর্কে নানান অভিযোগ উঠেছিল। এই দুর্ঘটনা তারই ফলে কিনা তা তদন্ত করা উচিত। না হলে যাত্রীদের মনে নিরাপত্তাবোধ আসবে না।

প্রতিটি দিন সবকটা কাগজ খুঁটিয়ে পড়ছিল অরিন্দম। কলকাতায় ফিরে আসার পর সে আর বাড়ি ছেড়ে বের হয়নি। সিনেমা পত্রিকা তো বটেই খবরের কাগজগুলো রিপোর্টার পাঠিয়েছিল তাকে ইন্টারভিউ করার জন্যে কিন্তু সে মুখ বন্ধ রেখেছে। যে ছবি নেই, যে ছবি কোনদিন মুক্তি পাবে না তার স্যুটিং-এর বিবরণ সাজিয়ে গুজিয়ে বলে লাভ কি। কিন্তু মনের ভেতর সবসময় এক ধরনের

অস্বস্তির ঝিঁঝিঁ ডেকে যাচ্ছে। ছবিটা নতুন পরিচালক করেছিল খুবই খেটে এবং বলা যায় না বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এটি ল্যান্ডমার্ক হয়ে থাকতে পারত। এখন যে কোন ছবিতে কাজ করতে করতে সে বুঝে যায় তার ভবিষ্যৎ কি। যে সংলাপ বলতে হচ্ছে, পরিচালকের দৃশ্যগ্রহণের কায়দা, এবং ফ্লোরের পরিবেশ এই আন্দাজ তৈরি করতে সাহায্য করে। নিরানব্বুই ভাগ ছবি মুক্তি পেলে সেই আন্দাজের ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু বসন্তের ছবি তাকে অন্য ধারণা দিয়েছিল। আগামী পঁচিশ বছর বেঁচে থাকার জন্যে ছবিটার মুক্তি পাওয়া প্রয়োজন ছিল।

কলকাতায় অন্য যেসব ছবিতে অরিন্দমের কাজ করার কথা তাদের পরিচালকরা ব্যস্ত হয়ে উঠছিল। অরিন্দম ছুটি চাইছে দিন পনেরর। না দিয়ে উপায়ও নেই। বস্তুত টালিগঞ্জের কলাকুশলীরা এইরকম একটি দুর্ঘটনার ফলে উদ্ভূত ক্ষতিকে নিজেদের ক্ষতি বলেই মনে করেছিল। যে সমস্ত কলাকুশলী দীর্ঘসময় ওই ছবির স্যুটিং-এ ছিল তারা ফিরে এসে যেসব গল্প করছে তাই পল্লবিত হয়ে এমন আকার ধারণ করেছে যে সবাই প্রায় বিশ্বাস করতে আরম্ভ করছে যে ছবিটি মুক্তি পেলে যে কোন বিদেশী ছবির সঙ্গে টেক্কা দিতে পারত।

নিজের বিছানায় ঘুমাবার মত আরাম আর কিছুতেই নেই, হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে অরিন্দম এইরকম ভাবছিল। বরানগরে যার জীবন শুরু সে এখন দক্ষিণ কলকাতার বনেদী পাড়ার নিজস্ব বাড়িতে আরামে রয়েছে। তার ইনকামট্যাক্স উকিলের দৌলতে এই বাড়ি এবং অন্যান্য সম্পত্তি সবই আইনগ্রাহ্য। গোটা ছয়েক ঘরের সর্বত্র বিত্ত এবং রুচির ছাপ। চারটে ঝি এবং চাকর সবসময় তটস্থ হয়ে থাকে আশেপাশে। বরানগরে এখনও মা এবং ভাইরা। সে একা এই প্রায়-প্রাসাদে।

টেলিফোনটা বাজল। মিষ্টি সুর। মাথার পাশেই বিদেশী রিসিভার। একটা বোতাম টিপলেই কথা বলা যায়। অরিন্দম ঝুটঝামেলা এড়াতে চাইল। সাতসকালে কোন ফ্যান অথবা রিপোর্টার কিংবা আগামী ছবির পরিচালকের সঙ্গে এই মুহূর্তে কথা বলতে তার একটুও ইচ্ছে করছে না। বারংবার বাজলে মিষ্টি সুরও বেসুরো লাগে। সে আঙুলের ডগায় বোতাম টিপল। 'হ্যালো, হ্যালো!'

অরিন্দম গলাটা চিনতে চেষ্টা করল। ওপ্রান্ত থেকে যেন মরীয়া হয়ে নোঙর ফেলতে চাইছে, 'হ্যালো, হ্যালো।'

'কে বলছেন?' বিছানা থেকে মাথা না তুলে অরিন্দম নির্লিপ্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'অরিন্দমবাবু, আমি বসন্ত বলছি। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন?'

অরিন্দম বালিশটা টেনে কাত হয়ে শুয়ে চুলে হাত বোলাল, 'সুপ্রভাত !'

'সুপ্রভাত। আপনি কি ঘুমাচ্ছিলেন। তাহলে—'

'সেইরকমই ! তবে কথা বলতে পারেন।'

'আমি একটা ম্যাপ জোগাড় করেছি। কতটা অথেণ্টিক তা বলতে পারব না। সিক্সটি সেভেনে এক অস্ট্রেলিয়ান এক্সপিডিশন পার্টি ওই পথে গিয়েছিল। ম্যাপ বলছে মটরেবল রোড থেকে প্রায় একশ তিরিশ কিলোমিটার হাঁটতে হবে।'

'এক্সপিডিশন পার্টির ম্যাপ !'

'হ্যাঁ। খুব টাফ সন্দেহ নেই। কিন্তু ওই দলে একজন ডাক্তার ছিলেন, যাঁর পাহাড়ে ওঠার কোনরকম অভিজ্ঞতা ছিল না। এই পয়েণ্টটাই আমাকে এনকারেজ করছে।'

'আপনি কোত্থেকে কথা বলছেন ?'

'এসপ্লানেডের একটা পাবলিক বুথ থেকে।'

'রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সোজা চলে আসুন।' বোতাম টিপে বিছানা ছাড়ল অরিন্দম। এখন অন্তত আধঘন্টা তার আসন করার কথা। শরীরের কোথাও মেদ যাতে না জমে, হাড়গুলোর যোগস্থলে যাতে মরচে না লাগে তার জন্যে নিয়মিত এই পরিশ্রম। পাহাড়ে স্যুটিং-এর সময় আসন করা সম্ভব না হলেও সারাদিনে এত ওঠানামা করতে হত যে ওটা পুষিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ অনেকদিন পরে তার আলস্য জাগল। একজন নায়ককে চলচ্চিত্রের বাইরেও ষোল ভাগ নায়ক হয়ে থাকতে হয়, নইলে সাধারণ মানুষের কাছে ইমেজ রাখা যায় না। উত্তমকুমার কখনই কফি হাউসে আড্ডা মারতে যেতেন না অথবা না কামানো দাড়ি নিয়ে রাস্তায় হাঁটতেন না। ফলে তাঁর সম্পর্কে মানুষের আকর্ষণ আরও বেড়ে যেত। সামাজিক অনুষ্ঠানে যখন তাঁকে যোগ দিতে হত তখন চলচ্চিত্রের নায়কের মতই যোগ দিতেন। প্রায়ই বলতেন, আমার ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই। খুব কষ্ট হয়। কিন্তু আমি যে দায়বদ্ধ। প্রযোজকরা আমার জন্যেই পয়সা পান। অতএব— !

অর্জন করা যতটা শ্রম ভাগ্য এবং প্রতিভাসাপেক্ষ তার চেয়ে বহুগুণ কষ্টকর সেটাকে বাঁচিয়ে রাখা। তাছাড়া দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে নায়কদের জনপ্রিয়তা কমেছে। কফিহাউসের আড্ডা থেকে বেরিয়ে অরিন্দম যখন গাড়িতে ওঠে তখন কেউ কেউ ফিসফিস করে শুধু, তার বেশি কিছু নয়। বাথরুমের আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে অরিন্দম হাসল। অদ্ভুত ব্যাপার। প্রযোজকদের কাছে তারা ষাট সত্তর আশি হাজার যে যেমন পারে নিয়ে নেয়। কিন্তু তাদের

ব্যক্তিগত গ্ল্যামারে দশটাকার টিকিটও বিক্রি হয় না।

বসন্তকে বসিয়ে রাখল না অরিন্দম। স্নান সেরে বাটিকের পাঞ্জাবি পাজামা পরে সে ওর মুখোমুখি হল। লোকটাকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে। কলকাতায় ফেরার পর দুদিন টেলিফোনে কথা হয়েছিল। কিন্তু এই কদিনেই লোকটা শুকিয়ে গেছে। গালে কাঁচাপাকা খোঁচা দাড়ি জন্মেছে। পাহাড়ে থেকে যা হয়নি, ওর চেহারায় ভাঙন এসেছে। চোখ বসে গেছে। খদ্দরের পাঞ্জাবি পাজামাও ময়লাটে। বসন্ত একবার অরিন্দমের শরীর দেখল। ওর কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ। হঠাৎ অরিন্দমের মনে হল যেসব পরিচালকরা উত্তমকুমারকে উত্তমকুমার হবার সুযোগ দিয়েছেন তাঁরা এখন কোথায় ? কজন তাঁদের নাম মনে রেখেছে ? তাঁদের সবাই কি ভাল আছেন ?

'তারপর! কি খবর ?' কোথা থেকে শুরু করবে ঠিক না থাকায় প্রশ্নটা করল সে। বসন্ত বলল, 'আমার প্রডিউসারের খবর শুনেছেন ?'

'না। কি ব্যাপার ?'

'বেলভিউতে আছেন। কাল গিয়েছিলাম দেখতে। দেখা পাইনি। দেখতে দেওয়া হল না।'

'প্রযোজক তো অসুস্থ, পরিচালকের কি ধারণা ?'

'আমি প্রডাকসন্স ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ক্যানগুলো যেভাবে প্যাক করে স্যুটকেসে ভরা হয়েছিল তাতে, আমি বলতে চাইছি সাধারণ স্যুটকেস হলে কোন আশাই করতাম না কিন্তু যেহেতু ওই বিশেষ স্যুটকেসটি এর আগে অত ওপর থেকে পড়ে গিয়েও যখন ভাঙেনি তখন এবারও অক্ষত থেকে যেতে পারে। তাছাড়া দুর্ঘটনা যদি প্লেনের সামনের দিকের সঙ্গে পাহাড়ের ধাক্কায় হয়ে থাকে তাহলে মালগুলো যেহেতু পেছনের দিকে ছিল, বেঁচে যেতেও পারে। অন্তত আগুনের হাত থেকে। স্যুটকেসটা খুলে গেলে অবশ্য ক্যানগুলোকে পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, এর মধ্যে অনেকগুলো যদি আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে পাওয়ার সম্ভাবনা যে একদম নেই তাও বলতে পারি না। আমি প্রডিউসারকে কথা দিয়েছি যে কোন উপায়ে ওই দুর্ঘটনাস্থলে যাব।'

অরিন্দম খানিকক্ষণ অপলক তাকিয়ে থাকল। একটি মার খাওয়া তরুণ যখন মরীয়া হয়ে ওঠে তখন এই রকম চেহারা হয় ? সে বলল, 'ম্যাপের ব্যাপারটা কি ?'

বসন্ত ব্যাগ থেকে একটা ছোট ফোল্ডার বের করল। ফোল্ডারের ভেতর ভাঁজ করা সাদা কাগজ। সেটা খুলে ধরতেই হাতে আঁকা ম্যাপটা দেখা গেল। খুব

সিরিয়াস হয়ে বসন্ত বলল, 'এটাই যে সঠিক ম্যাপ তা আমি বলছি না। খবরের কাগজ থেকে যতটুকু জেনেছি দুর্ঘটনার এলাকাটা হল এই জায়গা। আপনাকে টেলিফোনে বলেছিলাম একটা অস্ট্রেলিয়ান অভিযাত্রীদল এই পথে গিয়েছিল। সেই দলের ডাক্তার হেনরি টার্নারের লেখা দি স্নো বল বইতে একটা ম্যাপ আছে। এই ম্যাপটি ওখান থেকেই নেওয়া।'

'বইটা কোথায় পাওয়া যায়?'

'আমার কাছে এক কপি আছে। অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি।'

'আজই পাঠিয়ে দিও।'

বিকেলে বেলভিউতে গেল অরিন্দম। রিসেপশনে দাঁড়িয়ে খোঁজ নিতেই সে টের পেল পেশেণ্ট দেখতে আসা ভিজিটারদের অনেকেই তাকে লক্ষ্য করছে। কিন্তু সবসময় যা হয়, সবাই দ্যাখে কিন্তু এমন ভাব করে যেন দেখছে না। লিফটে চেপে নির্দিষ্ট কেবিনে পেঁছে একটা শীতল অভ্যর্থনার মুখোমুখি হল। প্রোডিউসার রয়েছেন বেশ বড় কেবিনে। তাঁর স্ত্রী এবং আত্মীয়রা সামনের ছোট ঘরে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। অরিন্দমকে দেখে থতমত হয়ে গেলেন সবাই। শেষ পর্যন্ত প্রোডিউসারের স্ত্রী এগিয়ে এলেন, 'আসুন। আমরা ঠিক করেছিলাম ফিল্ম লাইনের কোন লোকের সঙ্গে ওকে দেখা করতে দেব না। আসলে ওসব ব্যাপারে কথা হলেই ওঁর উত্তেজনা বেড়ে যায়।'

অরিন্দম ঠোঁট কামড়াল। সে নিজে একশ ভাগ ফিল্ম লাইনের লোক। কথাটা তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছেন উনি?'

'ভাল। প্রথমে হার্ট অ্যাটাক বলে ভয় পেয়েছিলাম আমরা।' ভদ্রমহিলা নড়ছেন না সামনে থেকে। যার অর্থ মোটেই অবোধ্য নয়। অরিন্দম বলল, 'সাধারণত আমার পক্ষে নার্সিং হোমে আসা সম্ভব হয় না কিন্তু, ঠিক আছে, বলবেন এসেছিলাম।'

'আপনি দেখা করবেন না?'

'আপনাদের আপত্তি থাকলে নয়।'

ভদ্রমহিলাকে একটু বিচলিত দেখাল। আত্মীয়দের দেখলেন একবার। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। আসুন। তবে দেখবেন উনি যেন উত্তেজিত না হন।'

ঢোকা উচিত ছিল না। অন্য সময় অরিন্দম আর এমুখো হত না। কিন্তু বসন্তর ম্যাপ আর টার্নারের বইটা আজ সারাটা দুপুর ওকে এমন ভাবে দখল করে

রেখেছিল যে দেখা না করে চলে যেতে মন চাইছিল না। ভদ্রলোক অবশ্যই সুদর্শন ছিলেন। কিন্তু এখন বিছানার চাদরে শরীর ঢেকে যিনি পড়ে আছেন তাঁকে দেখে কষ্ট হল অরিন্দমের। একটা ধাক্কা যেন ভদ্রলোকের আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে। তাকে দেখে সেই বসে যাওয়া মুখে হাসি ফুটল, 'আপনি! খুব ভাল লাগছে।'

'আছেন কেমন ?' অরিন্দম সহজ হতে চাইল।

'এমনি কোন অসুবিধে বোধ করছি না তবে ডাক্তার বলছেন উঠলেই নাকি ওগুলো ফিরে আসবে।'

মানুষের জীবনে দ্বিতীয়বার এই অবস্থা আসে বোধহয় যখন তার নিজস্ব মতামতের কোন মূল্য থাকে না। 'ওঁকে বসতে দাও।' কথা বলার সময় বোঝা যাচ্ছিল উনি কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। ওঁর স্ত্রী প্রায় পাহারাদারের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিলেন পাশে, এবার একটা টুল এগিয়ে দিলেন। অরিন্দম সেটায় বসে বলল, 'তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন। নতুনভাবে সুরু করতে হবে সব!'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের গলা তুললেন ভদ্রমহিলা, 'মাথা খারাপ। আর সিনেমা লাইন নয়। অনেক হয়েছে। কতবার নিষেধ করেছি, শুনলে আজ এমন হত না।'

এই সময় আর কেউ ওপাশে এসে পড়ায় ভদ্রমহিলাকে দেখতে যেতে হল। প্রোডিউসার ম্লান হাসলেন, 'কিছু মনে করবেন না। খুব ভয় পেয়ে গেছে। কি বলছে বুঝছে না।'

'না না ঠিক আছে। আজ বসন্ত এসেছিল ?'

'বসন্ত ? সে তো এখানে আসেনি একদিনও।'

'এসেছিল, কিন্তু দেখা করতে দেওয়া হয়নি।'

'ও।'

'শুনুন, বসন্তর ধারণা আপনি জানেন। সে ওখানে যেতে চায়। খুব কষ্টকর যাওয়া এবং সময় এবং খরচসাপেক্ষ। আমি জানি না কিভাবে ওখানে পৌঁছাবো। কিন্তু সত্যি যদি ক্যানগুলো পাওয়া যায় তাহলে গুপ্তধন পাওয়া হয়ে যাবে।'

খপ করে অরিন্দমের হাত চেপে ধরে বললেন ভদ্রলোক, 'আপনি যাবেন ? সত্যি ?'

'আমি এখনও মনস্থির করিনি।'

'করুন। আমি আপনার ওপর ভরসা করব। যাওয়া আসার সমস্ত খরচ আমি দেব। আর কিছু মনে করবেন না, আপনার এই সময়টার দামও।'

'ঠিক আছে। যদি যাই তাহলে আপনাকে জানাব। আজ উঠি।'

'অরিন্দমবাবু, প্রমিজ করুন আপনি যাবেন। একটা প্রতিশ্রুতি হয়তো অনেক ওষুধের চেয়ে আমার কাছে মূল্যবান। এই মুহূর্তে।' ব্যাকুল হলেন ভদ্রলোক। এবং তখনই তাঁর স্ত্রী এসে দাঁড়ালেন সামনে। দুটো হাত জড়ো করে অরিন্দম বলল, 'নমস্কার। কোথায় যেন পড়েছিলাম উপন্যাসের যেখানে শেষ, জীবনের শুরু সেখানেই। মনে হচ্ছে সেই সত্যেই আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারব। তবু, ভেবে দেখি। চলি।'

খবরের কাগজে অনেকটা জায়গা নিয়ে নিল বসন্ত। ভেঙে পড়া বিমানের সন্ধানে যাচ্ছে সে। দলের সদস্যদের নাম শিগগির ঘোষণা করা হবে। তার পরিচালিত ছবির ক্যানগুলো উদ্ধার করা যদি সম্ভব হয় তাহলে। না, পাহাড়ে ওঠার কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা তার নেই। চোদ্দ হাজার ফুট ওপরে স্যুটিং করার জন্যে অভিজ্ঞতার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এবার হবে। সরকারী অনুমতি এবং অর্থ সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। খবরটা দেখে অরিন্দম হাসল, 'তাহলে কাজ শুরু করে দিয়েছ।'

'এক ফোঁটাও নয়। কিন্তু ওকথা না বললে লোকে বিশ্বাস করবে না।'

'বাজেট করেছ?' অরিন্দম চোখ বন্ধ করল।

বসন্ত বলল, 'এর আবার বাজেট!'

অরিন্দম মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, বাজেট। প্রায় দেড় মাসের প্রোগ্রাম। পনের দিনের যাওয়া, পনের দিনের আসা, পায়ে হেঁটে। কলকাতা থেকে শেষ বাস-টার্মিনাস পর্যন্ত যাওয়া আসা তো আছেই। খালি হাতে যাওয়া যাবে না। তাঁবু, খাবার ওষুধ থেকে শুরু করে ওই পরিবেশে জীবন ধারণের সবরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ব্যাপারটা ছেলেমানুষি নয়। আর সেরকম হলে আমি যোগ দিতে পারি না। তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ?'

বসন্ত হতভম্ব হয়ে গেল। তার কথা বলতে সময় লাগল, 'আপনি যোগ দেবেন?'

'হ্যাঁ। দেড় মাসের জন্যে ঘুরে আসা যাক।' যেন কাছাকাছি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে এমন গলায় বলল অরিন্দম। বসন্ত লাফিয়ে উঠল। দুহাতে অরিন্দমের হাত জড়িয়ে ধরল। ও কথা বলতে পারছিল না। অরিন্দম হাসল, 'এবার বাজেট করে ফেল বসন্ত।'

'করছি দাদা।'

'আর দেখো, এ বাজেট যেন ফিল্মের বাজেট না হয়।'

'মানে ?'

'ছ' লাখ টাকায় ছবি হয়ে যাবে বলে প্রোডিউসারকে নামিয়ে আট লাখে শেষ করার মত বাজেট, মানে নিজেদের ওই বরফের ওপর রেখে দিতে হবে।'

'আমি সেই মহান পরিচালকদের মধ্যে পড়ি না দাদা।'

একটি অনুসন্ধানকারী দল হিমালয়ে যাচ্ছে হারিয়ে যাওয়া ক্যান খুঁজতে, খবরটা আরও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল যখন অরিন্দমের নাম তার সঙ্গে যুক্ত হল। নিউ থিয়েটার্সের এক নম্বর স্টুডিওতে ওদের ছবির জন্যে নেওয়া ঘরটিতে বসন্ত অফিস বসাল। অরিন্দম স্টুডিওতে আসে না। অতএব এই অফিসে তাকে পাওয়ার সম্ভাবনাই নেই। বসন্তকেই যোগাযোগ করতে হয়। মানুষটির মাথায় কি চমৎকার পরিকল্পনা খেলে যায় তা যোগাযোগ না রাখলে বসন্তর অজ্ঞাত থাকত। এতে লাভ হচ্ছে তাদেরই। পুরো ব্যাপারটা তাকেই খেটে করতে হচ্ছে। অরিন্দমের পরামর্শে সে ওই স্যুটকেস কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তারা সোৎসাহে এগিয়ে এসেছে। যদি ক্যান পাওয়া যায়, যদি তাদের কোম্পানির স্যুটকেস অক্ষত থাকে তাহলে সারা পৃথিবীতে হৈ-চৈ ফেলে দেওয়া যাবে। যে কোন বিজ্ঞাপনের চেয়ে এই একটি ঘটনা তাদের বিক্রি লক্ষগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। এই অভিযানের জন্য তারা একটা মোটা টাকার দায়িত্ব নিল। ঝুঁকি অবশ্যই ছিল, স্যুটকেসটি খুঁজে পাওয়া যাবে এমন আশা যেখানে করাই যাচ্ছে না সেখানে টাকাটা জলে যাবে বলে আশঙ্কা ছিল। কিন্তু পাওয়া গেলে অরিন্দম সেই পরিবেশে ওটি হাতে নিয়ে যদি ছবি তোলে, ঝুঁকিটা বিরাট হলেও তারা রাজি হল।

প্রযোজক এখনও নার্সিংহোমে। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের একটা রাস্তা বের হল। সেটা করলেন তিনি নিজেই। নার্সিংহোমের একজন কর্মীর মাধ্যমে তিনি গোপনে জানালেন যে এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। সমস্ত খরচের অনেকটাই তিনি দেবেন এবং সেটা যেন প্রকাশ না করা হয়। তিনি টাকার অঙ্কটা জানতে চেয়েছেন।

বসন্ত বাজেট করেছিল। শিলিগুড়ি থেকে পাহাড়ে উঠতে হবে। প্রথমে জিপে তারপর হাঁটাপথ। ম্যাপ আছে। কিন্তু সেই ম্যাপ চিনে যেতে একজন গাইডের সাহায্য দরকার। তাঁবু, মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পোর্টার দরকার। খরচের অঙ্কটা দেখে সে অস্বস্তিতে ছিল।

সেদিন অফিসে বসতে ইবিক্রম সেন এল। বিক্রম তার ছবির ক্যামেরাম্যান। এর আগে একবার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। এসে বলল, 'ব্যাপারটা কি বলুন তো বসন্তবাবু ?'

'কিসের কি ব্যাপার ?'

'আপনি নাকি হারানো ক্যানের সন্ধানে যাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি বুঝতে পারছি না আপনার মাথা ঠিক আছে কিনা!'

'বিক্রম, এই কথাটা শুনে শুনে আমি ক্লান্ত।'

'ও। আপনি ঠিক কি করতে চাইছেন ?'

'আমি সেই জায়গায় যেতে চাই যেখানে প্লেন ভেঙে পড়েছে!'

'সে তো শুধু পাহাড় আর পাহাড়।'

'ঠিক কথা।'

'তা ছাড়া সরকার যেখানে যেতে সাহস করছে না।'

'ভুল কথা। সরকারী তদন্ত দল ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছে।'

'ও। তারাই বলতে পারবে স্যুটকেসটা আছে কিনা।'

'তারা মৃতদেহ তুলে নিয়ে আসতে গেছে। হেলিকপ্টারে নির্দিষ্ট স্পটে পেঁছে তারা দড়ির সিঁড়ি ব্যবহার করে নিচে নামবে। এই রকম তদন্ত আমাদের সাহায্য করবে না।'

এই সময় অরিন্দমের গাড়ি এসে দাঁড়াল অফিসের সামনে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে সে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, 'কি খবর বসন্তবাবু, সব ঠিক চলছে ?'

বসন্ত উঠে দাঁড়াল, 'আরে আপনি। আসুন আসুন।'

'তারিখ কবে ? দ্যাখো ভাই, আমার অন্যান্য প্রোডিউসারদের তো ডোবাতে পারি না। যা করবে তাড়াতাড়ি করে ফেল।' অরিন্দম আয়েস করে বসল।

বসন্ত বলল, 'তাঁবু আর স্লিপিং ব্যাগ ভাড়া পাওয়া যাবে। তবে তার আগে আমাকে নর্থবেঙ্গলে যেতে হবে ওখানকার ব্যবস্থা ঠিক করে আসতে।'

'যা করার কর। আমার পক্ষে বেশি দেরি করা সম্ভব নয়।'

'বেশি দেরি করাও যাবে না। মনসুন এসে গেলে ও তল্লাটে পা রাখা যাবে না।'

'তাহলে ?'

'আমরা ঠিক পনের দিন পরে রওনা হতে পারি।'

'ফুড। টাকা পয়সা ?'

'পেয়ে যাব আশা করছি। যদি অবশ্য সবাই প্রতিশ্রুতি রাখেন।'

'বেশ। আমি উঠি তাহলে।'

এই সময় বিক্রম কথা বলল, 'দাদা, আপনি যাচ্ছেন ?'

মাথা নাড়ল অরিন্দম, 'হ্যাঁ। ঘুরেই আসি। এমন সুযোগ তো জীবনে পাওয়া যায় না।'

'ও! হ্যাঁ বসন্ত, আমাদের দলে কজন থাকছে ?'

বসন্ত কিছু বলার আগেই বিক্রম বলল, 'আর একটা নাম বাড়িয়ে নিন। আমিও যাচ্ছি।'

বসন্ত অবাক হল, 'তুমি ?'

'আপত্তি আছে ?' বিক্রম যেন রেগে গেল।

'কিন্তু!' বসন্ত বুঝতে পারছিল না।

দেখুন বসন্তবাবু, আপনি ছবিটার পরিচালক হতে পারেন। কিন্তু আমি এই ক্যামেরায় ছবি তুলেছি। প্রতিটি ফ্রেম তোলার সময় সন্তানের মত ভালবেসেছি। যে ক্যানগুলো হারিয়েছে তার ভেতর আমারই সৃষ্টি রয়েছে। একটা ছবি যখন হিট করে তখন নাম হয় আপনাদের। কিন্তু আমরা যে রক্ত দিয়ে ছবিটাকে তুলেছি তা কেউ মনে রাখে না। ক্যানে যদি ফিল্ম বেঁচে থাকে তাহলে সবচেয়ে খুশি হব আমি। সেই কারণেই আমি যেতে চাইছি।' বিক্রম কথা বলছিল বেশ আবেগের সঙ্গে। বসন্ত কি জবাব দেবে বুঝতে পারছিল না। পরিস্থিতি সহজ করল অরিন্দম, 'বাঃ, খুব ভাল হল। বিক্রম, দ্যাখো কম পয়সায় একটা ক্যামেরা ভাড়া পাও কিনা! তাহলে সত্যিকারের অভিযানের ছবি তুলতে তুলতে যেতে পারবে।'

কথাটা শোনামাত্র বিক্রমের মুখের চেহারা পাল্টে গেল, 'দারুণ ব্যাপার হবে দাদা। এই প্রথম একটা স্যুটিং করব যার স্ক্রিপ্ট নেই, পরিচালকের কাট্ শুনতে হবে না। কিন্তু— !'

'কিন্তু আবার কি ?' অরিন্দম যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে থমকে গেল।

'অন্তত তিরিশ রোল ফিল্ম আর ক্যামেরার ভাড়াও তো কম নয়।'

'বাবু ধরো।' নির্লিপ্ত মুখে বলল অরিন্দম।

'বাবু ?'

'যিনি এসবের দাম দেবেন। স্পন্সরার।'

খবরটা যে ছড়িয়ে পড়েছে টালিগঞ্জের কোনায় কোনায় তা বুঝতে পারেনি অরিন্দম। গাড়ির সামনে এসে সে দেখল পাঁচ ছয়জন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এদের

বিভিন্ন ছবিতে কাজ করার সময় সে আলো ফেলতে দেখেছে চুপচাপ, কাউকে জল চা পরিবেশন করতে দেখেছে। এরা সবাই বয়স যাই হোক তাকে দাদা বলে সম্বোধন করে। এদের নামগুলো খেয়ালে থাকে না অরিন্দমের। ওদের মধ্যে যে প্রবীণ সে এগিয়ে এল, 'দাদা, খবরটা কি সত্যি ?'

'কোন খবরটা ?' অরিন্দম মুখ তুলল।

'পাহাড়ে যাচ্ছেন ক্যান খুঁজতে।'

'হ্যাঁ। সত্যি। কেন বল তো ?'

'তাহলে আমরাও যাব। অ্যাদ্দিন এই ছবিতে কাজ করলাম, খুঁজে পেলে আমাদেরও ভাল লাগবে।'

বসন্ত পেছনে ছিল। সে একটু প্রতিবাদের সুরে বলল, 'কিন্তু প্রায় দেড় মাসের ধাক্কা। আর এটা কোন শ্যুটিং-এর ব্যাপার নয় যে প্রোডিউসার তোমাদের টাকা দেবে। অদ্দিন রোজগার না থাকলে তোমাদের অসুবিধে হবে।'

লোকটি বলল, 'মাঝে মাঝে মাসের পর মাস তো কাজের অভাবে বসে থাকি। শত্রু ছবি রিলিজের আগে স্টুডিও যখন শ্মশানপুরী ছিল তখন কাজ পেতাম ? যে দাদার ডেট পায় না প্রোডিউসাররা, সেই দাদা যখন বিনি পয়সায় যাচ্ছেন তখন আমরাও যাব।'

অরিন্দম বসন্তর দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'নাও হে বসন্ত। ওদের নাম লিখে নাও।'

বসন্ত নিচু গলায় বলল, 'এরকম চললে তো পুরো ইউনিট সঙ্গে যাবে।'

'যায় যাবে। পরিচালক হিসেবে তোমার যে টান ওই ছবির ওপর একটা প্রোডাকসন্সবয়ের যদি সেই টান থাকে তবে বুঝতে হবে কাজটা আন্তরিক হচ্ছে।'

অরিন্দম দাঁড়াল না। গাড়িটা নিয়ে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে চালিয়ে আসছিল ট্রাম ডিপোর দিকে। টেকনিসিয়ান স্টুডিওর দরজায় কেউ চিৎকার করতেই সে ব্রেকে চাপ দিল। বীরেনদা। অরিন্দমের প্রথম ছবির পরিচালক। কফিহাউসের আড্ডা থেকে ভদ্রলোক তাকে তুলে এনে নায়ক করেছিলেন। এক সময় গোটা চারেক হিট ছবি তৈরি করেছিলেন। এখন কাজ পান না। বয়স হয়েছে সত্তরের কাছে। চোখেও কম দ্যাখেন। গাড়ির কাছে ছুটে এলেন বীরেনদা। বিরক্ত হল অরিন্দম। এইবার দশ বিশ সাহায্য চাইবেন ভদ্রলোক। ইদানিং ব্যাপারটা সেই পর্যায়ে নেমে এসেছে। কৃতজ্ঞতাবোধ ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে এই কারণে।

বীরেনদা জানলায় ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চিনতে পারছ ?'

'বাঃ। রোজ এক প্রশ্ন করেন কেন দাদা।'

'গুড। শুনলাম তুমি এন টি ওয়ানে এসেছ। তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। একটু আগে আর একটা খবর শুনলাম। সত্যি?' বীরেনদার কয়েক দিনের না-কামানো মুখে কৌতূহল। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল অরিন্দম। সঙ্গে সঙ্গে একটা শীর্ণ হাত এসে পড়ল অরিন্দমের মাথায়, 'আঃ। দীর্ঘজীবী হও বাবা। এই না হলে মানুষ। খুব খুশি হয়েছি। একটা ছবির জন্যে অত কষ্ট করতে যাচ্ছ, এ ভাবলেই বুক ফুলে ওঠে। ঠিক হ্যায়।' বীরেনদা হাসিমুখে ফিরে গেলেন টেকনিসিয়ানের গেটের দিকে।

বাড়ি ফিরে আচ্ছন্নের মত বসেছিল অরিন্দম। বীরেনদা তাকে স্রেফ আশীর্বাদ করার জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন? আর সে টাকার কথা ভাবছিল। লজ্জিত হতে গিয়ে হেসে ফেলল সে শব্দ করে। মহৎ হবার লোভ কার না থাকে? তার নিজের নেই? নইলে সে যাচ্ছে কেন পাহাড়ে? এই সময় চাকর এসে দাঁড়াল দূরে। অরিন্দম বিরক্ত হল, 'কি চাই?'

'আপনার ফোন।'

'বলে দে বাড়ি নেই।'

'এর আগে দুবার করেছিল। এখন শুনতে চাইছে না।'

'শুনতে চাইছে না? রিসিভার নামিয়ে রেখে দে।'

চাকর চলে যাচ্ছিল। পেছন থেকে ডাকল অরিন্দম, 'নাম বলেছে কিছু?'

'না। একজন মহিলা।'

অরিন্দম চোখ ছোট করল। তারপর উঠে দাঁড়াল, 'ঠিক আছে যা, আমি দেখছি।'

অরিন্দম ছোট ছোট পা ফেলে টেলিফোনটার কাছে এগিয়ে গেল।

বিচিত্র ব্যাপার। হারানো ক্যানের সন্ধানে যাওয়ার জন্যে যে টিমটা শেষ পর্যন্ত তৈরি হল তার সঙ্গে মূল ছবির ইউনিটের খুব বেশি তারতম্য নেই। বাকি ছিলেন

মহিলারা। নীতা এখন বোম্বেতে ব্যস্ত। কল্পনার সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না ফিরে আসার পর। অবশ্য ওদের কথা ভাবার মত অবসর ছিল না। প্রোডিউসার হরিশ মল্লিকের কাছ থেকে বকেয়া টাকা আদায় করার জন্যে কলাকুশলী শিল্পীদের মধ্যে চাপা আলোচনা হয়েছিল। ছবি রিলিজ হোক বা না হোক নির্দিষ্ট দিন পূর্ব-চুক্তিমত কাজ করলে প্রযোজক টাকা দিতে বাধ্য। এমন অনেক ছবি টালিগঞ্জে হয়েছে যা পরিবেশকের অভাবে জীবনে হল-এ যাবে না। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রেও কলাকুশলী-দের টাকা মিটিয়ে দিতে হয়েছে। আসলে যে মানুষগুলো প্রতিদিন উদয়াস্ত খেটেছে তাদের এটাই যখন জীবিকা তখন তারা ছাড়বে কেন? এক্ষেত্রে ছবিটার ক্যানগুলো নষ্ট হয়েছে বলে তাদের কোন দায় নেই। নষ্ট না হয়ে যদি বিশেষ কোন কারণে মুক্তি না পেত তাহলে একই দশা হত। যখন এই রকম ভাবনা দানা বাঁধছিল তখনই বসন্ত হারানো ক্যানের সন্ধানে যাওয়ার কথা ঘোষণা করল। সেই সঙ্গে হরিশ মল্লিকের অসুস্থতার খবর কলাকুশলীদের হৃদয়কে কোমল করল। তারা বুঝে গেল যে সব ছবির প্রযোজক শ্রমের মূল্য দিতে চান না সেই সব ছবি রিলিজের আগে আটকে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের আছে। এ ব্যাপারে ইউনিয়ন মদত দেবে। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু করার নেই। হরিশ মল্লিক যদি মারা যায় অথবা জীবনে আর ছবি না করে তাহলে তাদের প্রাপ্য আদায় করার কোন পথ নেই। প্রোডাকশন ম্যানেজার অনন্ত পরামর্শ দিয়েছিল যদি বসন্তবাবু ওই ক্যানগুলো অক্ষত উদ্ধার করতে পারেন তবেই তাদের পকেটে টাকা আসবে। শুধু তাই নয় যে ছবি চির-কালের জন্যে শেষ হয়ে গেছে তা উদ্ধার করার জন্যে ওরা আলাদা বোনাস দাবি করতে পারে। গুপ্তধন আবিষ্কারের দলে যারা থাকে তারা কি আর বঞ্চিত হয়! এই শেষ যুক্তিটি সবাইকে উৎসাহিত করল বেশি করে।

খারাপ রাস্তা, কঠোর পরিশ্রম, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ইত্যাদির কথা বলেও অনন্ত দশজনের নিচে সংখ্যাটা নামাতে পারল না। একমাত্র অনন্তকে বাদ দিলে প্রত্যেকেই কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। দীর্ঘদিন অর্ধভুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা যাদের কলকাতাতেই আছে তাদের পাহাড়ে ভাল খাবার না পাওয়ার ভয় দেখিয়ে কাজ হল না। বসন্ত অনুভব করছিল এরা সবাই এক ধরনের স্বপ্ন দেখছে। ছবির ক্যান-গুলো পাওয়ামাত্র এরা সবাই হরিশ মল্লিকের অংশীদার হয়ে যাবে। এই টালিগঞ্জেই একজন প্রযোজক ছবি অসমাপ্ত রেখে সরে পড়েছিলেন। সেই ছবির কলাকুশলীরা মিলিতভাবে ছবিটি শেষ করে মুক্তির ব্যবস্থা করেছিল। সরে যাওয়া প্রযোজক তাদের মালিকানার অর্ধাংশ দিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও মুক্তির এক সপ্তাহের বেশি

সেটি চলেনি কিন্তু এধরনের একটা উদাহরণ তো আছেই। অর্থাৎ যে যাবে এই অভিযানে সেই অংশীদার হবার একটা দাবি রাখতে পারে। এই দশ জন মরীয়া।

তাঁবু, স্লিপিং ব্যাগ থেকে শুরু করে যা যা দরকার তা বসন্ত যোগাড় করে ফেলল। এটা সে বুঝতে পারছিল এই রকম অভিযানে একা যাওয়া আত্মহত্যার সামিল। দলের সাহায্য ছাড়া গন্তব্যস্থলে পেঁছানোই যাবে না। এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করল সহদেব সেন। সহদেব পাহাড়ে চড়া মানুষ। বসন্তর বাল্যবন্ধু। মানা নন্দাঘুণ্টি অভিযানে ছিল। আনন্দবাজারে নিজের অভিজ্ঞতার কথাও লিখেছে কয়েক কিস্তিতে। সহদেব এইরকম অভিযান হচ্ছে জেনে উৎসাহী হয়ে এগিয়ে এল। শেষ পর্যন্ত তার ওপর আয়োজনের ভার ছেড়ে দিল বসন্ত। তার ফলে স্যুটিং পার্টির বদলে পর্বতাভিযানের চেহারা নিয়ে নিল উদ্যোগটা।

অবশ্য প্রোডাকশন ম্যানেজার অনন্ত চুপচাপ বসে ছিল না। সে কথা শুরু করেছিলই এইভাবে, 'এতদিন এই লাইনে রইলাম, চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারি কোন খাতে টাকা মার যাচ্ছে, কে সকালের চা পেল না। আমি না গেলে এসব হ্যাপা সামলাবে কে? সহদেববাবু পাহাড়ি মানুষ, তিনি যা করছেন করুন। কিন্তু আমাব কাজটা আমাকে করতে দিন। দার্জিলিং মেলের টিকিট পাবেন আপনারা? শিলিগুড়ি থেকে ভেঙে পড়া প্লেন পর্যন্ত দুবেলা খাবারের ব্যবস্থা তো এই শর্মাকেই করতে হবে।'

অতএব দলটা তৈরি হয়ে গেল। যে কোম্পানির স্যুটকেস হারিয়েছে তারাও স্পন্সরার হিসেবে এগিয়ে এল। টাকা লেনদেনের আগে বসন্ত আবার মুস্কিলে পড়ল। কোম্পানি চাইছে টাকা যখন খরচ করা হচ্ছে তখন তা থেকে পুরো ব্যবসাটা করে নিতে। তারা টাকা খরচ করল এবং স্যুটকেস খুঁজে পাওয়া গেল না অথবা পাওয়া গেলেও সেটাকে টুকরো টুকরো অবস্থায় আবিষ্কার করা হল এমনটা চলবে না। কোন ঝুঁকি নিতে পারবে না কোম্পানি। বসন্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'পাওয়া না গেলে কি করব?'

'আপনাদের পেতেই হবে। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।'

'সেটা কেউ গ্যারাণ্টি দিয়ে বলতে পারে?'

'আপনাদের বলতে হবে। আর পাওয়ার পর যদি দ্যাখেন টুকরো হয়ে গেছে তাহলে সেটা ভুলে যেতে হবে।'

'সেকি! আপনারাই তো বিজ্ঞাপন দিয়েছেন কত হাজার ফুট ওপর থেকে পড়েও ভাঙেনি।'

'ঠিক কথা। কিন্তু দুর্ঘটনা তো ঘটতেই পারে। যে ভাল গাড়ি চালায় সে কি অ্যাকসিডেণ্ট করে না ?'

বসন্ত হকচকিয়ে গেল। তারপর সমস্যাটা তুলে ধরল, 'স্যুটকেস পাওয়া গেছে বললে বলতে হবে ক্যানগুলো পেয়েছি। ব্যাপারটা আপনি ভাবতে পারছেন ?'

'হ্যাঁ। স্যুটকেস অটুট থাকলে ক্যানগুলো থাকবে। কিন্তু উত্তাপে ক্যানের ভেতরের ফিল্ম নষ্ট হয়ে যেতেই পারে। এটা তো বৈজ্ঞানিক সত্য। যে কেউ বিশ্বাস করবে।'

'তার চেয়ে অনেক বেশি বিশ্বাস করবে যদি স্যুটকেসটাকেই না পাওয়া যায়।' হিমালয়ের একটি বিশেষ অংশে প্লেন ভেঙে পড়েছে। অত উঁচু থেকে পড়ে দশ বিশ মাইল ছিটকে যাওয়া অসম্ভব নয়। তাছাড়া পাহাড়ের খাঁজে পাথরের আড়ালে তুষারের তলায় চাপা পড়ে থাকাই স্বাভাবিক। আমরা খুঁজতে যাচ্ছি শুধু জেদের বশবর্তী হয়ে। বলতে পারেন ইমোশনাল এক্সপেডিশন। খুঁজে পেলেই হবে না, সব যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে পায়ের তলায় মাটি আসবে সারা জীবনের জন্যে। গেলাম, কিছুই পেলাম না, খালি হাতে ফিরে এলাম, এরকম হলে—।'

'স্যুটকেস হাতে নিয়ে ফিরবেন। যেদিন রওনা হবেন সেদিন কিছু জ্বলে যাওয়া ফিল্ম ক্যানে ভরে একটা স্যুটকেস হাজির হবে আপনার কাছে। আপনি ছাড়া ব্যাপারটা কেউ জানবে না। যাওয়ার সময় একটা কভার লাগানো থাকবে। অরিজিন্যালটা পেলে এটার গায়ে হাত দেবেন না। না পেলে কভার ফেলে দিয়ে— বাকিটা বুঝতেই পারছেন। তোবড়ানো দাগশুদ্ধ পাবেন মালটা। এত টাকা খরচ করে এটুকু নিশ্চয়ই আশা করতে পারি, বলুন।'

যেন কোন রহস্য উপন্যাসের ভিলেনের মুখের সংলাপ শুনছে বসন্ত এমন ভাবে তাকিয়ে থেকে শেষতক মাথা নাড়ল, 'ইম্পসিবল। আমার দ্বারা এরকম জুয়োচুরি সম্ভব হবে না।'

'আপনি কেস করতে যাবেন! আমরা বিকল্প ঠিক করে রেখেছি। এই অভি-যানে আর একজন সদস্য আপনাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। তার কাছেই কভার দেওয়া স্যুটকেস থাকবে। লোকটার নাম ঠক্কর।'

সেদিনই ঠক্করকে দেখল বসন্ত। মেদবর্জিত লম্বা শরীর। তাকালেই বোঝা যায় ক্যারাটে বা ওই জাতীয় ব্যাপারে সুদক্ষ। বাঁ চোখের ওপরে পুরু কাটা দাগ রয়েছে। যেভাবে হেঁটে এল তাতে সামরিক বাহিনীতে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকাও অসম্ভব নয়। স্টুডিওতে এসে বসন্তর সামনে দাঁড়াতেই প্রত্যেকের নজর

কেড়ে নিল লোকটা। কেমন একটা সাপের মত হিলহিলে ভাব আছে চাহনিতে। মাথার চুল আধ ইঞ্চির কম সমানভাবে ছাঁটা। এসে বলেছিল, 'আপনাদের প্রোগ্রামটা দিন। আমার নাম শুনেই বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই কেন এসেছি।'

'হ্যাঁ। পাহাড় সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা আছে?'

চোখের পাতা না ফেলে মাথা নেড়েছিল ঠক্কর। এবং তখনই বসন্তর মনে হয়েছিল প্রবচনটি যথার্থ, সাপের চোখে পলক পড়ে না। সে চলে যাওয়ার পর ইউনিটের একজন ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'লোকটা কে বসন্তদা?'

বসন্ত উত্তর দিয়েছিল, 'শুনলে তো!'

'কিন্তু লক্ষ করেছেন, ওর চোখের পাতায় লোম নেই।'

বসন্ত সোজা হয়ে বসল। এই লোকটার নিশ্চয় আলাদা পরিচয় আছে। এবং সেই পরিচয় মনে হচ্ছে স্বস্তিদায়ক নয়। এমন লোককে তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছে স্পন্সরার, এইটে মেনে নেওয়া ঠিক হবে কি? বসন্ত ঠিক করল অরিন্দমের সঙ্গে এ-ব্যাপারে খোলাখুলি কথা বলবে। স্পন্সরারকে না চটিয়ে একমাত্র অরিন্দমের সঙ্গেই কথা বলা যায়।

যন্ত্রটা একজন প্রোডিউসার তাকে উপহার দিয়েছিল। ব্যবহার করার মানে হয় না বলেই ওর বোতামে হাত দেয় না অরিন্দম। কিন্তু আজ দিল। রিসিভারটা তুলে হ্যালো বলে যখন তাকে পনের সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হল তখনই আঙুল চলে গেল বোতামের ওপর, চাপটা পড়ল এবং যন্ত্রটা ঘুরতে লাগল। দশ সেকেন্ডের অনেক কমে এখন একশ মিটার দৌড়ে যাচ্ছে কানাডা আমেরিকার মানুষেরা। জবাব দিতে যার তার চেয়ে বেশি সময় লাগে সে সুবিধের নয়। অরিন্দম তার নিজস্ব ভঙ্গিতে বলেছিল, 'আমার কণ্ঠস্বরটা শুনবেন বলে যদি ডেকে পাঠিয়ে থাকেন তো ধন্যবাদ, রাখছি।'

আর তখনই ঝটপটিয়ে শব্দ ফুটল ওপারে, 'সরি! আসলে, আমি—।'

রিসিভার রাখল না অরিন্দম। একধরনের স্বর আছে যা আদৌ মেয়েলি নয় আবার ছেলেদের মত কাঠকাঠ না হয়ে একটা মিষ্টি মৌতাত ছড়ায়, এ সেই ঘরানার। সেটাকেও উপেক্ষা করল অরিন্দম, 'বলুন, কি বলছেন? আমি অরিন্দম।'

'এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। থ্যাঙ্কস।' সামান্য হাসি বাজল কি বাজল না।

'বুঝতে পেরেছেন! আমি কি আগে আপনার সঙ্গে কথা বলেছি?'

'না-না। সে সুযোগই ছিল না। ইন ফ্যাক্ট গতকালই আমি আপনার ছবি প্রথম দেখি।'

কথাটা মোটেই ভাল লাগল না অরিন্দমের। কিন্তু অভিজ্ঞতা তাকে শিখিয়েছে এইসব সময়ে উদাসীন হয়ে থাকাটাই লাভজনক। সে বলল, 'আ-চ্ছা! আপনার পরিচয় জানতে পারছি না কিন্তু।'

'সেটা জানানোর মত নয়। অ্যাট লিস্ট আপনার পরিমন্ডলে।'

'দেখুন। এভাবে কথা বলে তো কোন লাভ হবে না। আপনি কি জন্যে ফোন করছেন?'

'আপনি প্লেনটাকে খুঁজতে যাচ্ছেন?'

অরিন্দমের কপালে ভাঁজ পড়ল। সে নিচু গলায় বলল, 'যাচ্ছি!'

'কজনের দল আপনাদের?'

'আমি ঠিক জানি না। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনার ইন্টারেস্ট কিসের!'

'আপনি কি জানেন গভর্নমেন্ট হেলিকপ্টার সার্ভিসে যে কটি ডেডবডি পেয়েছে তুলে এনেছে! এও ঘোষণা করা হয়েছে ওখানে আর কোন কিছু আশা করার নেই।'

'জানি। কিন্তু শিলং থেকে কলকাতায় এসে আপনি শুধু এই খবরটুকু পেলেন?'

'মানে?' আচমকা ওপাশে কেউ সচেতন হল।

'আপনারও তো ওই স্পটে যাওয়ার কথা! তা আমি বলি কি, আমার বাড়িতে চলে আসুন। কথাবার্তা বলে ঠিক করে নেওয়া যাবে রাস্তাটা।' অরিন্দমের কথা শেষ হওয়া মাত্র ওপাশে রিসিভার নামিয়ে রেখে দিয়েছিল। তারপর অন্তত পাঁচ-বার অরিন্দম টেপটা বাজিয়ে সংলাপ শুনেছে। ভদ্রমহিলা অবশ্যই শিক্ষিতা। ইংরেজি শব্দ বিশেষ করে গবমেন্ট না বলে গভার্নমেন্ট বলেছেন। আবার সেই সঙ্গে পরিমন্ডলের মত খটমটে বাংলা শব্দ ব্যবহার করতে অসুবিধে বোধ করেননি। ভদ্রমহিলা যেহেতু তার ছবি মাত্র গতকালই প্রথম দেখলেন, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে বাংলা ছবি দ্যাখেন না অথবা দেখার সুযোগ পান না। শেষেরটি যদি সত্যি হয় তাহলে দুর্ঘটনার রাত্রে পাহাড়ে যে রহস্যময়ীকে ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালাতে দেখেছিল তিনি এতদিনে জানান দিলেন। ওসব জায়গায় বাংলা ছবি যায় না। কিন্তু যেভাবে লাইন কেটে দিলেন মহিলা তাতে ফোন করার আসল উদ্দেশ্যটা বোঝা যাচ্ছে না। এতবার শুনেও না। অরিন্দমের মনে পড়ল সেই লোকটার কথা,

যে এয়ারপোর্টে রহস্যময়ীর সঙ্গী হয়ে এসেছিল। সে কি করছে?

এই সময় বসন্ত এল। অরিন্দম তাকে দেখে খুশি হল, 'এসো বাঙালী, জাগো। কত দূর!'

'সব রেডি। শুধু— ।'

'দাঁড়াও। তুমি তো ডিরেকটার। পাশটাস করা। সংলাপগুলো শোন তো হে।' অরিন্দম টেপ চালিয়ে দিল। হকচকিয়ে গিয়েছিল বসন্ত। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'এ তো আপনি!'

'ওটা কোন আবিষ্কার নয়। শুনে যাও।'

বসন্ত শুনল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কে এই ভদ্রমহিলা?'

'দ্যাটস দ্য কোশ্চেন। বসন্তবাবু, ওখানে আর কিছু আশা করার নেই বলে যিনি আমাকে বিরত হতে বলছেন তিনি কিন্তু নিজে নিরাশ হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না।'

'তার মানে ওই মহিলাও ভাঙা প্লেনের সন্ধানে যাচ্ছেন। কেন? কি ব্যাপার?'

অরিন্দম রহস্যময় হাসি হাসল। বসন্ত উদভ্রান্ত হল, 'না দাদা, এ হতে পারে না। ওই স্যুটকেস আর ক্যানগুলো যদি ঠিক থাকে তাহলে যে কেউ ওটাকে উদ্ধার করে কাজ হাসিল করে নিতে পারে।'

'কি পাগলের মত কথা বলছ! ওই ফিল্ম যদি কেউ খুঁজেও পায় তাহলে কাজকর্ম শেষ করে এদেশে রিলিজ করতে পারবে? আইন নেই? ছবি তৈরি করার আগে অনুমতি নিতে হয় না?' অরিন্দম তাচ্ছিল্যের সুর আনল গলায়।

'কিন্তু ওটা যদি বাংলাদেশে পাচার হয়ে যায় তাহলে চেহারা পাল্টে যাবে। না না দাদা, আপনি এভাবে হাসবেন না। ব্যাপারটা ক্রমশ গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে।'

'আবার গোলমাল কিসের?'

বসন্ত জবাব দিতে যাচ্ছিল, বস্তুত ঠক্করের চেহারাটা তার চোখের সামনে থেকে কিছুতেই সরছিল না, কিন্তু তখনই টেলিফোন বেজে উঠল। অরিন্দম রিসিভার তুলে অপেক্ষা করতেই ওপাশ থেকে মহিলা কণ্ঠে হেলো হেলো চিৎকার শোনা গেল। অরিন্দম স্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'ঠিক কাকে খুঁজছেন বলুন।'

'ও। কেমন আছেন? আমি কল্পনা। শুনলাম বসন্তদা আপনার কাছে গিয়েছেন।'

'এসেছেন। কিন্তু এটা তো তাঁর টেলিফোন নয়।'

'নয় জানি। আচ্ছা, আপনি এভাবে কথা বলেন কেন? আপনি কি আমাকে

চিনতে পারছেন না ? নাকি আমি বলেই এইরকম বলছেন।'

অরিন্দম হেসে ফেলল, 'তোমার বয়স অল্প। তাছাড়া যাদবপুরের গন্ধ সারা গায়ে জড়ানো। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না। তবে— ; নাও কথা বল।' রিসিভার এগিয়ে দিয়ে অরিন্দম বলল, 'তোমার ছবির নায়িকা। ভয় নেই, এই প্রথম এখানে ফোন করল।'

বসন্ত এমনিতেই বিধ্বস্ত ছিল। এরকম সময়ে কল্পনার টেলিফোন এই বাড়িতে আসবে ভাবতেই পারেনি। সে রিসিভার কানে লাগিয়ে বলে যেতে লাগল, 'হ্যাঁ, বসন্তদা বলছি, খুব ব্যস্ত বুঝলে। রওনা হচ্ছি। চেষ্টা করব যে করেই হোক ক্যান উদ্ধার করতে। তুমি না হয় ঘুরে এলে—, কি বলছ ? অ্যাঁ। সর্বনাশ। তুমি যাবে কি ? মাথা খারাপ হয়েছে ? আমরা কি স্যুটিং করতে যাচ্ছি। বুঝলাম, ছবিটার সঙ্গে তোমারও কেরিয়ার জড়িয়ে, কিন্তু রিস্ক হয়ে যাবে।'

অরিন্দম উঠে দাঁড়িয়েছিল। ঈষৎ ঝুঁকে বলল, 'অনুমতিটা দিয়েই দাও হে। বিদেশী ছবির অভিযানে দেখেছি সবসময় দুএকজন মহিলা থাকে, আমাদেরও খারাপ লাগবে না।'

আজ সন্ধ্যের ট্রেনে সমস্ত ইউনিট শিয়ালদা ছাড়ছে। শুধু অরিন্দম যাবে কালকের বাগডোগরা ফ্লাইটে। সংখ্যাটা বাড়তে বাড়তে এখন নেহাত মন্দ হল না। হরিশ মল্লিকের প্রতিশ্রুতিমত টাকাটা শেষ পর্যন্ত এসে পেঁছয়নি। ভদ্রলোকের অবস্থা এখন ছিবড়ে বলে প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও বসন্ত খুব আশা করেছিল রোগ-শয্যায় শুয়ে তিনি যে কথা বলেছেন অরিন্দমের কাছে তা রাখবেন। কিন্তু শিবানী মল্লিক যে কোন ফিল্ম-এর মানুষকেই দরজা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। পঁচিশ লক্ষ টাকা নষ্ট হয়ে যাওয়া শুনতে এক কথা কিন্তু বসন্ত জানে ওই হিসেবটার মধ্যে ছবির শেষ কাজটার খরচও ধরা ছিল। যেগুলো খরচ হয়নি দুর্ঘটনার জন্যে তার টাকাটা তো এখনও রয়ে গেছে।

বসন্তর মুখে সমস্ত ব্যাপার শুনে চলচ্চিত্র সাংবাদিক আর্য গুপ্ত নিজে গিয়েছিলেন আজ নার্সিং হোমে। আর্য হরিশের অনেকদিনের বন্ধু বলেই শিবানী সম্ভবত আপত্তি করেননি। তাছাড়া আজ সকালে দৈনিকের পাতায় এই অভিযানের কথা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছেন আর্য। ফিরে এসে বলেছিলেন, 'খুব ভেঙে পড়েছে হরিশ। বেশির ভাগ সময় আফশোস করেছে। তোমাদের টাকা দিতে পারেনি বলে ও নিজেও কম কষ্ট পায়নি। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলে মনে হল

বিশেষ একটা মতলব ভাঁজছে। কিছুতেই প্রকাশ করল না। অরিন্দম টাকাটা দিচ্ছে জেনে চুপ করে রইল। দ্যাখো, শেষ পর্যন্ত ও কি করে!'

শিয়ালদা থেকে যখন ট্রেন ছাড়ল তখন এ ব্যাপারে সব আশা ছেড়ে দিল বসন্ত। শেষ মুহূর্তে যদি অরিন্দম বাকি টাকাটার ব্যবস্থা না করতেন তাহলে হয়ে যেত। পুরো কামরায় এখন যেন উৎসবের মেজাজ। বসন্ত হাল ছেড়ে দিল। দুশ্চিন্তা করার কোন মানে হয় না। ঈশ্বর যদি সহায় থাকেন তাহলে ক্যানগুলো খুঁজে পাবেই। সেই অবধি প্রত্যেকে খুশিতে থাকুক। নিজের আসনে বসতে গিয়ে সে সহদেব সেনের মুখোমুখি হল। সহদেব তার ফাইল খুলে কোন হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছিলেন। তাকে দেখে বললেন, 'বসন্ত, ইটস টু মাচ। তুমি যে একটা বাজার নিয়ে হিমালয়ে যাবে সেকথা আগে বলনি তো!'

বসন্ত করুণ চোখে তাকাল, 'এড়াতে পারলাম না। সবাই ইন্টারেস্টেড।'

সহদেব হাসল, 'আমি জানতাম পরিচালকদের খুব নির্মম হতে হয়। শুনেছি সত্যজিৎবাবু পথের পাঁচালী ছবি এডিটিং-এর সময় এমন অনেক দৃশ্য নির্মম হাতে বাদ দিয়েছিলেন যা বাদ দিতে পারার জন্যে ক্ষমতার দরকার ছিল। তাই আমরা পথের পাঁচালী পেয়েছি। এদের দেখে মনে হচ্ছে যেন পিকনিকে যাচ্ছে। এ চলবে না।'

চলন্ত ট্রেনে জানলার ধারে বসে বসন্ত অন্ধকারের দিকে তাকাল, 'কি করতে বল।'

'লোক কমাও। যাচ্ছে যাক। বেশির ভাগ মানুষ থাকুক বেস ক্যাম্পে। ওপরে উঠবে দশজনের ইউনিট। আর সেই দশজন বেছে নেব আমি। অবশ্য তুমি যদি আমার সাহায্য চাও। আনাড়িদের দিয়ে যেমন ক্যামেরা চালানো যায় না তেমনি পাহাড়েও ওঠা যায় না। ছেলেখেলা নাকি! জায়গাটা খুব ঝঞ্ঝাটের।' সহদেব উত্তেজিত।

বসন্ত আর ভাবতে পারছিল না। চোখ বন্ধ করতে করতে বলল, 'যা ভাল হয় তাই কর।'

এবং তখনই চলন্ত একটি মূর্তিকে দেখে সে চোখ খুলে ফেলল। প্যাসেজের ভিড় কাটিয়ে শরীরটা মাছের মত ক্ষিপ্রতায় এগিয়ে নিয়ে এসে ওকে দেখে থমকে গেল। চোখের তলা দিয়ে একবার দেখে নিয়ে ঠক্কর একটা ছোট স্যুটকেস ওপরে তুলে দিল। তারপর প্রমাণ সাইজের আর একটাকে সন্তর্পণে বেঞ্চির নিচে রাখতে তৎপর হল। লোকটার কথা মনেই ছিল না বসন্তর। ওর শিরদাঁড়ায় একটা বরফের

কুচি যেন আচমকা আটকে গেল। বসন্ত দেখল যে স্যুটকেসটা বেঞ্চির তলায় ঢুকে যাচ্ছে সেটির কভারটিও নতুন।

বাগডোগরার ফ্লাইট কখনই কি ঠিক সময়ে ছাড়ে না। এমনও হয়েছে দশটায় জানিয়ে দিয়ে আড়াইটের সময় প্লেনে উঠতে হয়েছে। এয়ারপোর্টে এসেই গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল অরিন্দম। পোর্টার মাল নিয়ে যাচ্ছে, সে ব্যস্ত পায়ে হাঁটছে এমন দৃশ্য স্বাভাবিকভাবেই অপেক্ষারত বাঙালী দর্শকের মনে চাঞ্চল্য আনে। কিন্তু আই সি টু টু ওয়ান আজও দেরিতে ছাড়ছে জানার পর মনে হল ট্রেনে চলে গেলেই হত বসন্তদের সঙ্গে।

সোজা ওপরের রেস্টুরেণ্টে চলে এল সে। কালো কফির হুকুম দিয়ে বিরক্ত মুখে চারপাশে তাকাল, কোন পরিচিত মুখ নেই এটাই বাঁচোয়া। আজ সকালে বোম্বে থেকে নীতা টেলিফোনে তাকে অকারণ জ্ঞান দিল খানিক। সেখানেও খবরটা পেঁাচেছে। নীতার মতে এটা আত্মহত্যা করতে যাওয়ার সামিল। অরিন্দম একজন অভিনেতা, অভিযাত্রী নয়। তাছাড়া এই কাজের জন্যে অরিন্দম কি কোন ভাল পারিশ্রমিক পাচ্ছে? ফিল্ম উদ্ধার করলে তার কি কিছু লাভ হবে? দুর্গম পাহাড়ে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তবে তার বাকি জীবনের দায়িত্ব কে নেবে? তাছাড়া এটা ভাবতে পারা যাচ্ছে না যে একজন প্রথম সারির অভিনেতা তার নিজস্ব কাজ ফেলে হুজুগে মাততে ছুটছে। নীতা এও বলেছে যে এখন পর্যন্ত সে জানে না দলে কোন মহিলা আছে কিনা। থাকলেও তার জন্যে এত কষ্ট করা কি উচিত?

কোন কথা না বলে লাইন কেটে দিয়েছিল অরিন্দম। বোম্বের নায়িকা হতে চেয়ে ভ্যাম্প হয়ে থাকা নীতা সামান্য কদিনের পরিচয়ে এত জ্ঞান দেবে ভাবতে পারেনি সে। কিন্তু মুস্কিল হল, এই কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন মুখে বেজে চলেছে। পৃথিবীতে 'করো না' বলতে পারার মানুষের অভাব কোন কালেই হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও গতকাল সে তার সমস্ত কাজ শেষ করে এসেছে। উকিল অবাক হয়েছিল। অরিন্দম হেসে বলেছিল, 'আর কিছু না, আমি খুব টায়ার্ড। কদিন ছুটি চাই। যদি সেই ছুটিটা আচমকা অনেক বড় হয়ে যায় তাই আপনাকে এই ব্যবস্থা করতে বলছি। কোথায় কি সই করতে হবে বলুন।'

উকিল বলেছিল, 'কি যে বলেন, আপনি এখন টপ ফর্মে—।'

হেসে উঠেছিল অরিন্দম, 'সেদিন টিভিতে একটা ছবি দেখছিলাম। উত্তমদা, জহরদা, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ি সান্যাল, ভানুদা কি দারুণ অভিনয় করছিলেন।

হঠাৎ খেয়াল হল ওঁরা কেউ আর নেই। ওঁদের হাসি কান্না রাগ রয়ে গেছে। আর দেখতে পারিনি ছবিটা। ফর্ম টর্ম কিছু নয় মশাই, কলমটা দিন। হ্যাঁ। আমার কিছু হয়েছে খবর পেলেই এটা প্রকাশ করবেন।'

বাড়িটার বিলি ব্যবস্থা করে গেলে ভাল হত। কিন্তু সেটা খুব নাটকীয় হবে। হয়তো কিছুই ঘটবে না। পায়ের একটা আঙুলও মচকাবে না। মাঝখান থেকে এই সব করে বেশ কিছু লোক হাসানো। অন্তত চাকরবাকরগুলো হতভম্ব হয়ে যেত।

আই সি টু টু ওয়ানের জন্যে শেষ পর্যন্ত বোর্ডিং কার্ড দেওয়া শুরু হল। বেয়ারা এর আগে জেনে গিয়েছিল অরিন্দম কোন ফ্লাইট ধরছে। বাঙালী বেয়ারা তাদের প্রিয় চিত্রাভিনেতার জন্যে বাকি কাজগুলো করে দিল খুশি হয়ে। অরিন্দমকে লাইনে দাঁড়াতে হল না। সিকিউরিটির বেড়া পার হবার ডাক আসতে সে উঠে দাঁড়াল। বিলের সঙ্গে একগাদা টাকা প্লেটে রাখল বেয়ারাটার জন্যে। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'কোন ছবির স্যুটিং-এ যাচ্ছেন স্যার ?'

অরিন্দম হেসে বলল, 'বুনো হাঁসের সন্ধানে।'

এখনও তাকে দেখলে ফিসফিস শব্দ হয়, চারপাশের মানুষ কথা বন্ধ রেখে উৎসুক হয়ে তাকায়—এসব মনে বেশ তৃপ্তি আনে। লাইনে দাঁড়াতে হল না। যাত্রী-দের বেশির ভাগই চেকিং করিয়ে ভেতরে চলে গেছেন। সিকিউরিটির কর্মীদের সন্তুষ্ট করে ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতেই ডাক পড়ে গেল প্লেনে ওঠার। এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে মিনিটখানেক হেঁটে যেতে হবে প্লেনটার দরজায় পেঁছাতে। ভিড়টাকে আগে যেতে দেবার জন্যে অলস ভঙ্গিতে অপেক্ষা করছিল অরিন্দম। হঠাৎ কানের কাছে কেউ ফিসফিসিয়ে বলল, 'চলুন।'

চমকে সে তাকাল। হরিশ মল্লিককে চিনতে কষ্ট হচ্ছিল। শরীর বেশ কাহিল। মাথায় একটা টুপি। হাতে একটা বড় ব্যাগ। কিছু বলার আগেই হরিশ বলল, 'পালিয়ে এসেছি। নিজের সম্পত্তি অন্যে খুঁজবে আর আমি মুখ বুজে পড়ে থাকব এমন বান্দা নই। মরতে হলে কাজ করতে করতে মরব। আপনি এই ফ্লাইটে যাচ্ছেন জানতাম। আপনার টাকা এতে আছে।' ব্যাগটা উঁচিয়ে দেখাল হরিশ।

'আমার টাকা ?' ভাল করে কথা বলতে পারছিল না অরিন্দম।

'যেটা বসন্তকে ধার দিয়েছেন। না মশাই ধারবাকি রেখে মরতে পারব না। চলুন, চলুন, শালা যতক্ষণ কলকাতা না ছাড়ছি ততক্ষণ— ।'

ছুটন্ত লোকটাকে এতটুকু অসুস্থ বলে মনে হচ্ছিল না অরিন্দমের।

হরিশ মল্লিক যে সুস্থ নয় তা বাগডোগরা এয়ারপোর্টে নেমেই বুঝতে পারল অরিন্দম। খুব ঘাম হচ্ছিল, নিঃশ্বাস পড়ছিল দ্রুত। এয়ারপোর্ট-রেস্টুরেন্টে বসিয়ে অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার সঙ্গে কোন ওষুধপত্র আছে?'

পকেট থেকে একটা ছোট্ট কৌটো বের করে এট্রুস একটা বড়ি জিভে চালান করে দিয়ে হাত তুলে ব্যস্ত না হতে বলে চোখ বন্ধ করল হরিশ মল্লিক। বোঝাই যাচ্ছে নিজেকে ধাতস্থ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে। অরিন্দম কি করবে বুঝতে পারছিল না। যে সম্পত্তির সন্ধানে সে যাচ্ছে তার আইনসম্মত মালিক এই ভদ্রলোক। কিন্তু এই মুহূর্তে ইনি কাউকে না জানিয়ে নার্সিংহোম থেকে পালিয়ে এসেছেন। সেটা যদি অপরাধ না-ও হয় আইনের চোখে ওর স্ত্রী নিশ্চয়ই দিশেহারা। এবং এখন যদি কিছু একটা হয়ে যায় তো জবাবদিহি তাকেই দিতে হবে। অরিন্দম হরিশকে রেস্টুরেন্টে রেখে এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর বাইরে এসে দাঁড়াল। অনন্ত জিজ্ঞাসা করেছিল শিলিগুড়ি থেকে তার জন্যে গাড়ি পাঠাতে হবে কিনা এয়ারপোর্টে। নিষেধ করেছিল সে। এবার কোন স্যুটিং-এ আসেনি যে সব রকম আরাম আদায় করে নেবে। তার অবশ্য প্রয়োজনও নেই। অরিন্দমকে দেখে বেশ কিছু বাঙালী নেপালী ট্যাক্সি ড্রাইভার ছুটে এল, 'স্যার। আপনার গাড়ি আসেনি। কোই ভাবনা নেহি। আমার গাড়িতে চলুন।' অরিন্দমের ভাল লাগল। এদের অনেকেই তাহলে তাকে চিনতে পেরেছে। উত্তমকুমারের একটা কথা মনে পড়ল, 'কমন পিপল তোমাকে দেখে রিঅ্যাক্ট না করলে বুঝবে তোমার দিন শেষ।' সে মুখগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে যাকে বেছে নিল তার বয়স কম, কিন্তু মিঠুন মিঠুন ভাব আছে। ছেলেটি চলে এল ওর পিছু। হরিশ মল্লিক ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। অরিন্দমকে দেখে হাসল।

'আপনার জন্যে আমি বেশ উদ্বিগ্ন হচ্ছিলাম।'

'আমার জন্যে? কেন?' অরিন্দম লোকটাকে ভাল করে দেখল।

'কি জানি! হঠাৎ যদি আমার উপকার করার ইচ্ছে আপনার প্রবল হয়ে ওঠে!

পুলিশ-টুলিশকে যদি খবর দিয়ে বসেন আমি নার্সিংহোম থেকে পালিয়ে এসেছি।'

অরিন্দম এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর বলল, 'হরিশবাবু, আপনি যদি আমার কথা শোনেন তাহলে বলব আপনার কলকাতায় ফিরে যাওয়াই উচিত। এই শরীর নিয়ে আপনি পাহাড়ে হাঁটার কথা চিন্তাও করবেন না। বরং আপনার কিছু একটা হয়ে গেলে আমাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। কোথাও তো কিছু আটকাচ্ছে না, আর মিনিট পাঁচেক বাদে দমদমে ফিরে যাচ্ছে প্লেনটা। টিকিট পাওয়া যাচ্ছে কিনা চেষ্টা করব ?'

হরিশ উঠে দাঁড়াল, 'আপনি অবশ্য আমার বন্ধু নন কিন্তু শত্রু বলে তো জানতাম না। শিবানীর কাছে ফিরে গেলে আমি মরে যাব। এই কয়েক সপ্তাহ বিছানায় শুয়ে শুয়ে বুঝেছি সবাই আমার এই শরীরটাকেই বাঁচিয়ে রাখতে চায় তাদের প্রয়োজনে। আরে আমার মন যদি না বাঁচল তাহলে শরীর বাঁচবে কি নিয়ে। চলুন।'

অরিন্দম ঠিক করল ওই মুহূর্তে জোরজবরদস্তি করে কোন লাভ হবে না। বরং বসন্তদের ওপর সমস্যাটা ছেড়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। টাকার ব্যাগ হাত-ছাড়া করল না হরিশ। মালপত্র পেছনে তুলে দিলেও ওটাকে কোলের ওপর আঁকড়ে ধরে রইল অরিন্দমের পাশে বসে। আড় চোখে সেটা লক্ষ্য করে অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'নার্সিংহোম থেকে আসছেন, টাকা পেলেন কোত্থেকে।'

'স্যাটিংয়ে যাওয়ার আগে সরিয়ে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম পাহাড় থেকে ফিরে ম্যাড্রাসে যখন ল্যাবের কাজে যেতে হবে তখন তো দরকার হবে। দুনম্বর। বাড়িতে রাখতে পারিনি। অতএব শিবানী জানে না। জানলে দিত না।'

'আপনার স্ত্রীকে আপনি অকারণ ছোট করছেন।'

'মোটেই না। জীবন বড় বিচিত্র সিনেমা মশাই। যতক্ষণ স্বামী সুস্থ ততক্ষণ তিনি কামধেনু। দু'হাতে দুয়ে নেওয়া যায় বলে তার কোন ব্যাপারে নাক না গলিয়েও ভাল থাকে স্ত্রী। কিন্তু যেই স্বামীর শরীর ধাক্কা খেল, যেই নাকে নিরামিষ খাবারের গন্ধ লাগল, ধক্ করে অমনি তাকে কাঁচের বাক্সের মাছ করে দিয়ে চোখে চোখে রাখো। স্বামীর জীবনের জন্যে নয় নিজের জীবনের বাকি দিন-গুলো গুছিয়ে নেবার জন্যে হন্যে হয়ে ওঠে তখন। দোষ দিই না, জীবনের ধর্ম এই মশাই। টাকাটা তাই এমন একজনের কাছে রাখতে হয়েছিল যার কোন লোভ নেই।' খানিকটা উদাস গলায় শেষ কথাগুলো বলল হরিশ মল্লিক।

ট্যাক্সি তখন বাগডোগরা এয়ারপোর্টের বাইরে মিলিটারি কমপ্লেক্স দিয়ে ছুট-

ছিল। ইউনিফর্ম-পরা মানুষেরা দল বেঁধে সাইকেলে যাতায়াত করছেন। সেই সব দেখতে দেখতে অরিন্দম খানিকটা আলস্য নিয়ে হরিশের কথা শুনছিল। শেষটা কানে যাওয়া মাত্র সে ঘুরে তাকাল, 'টাকার লোভ নেই এমন কাউকে আপনি জানেন নাকি?' নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল হরিশ। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'সাধু সন্ন্যাসী?'

'না। বললাম না জীবন বড় বিচিত্র সিনেমা মশাই।'

অরিন্দম আর কথা বাড়াল না। গাড়ি তখন হাইওয়েতে পড়ে ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। ছেলেটা চালাচ্ছে খুব ফূর্তির সঙ্গে। হরিশ পেছনে মাথা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করে রয়েছে। অরিন্দম লোকটাকে ঠিক বুঝতে পারছিল না। তার এই জীবনে এমন একটা মানুষের সন্ধান পেল না যার টাকার লোভ নেই, স্বার্থ ছাড়া যে এক পা এগিয়ে আসে। বোধ হয় সেই দেখতে না পাওয়া থেকে অচেতন মনে যে শূন্যতা জন্মেছিল সেই শূন্যতা তাকে এই অভিযানে অংশ নিতে উদ্যোগী করেছে। অন্তত ফিরে যেতে পারলে বলতে পারবে কোন স্বার্থ-ছাড়াই এত বড় একটা ঝুঁকি নিয়ে দিনগুলো কাটিয়ে এল। অরিন্দমের মনে হল এই বলতে পারার মধ্যে যে আনন্দ সেটাও এক ধরনের স্বার্থবোধের গায়ে হাওয়া দিচ্ছে না তো!

শিলিগুড়িতে ঢোকার মুখে অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা হরিশবাবু, ধরুন খোঁজাখুঁজির পর ফিল্মের ক্যানগুলো পাওয়া গেল এবং অক্ষত অবস্থায়, আপনি কি করবেন?'

রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল হরিশ মল্লিকের মুখে। একটু সময় নিল সে। তারপর বলল, 'আমি মরে যাব মশাই, স্রেফ মরে যাব।'

অরিন্দম হতবাক। লোকটা বলছে কি!

হরিশ আবার বলল, 'বুঝতে পারলেন না? ছবিটা যদি পাওয়া যায় তাহলে মুক্তি পাবেই। পেলে শিবানীর ভবিষ্যতের কোন ভাবনা নেই। আমি জানি সুপারহিট হবেই। আর যদ্দিন বাংলায় ছবি তৈরি হবে, লোকে এ ছবির নাম করতে বাধ্য হবে। বলবে হরিশ মল্লিক একটা ছবি প্রোডিউস করেছিল বটে। আমি বেঁচে থাকব একশ বছর ছবিটার সঙ্গে। তাই এই শরীরটার মরণ হলে ক্ষতি কী? বড় আরামের মরণ হবে মশাই।'

হঠাৎ অরিন্দমের খুব শীত লাগল। এই শিলিগুড়ি শহরেই। অসুস্থ মানুষের কথায় এমন বরফের ছোঁয়া অস্বস্তিকর।

মহানন্দা ব্রিজ থেকে দার্জিলিঙ-এর মোড় পর্যন্ত রাস্তার দুপাশের হোটেল-

গুলোর কয়েকটায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে উঠেছিল বসন্তর ইউনিট। ট্রেন সামান্য লেট ছিল তবু এগারটা নাগাদ হোটেলে পৌঁছেই বেরিয়ে গিয়েছিল সহদেব সেন। সারাটা পথ সে কেবল বলে এসেছে ঝুট-ঝামেলা সরাতে। তার হিসেব মতন দশজনের বেশি এই দলে লোক থাকবে না। কথাটা মেনে নিলেও কিভাবে এতগুলো উৎসাহী মানুষকে—। বসন্তর নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছিল। সিদ্ধান্তটা তার কলকাতাতেই নেওয়া উচিত ছিল। জীবনে কখনই সে সঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি বলেই তো এই হাল।

বসন্তরা উঠেছে দিল্লী হোটেলে। মোটামুটি খারাপ ব্যবস্থা নয়। তার রুমমেট সহদেব। ওপাশের একটা ঘরে কল্পনা একা রয়েছে। আর এ-পাশে ঠিক তার আগের ঘরটায় ঠক্কর। লোকটার নাম যেমন অদ্ভুত, কাজকর্ম তার চেয়ে কম নয়। ট্রেনে এতটা পথ এসেছে মুখে কুলুপ এঁটে। শুধু ওর চোখের মণি ঘুরেছে এবং কান খাড়া থেকেছে। হোটেলে পৌঁছে প্রথম মুখ খুলেছে সিঙ্গল সিটেড রুম চাইবার সময় এবং সোজাসুজি বসন্তকে জানিয়ে দিয়েছে তাকে এইরকম নির্দেশ দিয়েছে তার নিয়োগ-কর্তা। কথা বাড়ায়নি বসন্ত। স্যুটকেস দুটো নিয়ে সেই যে ঘরে ঢুকেছে মনে হয় আর বের হয়নি। কারণ তাহলে ওর হিলের শব্দ কানে আসত। লোকটার জুতোর তলায় নির্ঘাৎ লোহার নাল লাগানো আছে। যখন হেঁটে যায় তখন শব্দটা শরীরে মোটেই স্বস্তি আনে না। ট্রেনে, স্টেশনে এবং আসবার পথে রিক্সায় বসন্ত বারংবার ঠক্করের বয়ে আনা কভার দেওয়া স্যুটকেস দেখেছে। আর দেখা মাত্র তার পেটে চিনচিনে ব্যথা ছড়িয়েছে।

ইউনিটের কেউ জানে না এমন কি অরিন্দমদাকেও জানানো হয়নি কত বড় একটা মিথ্যের বাক্স তাদের সঙ্গে চলেছে'। কেউ টের পাচ্ছে না ওই কভারের আড়ালে যে বস্তুটি রয়েছে তা কতখানি ভেজাল। যারা ঠক্করের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিল তাদের জানিয়েছে যে স্পন্সরার একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ পাঠিয়েছেন যাতে কাজটা ঠিক হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে নিজস্ব রিপোর্ট পেতে পারেন। ইউনিটের লোকজন এই এক রাতেই ওকে আড়ালে টিকটিকি বলে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। বসন্ত ঠিক করল আজ দুপুরে অরিন্দমের সঙ্গে এসব-ব্যাপার খোলাখুলি আলোচনা করে তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে বলবে। সহদেবের সঙ্গে কথা বলে অরিন্দমই দলটার সাইজ ঠিক করুক। পরিচালক হিসেবে সে নতুন কিন্তু এরা অরিন্দমকে অমান্য করতে পারবে না। এই সময় ঘরের দরজায় শব্দ হল।

শুয়েছিল বসন্ত। সোজা হয়ে বসে বলল, 'খোলা রয়েছে দরজা।'

প্রোডাকসন্স ম্যানেজার অনন্ত উঁকি মারল, 'ঘুমাচ্ছেন ?'

'না-না। কি খবর ?'

অনন্তর ভাব-ভঙ্গি সব সময় মাছ খেয়ে আসা বেড়ালের মত। বলল, 'এভরিথিং অলরাইট। আমাকে দেখে তো সবাই ভেবেছিল ফিল্ম ইউনিট নিয়ে শ্যুটিং-এ এসেছি। বোঝাতে জেরবার হতে হয়েছে। যে ক'টা জিপ দরকার বলে দিলেই চলে আসবে। ডিজেল জিপ নেব না। পাহাড়ে উঠতে বড্ড ইঞ্জিন গরম হয়ে যায়। একটু খরচ বেশি পেট্রলে কিন্তু রিস্ক কম। তবে আসা যাওয়ার তেল স্টকে নিয়ে নিতে হবে। প্রব্লেম হল যে অবধি জিপ যাবে সেখানে পোঁছে তো আপনাদের ফেরা পর্যন্ত ওরা দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে পারবে না। একটাকে রেখে বাকিগুলো ছেড়ে দেব। একটু খরচ বেশি পড়বে কিন্তু উপায় নেই। আনাজপাতি, চাল, ডাল, ঠাকুর, চাকর, সব তো এখান থেকেই—।' এক নাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছিল অনন্ত। হাত তুলে তাকে না থামিয়ে পারল না বসন্ত, 'যা ভাল মনে হয় করুন। এত ডিটেলসে আমার সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই। পাহাড়ের ব্যাপারটা সহদেব সেনের সঙ্গে আলোচনা করবেন। আর একটু পরে অরিন্দমদা আসছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর জিনিসপত্র কেনাকাটি করলে হবে। আপনি শুধু দেখুন, যারা এসেছে তারা যেন কোন অসুবিধেয় না প'ড়ে।'

'মাথা খারাপ। জামাই আদরে রয়েছে বাবাজীবনরা। এবার তো কাজও করতে হচ্ছে না। আর হ্যাঁ, তিনজন ভেজিটেরিয়ান রয়েছে। ওই ঠক্কর না কি, সে ব্যাটা তো আবার পেঁয়াজ পর্যন্ত খায় না। আমি যতক্ষণ জীবিত আছি ততক্ষণ ইউনিটের কারো কোন অসুবিধে হবে না।' ফিরে যেতে গিয়েও প্রৌঢ় লোকটি কোমরে হাত রেখে ঘুরে দাঁড়াল, 'আর একটা কথা, জিপ যে অবধি যাবে সেইখানেই আমি থেকে যাব। মানে বরফের ওপর দিয়ে আর হাঁটাহাঁটি—, অসুবিধে হবে ?'

লোকটার মুখ দেখে হাসি পেল বসন্তর, 'কোন অসুবিধে হবে না। যত লোক কমে তত মঙ্গল।'

মুহূর্তেই মুখটার ভাঙচুর হয়ে গেল অনন্তের, 'আমাকে যত লোকের মধ্যে ফেললেন দাদা। সেবার জয়ন্ত চক্রবর্তীর ছবি করতে সুন্দরবনে ছিলাম দেড় মাস। এই আমি কুড়ুল দিয়ে কুমির মেরেছি। টালিগঞ্জের সবাই জানে।'

বসন্ত তাড়িঘাড়ি বলল, 'আরে না না, আমি সেভাবে আপনাকে বলব কেন ? আপনার বয়স হয়েছে বলে ঝুঁকি নিতে বারণ করেছি। আপনার কিছু হলে টালি-গঞ্জের ক্ষতি। তাছাড়া একজন দায়িত্বপূর্ণ মানুষের তো বেসক্যাম্পে থাকা

প্রয়োজন।'

একটু প্রীত করল কথাগুলো অনন্তকে। দরজার কাছে পোঁছে গিয়ে সে হঠাৎ জিভ কাটল, 'ওই যা, একদম ভুলে গিয়েছিলাম। দুটো লোক অনেকক্ষণ থেকে আপনার খোঁজ করছে। কারণটা আমাকে বলতে চাইল না। ফিল্মে নামার পার্টি বলে মনে হল না।'

'কোথায় তারা?' বসন্ত অবাক হল। সে তো কাউকে জানিয়ে এখানে আসেনি।

'পাঠিয়ে দিচ্ছি।' অনন্ত বেরিয়ে গেল। এবং তার এক মিনিটের মধ্যেই দরজায় শব্দ হল। গম্ভীর গলায় বসন্ত বলল, 'ভেতরে আসুন।'

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ফেরা' নাটকে প্রায় এক চেহারার এক পোশাক পরা দুটো খোজাকে দেখেছিল বসন্ত। এদের দেখে তাদের কথা মনে পড়ল। দু'জনের চোখেই কালো চশমা, দু'জনের পরনেই নীল সাফারি স্যুট। প্রায় একই সঙ্গে দু' জনে নমস্কার করল।

ঘরের এক কোণে চারটে চেয়ার এবং ছোট টেবিল ছিল। হাত বাড়িয়ে সেগুলো দেখিয়ে বসন্ত বলল, 'বসুন। বলুন কি করতে পারি?'

লোক দুটো বসল। তারপর একজন যার জুলপি পাকা বলল, 'করতে তো অনেক কিছু পারেন। করতে চাওয়ার ইচ্ছে কতটা আছে সেইটে আগে বলুন!'

দ্বিতীয় লোকটি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, ওটাই আসল কথা।'

বসন্ত বলল, 'আমি আপনাদের কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। কি চাই সেটা খোলসা করে বলুন। আপনারা কি সত্যি আমার কাছে এসেছেন?'

লোক দুটো নিজেদের মধ্যে এমনভাবে হেসে দৃষ্টি বিনিময় করল যেন এমন মজার কথা ওরা জীবনে শোনেনি। পাকা জুলপি বলল, 'এটুকু ভুল করলে আর আমাদের বেঁচে থাকতে হত না।' দ্বিতীয় জন বলল, 'অনেক আগেই ফৌত হয়ে যেতাম।'

বসন্ত জবাব দিল না। এই বিচিত্র মানুষ দুটো তার সঙ্গে কথার খেলা করছে। সে চুপ করে রইল ওদের উত্তরের জন্যে। পাকা জুলপি বলল, 'বাংলা ছবির যা হাল তাতে মনে হত না যে এর পরিচালকদের ঘটে এক ফোঁটা বুদ্ধি আছে। বুদ্ধি থাকলে কেউ অত খারাপ ছবি তৈরি করতে পারে! কিন্তু আপনি চুপ করে আছেন। দেখে—।' লোকটি হাসতেই দ্বিতীয় জন যেন শূন্যস্থান পূর্ণ করার ভঙ্গিতে বলল, 'এটাই প্রথম ফিচার ছবি তো তাই এখনও আলাদা সাঁতরাচ্ছেন।'

এইবার জবলুনি ধরল বসন্তর। কিন্তু কথা বললেই তো এরা তাকে মূর্খ ভেবে বসবে। পাকা জুলপি বলল, 'সময়ের মূল্য অনেক। আমরা বলি কি, আপনি দলবল নিয়ে কলকাতায় ফিরে যান।'

এবার সোজা হয়ে বসল বসন্ত। বলে কি এরা? দ্বিতীয় জন বলল, 'ট্রেনে টিকিট না পেলে কোন চিন্তা নেই, বাস ছাড়ে। একদম ধর্মতলা।'

বসন্ত বলল, 'আপনাদের কথায় আমরা ফিরে যাব কেন?'

'ফিরে গেলে নিজেদের মঙ্গল হবে, আমাদের হবে। না হলে ভেবে দেখুন, প্লেনটা যেখানে ভেঙে পড়েছে সেখানে কোন সরকারী টিম হেঁটে যায়নি। আর মাস দুয়েক গেলে বরফে অ্যাইসা ঢাকা পড়বে সব যে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে যাবে। এই পাহাড় ডিঙিয়ে সেই পাহাড় পেরিয়ে বরফের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়া এই বয়সে পোষায়? শুধু আপনার এই জেদের জন্যে আমাদের এই হয়রানি।' পাকা জুলপি যেন রেগে গেল।

'হয়রানি বললে কম বলা হয়। প্রাণহানি হওয়া বিচিত্র নয়।' দ্বিতীয়জন বলল।

'আমার যাওয়ার সঙ্গে আপনাদের কি সম্পর্ক?'

'আপনারা যাচ্ছেন বলেই তো আমাদের যেতে হচ্ছে।' পাকা জুলপি বলল।

'যেতে ইচ্ছে না থাকলেও হচ্ছে।' দ্বিতীয় জন চটপট জানাল।

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। পরিষ্কার করে বলুন তো!'

'শুনুন। আমরা অনেক খোঁজ নিয়েছি। কিস্যু পাবেন না ওখানে। কিন্তু আমাদের মক্কেল জিদ ধরেছেন ওখানে যেতেই হবে। আমাদের এজেন্সি কেসটা নিয়ে ফেলেছে। লোকটার একটা ব্রিফকেস ছিল প্লেনে। সেইটে খুঁজে আনতে হবে। চালাকি! কর্তা না বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু লোকটা যেই জানতে পারল আপনারা যাচ্ছেন তখন টোপ গিলে নিল কর্তা। এখন মরতে মর সানাইওয়ালা। সানাইওয়ালার গল্পটা জানেন?' পাকা জুলপি জিজ্ঞাসা করতেই দ্বিতীয় জন বলল, 'ঢাকি ঢুলি বেঁচে গেল সানাইওয়ালার কাল হল।'

'কোন ভদ্রলোকের স্যুটকেস, মানে ব্রিফকেস হারিয়েছে?'

'নাম বলা নিষেধ। তিনি জানতে পেরেছেন তাঁর স্ত্রী নাকি সেই ব্রিফকেসের সন্ধানে যাচ্ছেন। কোন চান্স নেই খুঁজে পাওয়ার, কিন্তু যদি পেয়ে যায় তো মক্কেলের একটা বেজে যাবে চিরদিনের জন্যে। আমরা কাটাতে পারতাম কিন্তু যেহেতু আপনি যাচ্ছেন তাই আমাদের না গিয়ে কোন উপায় নেই। আপনি

কলকাতায় ফিরে গেলে আমরাও বেঁচে যাই।'

ব্যাপারটা একটু বোধগম্য হল বসন্তর। সে হেসে বলল, 'আপনার মক্কেলের ব্রিফকেস প্লেনে উঠল আর তিনি উঠলেন না, ব্যাপারটা কিরকম!'

'সোজা ব্যাপার। চেক ইন করে মক্কেলের তলপেটে ব্যথা শুরু হয়। এক পরিচিত ভদ্রলোকের হাতে ব্রিফকেস দিয়ে তিনি টয়লেটে ঢুকেছিলেন। আমাশায় রুগীদের ওসব ব্যাপার একটু দেরিতে হয়। সেই দেরি যখন মিটল তখন প্লেন উঠে গেছে আকাশে।'

'হ'তে পারে নাকি কখনও ?'

'কেন হবে না। বোর্ডিং কার্ডের ওপর ছাপ মারা হয়ে গেছে। অতটা লক্ষ্য করেনি এয়ার ক্র্যাফটের লোকজন। প্লেন উড়ে গেছে দেখে কাউকে না জানিয়ে ভদ্র-লোক ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে এলেন গৌহাটি। আর সেখানে পেঁছে শুনলেন দুর্ঘটনার কথাটা। অ্যামিবাইসিস কখনও কখনও লাইফ সেভিং-এর কাজ করে মশাই।'

গল্পটা বিশ্বাস করল না বসন্ত। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কি ? গোয়েন্দা ?'

'ঘুরিয়ে বললে তাই দাঁড়ায়। সোজাসুজি হল সত্যান্বেষী।'

বসন্ত উঠে দাঁড়াল, 'যাই হোন তাতে আমাদের কিছু করার নেই। আমাদের যাত্রা বন্ধ করার কোন কারণ নেই। আর আমাদের সঙ্গে আপনারা জড়াবেন না।'

পাকা জুলপি বলল, 'একদম গোড়ায় বলেছিলাম সাহায্য করতে চাওয়ার ইচ্ছে আপনার কতটুকু আছে সেইটে বলুন। আপনি আমাদের বাঁচাতে চান না ?'

'আমি বাঁচাবার কে ?'

'আপনি সব। আপনি যাচ্ছেন না আমরাও না। আপনি যাচ্ছেন আমরাও যাচ্ছি।'

এই সময় সহদেব সেন ঘরে ঢুকল। তাকে দেখা মাত্র লোক দুটো উঠে দাঁড়াল। বসন্ত বলল, 'এবার আসুন আপনারা। আমার কিছু করার নেই।'

লোক দুটো নিজেদের মধ্যে একটা করুণ চাহনি বিনিময় করল। তারপর পাকা জুলপি বলল, 'বেশ। কি আর করা যাবে। তাহলে আমাদের আপনার দলে নিয়ে নিন। না না কোন প্রব্লেম ক্রিয়েট করব না। যা খরচ লাগে দিয়ে দেব।'

সহদেব সেন জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বসন্ত ?'

বসন্ত বলল, 'এঁরা নিজেদের কাজে আমাদের সংগে যেতে চাইছেন। আগে দেখিনি।

সহদেব বলল, 'অসম্ভব। আমি এই মাত্র ক্যাপ্টেন মোক্তানের সঙ্গে কথা বলে এলাম। যে কোন অবস্থায় দলের সদস্যের সংখ্যা দশজনের বেশি করা চলবে না। তাছাড়া, ওই শরীর, অত মোটাসোটা শরীর নিয়ে এঁরা পাহাড়ে উঠবেন কি!'

সঙ্গে সঙ্গে প্রথম জন সোজা হয়ে দাঁড়াল। তাকে দেখাদেখি দ্বিতীয়জনও। প্রথমজন বলল, 'বেশ চ্যালেঞ্জটা আমরা গ্রহণ করলাম।'

পাশাপাশি দু'জন এমনভাবে বেরিয়ে গেল যে পর্দাটা অনেকক্ষণ ধরে নড়তে লাগল।

হরিশ মল্লিককে দেখে হতভম্ব বসন্ত। সিনক্লেয়ার হোটেলের লাউঞ্জে সে অপেক্ষা করছিল অরিন্দমের জন্যে। প্লেন লেট করছে এ খবর পেয়েছিল কাউন্টার থেকেই। ট্যাক্সিটা যখন থামল সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

তাকে দেখে হরিশ গাড়ি থেকে নেমে শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'সব ঠিক-ঠাক চলছে?'

বসন্ত কোনমতে বলতে পারল, 'আপনি!'

সে কথার জবাব না দিয়ে হরিশ বলল, 'আমার রুমটা একতলায় হলে ভাল হয়। খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কোন ঝামেলা নেই। আর আমি যে এসেছি তা তোমার দলের লোকদের আজই জানানোর দরকার নেই। টাকার জন্যে ভেব না বসন্ত। ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্যাট স্যুটকেস।'

এরও প্রায় একঘণ্টা পরে বসন্ত অরিন্দমের ঘরে চুপচাপ বসেছিল। সে হরিশকে একটি আরামদায়ক ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। নিজেকে বেশ সামলে নিয়েছে লোকটা। অতটা অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে না আর, কিন্তু পাহাড়ে যাওয়ার সাধ আছে নাকি সে প্রশ্ন করা হয়নি। স্নান করে অরিন্দম বেরিয়ে এলে সে সমস্ত ঘটনা জানিয়েছে। এমন কি আজ এক জোড়া গোয়েন্দা যে এসেছিল তাও। শেষ কথাটার পর অরিন্দম চমকে উঠেছিল, 'কি বলছ? ভদ্রলোক মারা যাননি?'

বসন্ত অবাক হয়েছিল, 'কোন ভদ্রলোক আপনি জানেন দাদা?'

অরিন্দম মাথা নেড়েছিল, 'না। তবে তাঁর স্ত্রীকে দেখেছি। রহস্যটা খুব পাকিয়ে উঠেছে। ঠিক আছে, তুমি সহদেববাবুকে নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় এসো। হরিশ মল্লিকের কথা আপাতত কাউকে জানানোর দরকার নেই। সহদেববাবুর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করা যাবে কি করা উচিত।'

বসন্ত বেরিয়ে যাওয়ার পরে অরিন্দমের খেয়াল হল এর আগে এই হোটেল

থেকে সূর্যাস্তের সময় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছে সে। পাজামা-পাঞ্জাবির ওপর একটা চাদর জড়িয়ে সে বারান্দায় আসতেই নিচের লাউঞ্জে একটা গাড়ি দেখতে পেল। গাড়িতে যে মহিলা উঠছেন তাঁকে দ্রুত রেলিং-এর দিকে সরে এসেও ভাল করে মুখ দেখতে পেল না অরিন্দম। কিন্তু কোমর পিঠ এবং বসার ভঙ্গি বড্ড চেনা। গাড়িটা যখন গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন নাম্বার প্লেটটা চোখে পড়ল। আরে, এটা তো সেই ট্যাক্সির নাম্বার যেটায় তারা এসেছে। যে ড্রাইভার ছোকরাকে দেখতে অনেকটা মিঠুনের মত।

চিন্তিত মুখে ডানদিকে মুখ ফেরাতেই সব চিন্তা উধাও। কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় শেষ রোদ তিরতিরিয়ে কাঁপছে।

সন্ধ্যের পর বসন্ত এলে অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'লেটেস্ট খবর কি?'

বসন্ত কিছুটা উত্তেজিত, বলল, 'ভীষণ চাপ পড়ছে দাদা, এত সামলে নেওয়া—।'

'হলটা কি?'

'এই ঠক্কর লোকটার ওপর ইউনিটের প্রত্যেকেই নজর রেখেছিল। লোকটা কারও সঙ্গে কথা বলে না। যেভাবে তাকায় তাতে সাপের কথাই মনে হয়। কারও ভাল লাগার কথাও নয়। ও আমার হোটেলে একটা ঘর নিয়ে রয়েছে। এরকম লোক কেন সঙ্গে যাচ্ছে তা জানার জন্যে কৌতূহল প্রত্যেকের। বিকেলে ঠক্কর একবার ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়েছিল। ইউনিটের কেউ তখন সেই তালা খুলে ওর ঘরে ঢোকে। সন্দেহজনক কিছু পায়নি কিন্তু সেই স্যুটকেসটি, বুঝতেই পারছেন, সন্দেহজনক মনে করেছে। যদিও তার তালা খুলতে পারেনি।'

'লোকটা ফিরে এসে টের পেয়েছে তার ঘরে লোক ঢুকেছিল?'

'এখন অবধি জানি না। অন্তত আমাকে কিছু বলেনি।'

'তোমাকে ঘটনাটা কে বলল?'

'অনন্ত। শোনার পরই আমি যে লোকটি ঢুকেছিল তাকে দার্জিলিং মেলে কলকাতায় চলে যেতে বলেছি। এ ধরনের কৌতূহল অপরাধেরই নামান্তর।'

অরিন্দম সহদেবের দিকে তাকাল, 'বসন্ত আপনার ওপর ভরসা করছে। আপনি ঠিক কি প্ল্যান করেছেন আমি জানি না—কিন্তু যেহেতু পাহাড়ে হাঁটার অভিজ্ঞতা আমার নেই তাই আপনার ওপর নির্ভর করছি।'

সহদেব চুপচাপ শুনছিল। বিখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতার সামনে বসার প্রতিক্রিয়াও নিশ্চয়ই হচ্ছিল। সে নড়েচড়ে বসল, 'আমি বলেছিলাম দশজনের দল পাহাড়ে উঠবে। কিন্তু বসন্ত এতলোক এনেছে যেন পিকনিক করতে যাওয়া হচ্ছে। আমি একটা লিস্ট করেছি।' পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে সে অরিন্দমকে দিল, 'পাহাড় কোন বেহিসাবী কৌতূহল বরদাস্ত করে না। তাছাড়া যে জায়গাটার কথা বলা হয়েছে সেখানে ট্রেইন্ড অভিযাত্রীদের যেতেও রীতিমত কষ্ট করতে হয়। যারা যাবেন তাদের যেকোন পরিস্থিতির জন্যে তৈরি থাকতে হবে। পাহাড়ের নিয়ম আর সমতলের নিয়মের মধ্যে ফারাক প্রচুর। সেখানে আপনি অসুস্থ বা আহত হলে খুব অল্প সাহায্য পাবেন সহযাত্রীদের কাছ থেকে কারণ আপনার জন্যে অভিযান বন্ধ হতে পারে না। এই মানসিকতা এঁদের আছে কিনা তা বসন্ত বলতে পারবে।'

অরিন্দম লিস্টটা দেখল। তারপর হেসে বলল, 'যাক, আমাকে বাদ দেননি দেখে খুশি হয়েছি। কিন্তু সহদেববাবু, আমাদের একটা সমস্যার সমাধান করতে হবে। ছবির প্রোডিউসার হরিশ মল্লিকের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?'

'না। আমি ফিল্ম লাইনের লোকজনকে খুব বেশি চিনি না।'

'না চেনাই ভাল। হরিশবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন অ্যাকসিডেণ্টের খবরটা শোনার পর। এখনও পুরোপুরি সুস্থ নন। কিন্তু তিনি জেদ ধরেছেন সঙ্গে যাবেন। আপনি যদি ওঁর সঙ্গে কথা বলে বোঝাতে পারেন তাহলে খুব ভাল হয়।'

সহদেবকে একটু অস্বস্তিতে পড়তে দেখা গেল। তারপর বলল, 'আমার কথা উনি শুনবেন?'

অরিন্দম মাথা নাড়ল, 'যেহেতু আমি আপনার ওপর নির্ভর করছি তাই শুনতে পারেন।'

সহদেবকে কোনমতে রাজি করিয়ে বসন্তর সঙ্গে পাঠিয়ে দিল অরিন্দম। বলে দিল বসন্ত যেন আলাপ করিয়ে দিয়েই ফিরে আসে। বিকেলে পেঁছাবার পর হরিশ মল্লিক আর ঘর ছেড়ে বের হননি। অরিন্দমের খুব তেষ্টা পাচ্ছিল। এক-কালে সে নিয়মিত মদ খেত। তিন চার থেকে সেটা দশ পেগে উঠেছিল। স্বপন সেনগুপ্তকে নিয়ে ঘটনাটা ঘটার পর আচমকা কমিয়ে দিয়েছিল সে। স্বপন ফিল্মে এসেছিল তার কিছুটা আগে। বেশ নাম করেছিল। তিনটে ছবির নায়ক হয়েছিল।

যার দ্বটোকে স্বচ্ছন্দে হিট বলা যায়। নিয়মিত মদ্যপান করত স্বপন। তখন অরিন্দমের সঙ্গে ভাল আলাপ ছিল না। তারপরই স্বপন ফিল্ম থেকে ছিটকে যায়। তারপর যখন ফিরে এল তখন তার শরীর নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ছোটখাটো ভূমিকা জুটলেই বর্তে যেত। এইরকম সময়ে একদিন স্বপন এল তার বাড়িতে। সময়টা ছিল সন্ধ্যে। লোকটার সম্পর্কে কৌতূহল থাকায় নানান গল্পে রাত বাড়তে লাগল। ওরা মদ খাচ্ছিল। স্বপন আদৌ দুঃখী নয় বলে জানাল। সে থাকে হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীটে। ওর নেশা হয়ে যাচ্ছিল। এবং একসময়ে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়ে পড়ে গেল মেঝের ওপরে। টেবিলে আর একজন বন্ধু ছিল। আউট হয়ে গিয়েছে অনুমান করে অরিন্দম স্বপনকে ধরাধরি করে গাড়িতে তুলেছিল। ওরা ভেবেছিল স্বপনকে হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীটের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়াটা তাদের কর্তব্য। পেটে মদ থাকায় পরোপকার করার মনটা সক্রিয় হয়েছিল। হরিশ চ্যাটার্জীতে যখন পৌঁছেছিল তখন মধ্যরাত। এবং তখনই খেয়াল হয়েছিল স্বপনের বাড়ির নম্বর তাদের জানা নেই। ওর যা অবস্থা তাতে কথা বলার কোন সম্ভাবনা নেই। শেষ পর্যন্ত বন্ধুর পরামর্শে একটা বন্ধ হতে যাওয়া পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে অরিন্দম জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা ভাই, স্বপন সেনগুপ্তের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন ?'

লোকটা মাথা নেড়ে বলেছিল, 'নম্বরটা বলুন।'

'নম্বর জানলে কি এই শরীর বয়ে বেড়াই !'

লোকটা এগিয়ে এসে শায়িত স্বপনকে দেখে চিৎকার করে উঠেছিল, 'আরে ব্বাস, লাস নাকি ? লাস নামাতে এসেছেন ?'

সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে হৈ চৈ পড়ে গেল। বস্তির জনতা ছুটে আসতে লাগল রহস্যের গন্ধ পেয়ে। সম্বিত ফিরে পেয়ে অরিন্দম দ্রুত গাড়িটা সরাল। ও কেন ভয় পেয়েছিল তা আজও বোধগম্য হয়নি। স্বপন তো আউট হয়েছিল, লোকগুলো নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে পারত। তাহলে সে পালালো কেন ? আর তারপরই মনে হল, সে যে ফিল্মে অভিনয় করে তা এরা বুঝতেই পারল না, উল্টে লাস ভেবে উত্তেজিত হল ? সেই রাত্রে তামাম হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীটের কোথায় স্বপনের বাসস্থান বুঝতে না পেরে ওরা ময়দানে এসে থেমেছিল। মদ্যপায়ী মানুষের কোন ঠিকানা থাকে না এইরকম বোধ ওদের ধাক্কা দিচ্ছিল বারংবার। স্বপন সেনগুপ্তের এখন কোন আইডেণ্টিফিকেশন নেই। একটি লাস এবং স্বপনের মধ্যে পার্থক্য সেই মুহূর্তে ছিল না। শেষপর্যন্ত বন্ধুর পরামর্শে নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছিল

অরিন্দম স্বপনকে। মজার ব্যাপার সকালে উঠে সে শুনেছিল, স্বপন চলে গিয়েছে। এবং সেই শেষ। এরপরে কয়েকদিন এসেছিল স্বপন, অরিন্দম দেখা করেনি। কিন্তু তার মদ খাওয়া কমে গিয়েছিল। তিন থেকে চার পেগে যদি মেজাজ হয়, শরীরটায় ঘুম জমতে শুরু করে তাহলে বাড়তি গলায় ঢেলে নিজের আইডেণ্টিফিকেশন হারিয়ে কি সাম্রাজ্য পাওয়া যাবে। স্বপনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তার সেই পান-ওয়ালার কথাটা মনে পড়েছিল। জীবিত স্বপনকে যে লাস ভেবেছিল।

বিদেশী ব্রাণ্ডি গ্লাসে ঢেলে চুমুক দিতেই বসন্ত ফিরে এল। সে আড়চোখে অরিন্দমকে দেখল, মুখে কিছু বলল না। বসন্ত মদ খায় না। অরিন্দম হাসল, 'হরিশ মল্লিক কি বলছেন?'

বসন্ত জবাব দিল, 'শুয়েছিলেন। সহদেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম।'

অরিন্দম বলল, 'শোন, তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে, তাই তোমার বন্ধুকে ওঘরে পাঠালাম। এর মধ্যে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে তা আমি ভাল করে ভেবে দেখেছি। প্রথমত, শুনেছিলাম ফিল্মগুলো গেছে একটা স্টিলের ট্রাঙ্কে। পরে জানলাম স্টিলের বাক্সে ক্যানগুলো পুরে সবশুদ্ধ স্যুটকেসে ঢোকানো হয়েছে। তাই যদি হয় তাহলে একটা চান্স থাকলেও থাকতে পারে।'

বসন্ত বলল, 'দ্বিতীয়টাই সত্যি। আমি ভাল করে খোঁজ নিয়েছি।'

অরিন্দম বলল, 'দ্বিতীয়ত, তোমার মনে আছে কিনা জানি না সে রাত্রে যখন আমরা এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম তখন একটা গাড়ি আমাদের ওভারটেক করেছিল। সেই গাড়ি চালিয়েছিলেন একজন মহিলা যাঁর নাম মিসেস সেন। তিনি তাঁর বন্ধুকে নিয়ে এয়ারপোর্টে ছুটে এসেছিলেন কারণ মিস্টার সেন তখন ওই ফ্লাইটে ছিলেন। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল স্বামীর চেয়ে স্বামীর ব্রিফকেসের ওপর। তিনি তাঁর বন্ধুকে যে হুমকি দিয়েছিলেন তাতে মনে হয় ব্রিফকেস না পেলে তাঁর সম্পর্কে বন্ধুটির ভবিষ্যত শেষ। এই মহিলা আমাদের সঙ্গে একই ফ্লাইটে কলকাতায় গিয়েছিলেন। এবং আমাকে টেলিফোন করে হুমকি দেবার পেছনে এঁর অস্তিত্ব আছে। আর আজ বিকেলে এই হোটেল ছেড়ে তিনি চলে গেছেন। গতকাল তিনি এখানে উঠে-ছিলেন। যেখানে স্যুটকেস পাওয়াই অলীক ব্যাপার, যেখানে ব্রিফকেস খোঁজার চেষ্টা আমার কাছে গোলমেলে। মনে হচ্ছে অন্য ব্যাপার আছে এর মধ্যে।

তৃতীয়ত, তোমার স্পনসর ঠক্কর নামক লোকটিকে কেন আমাদের ওপরে চাপিয়ে দিয়েছে তার কারণ তুমি আমাকে বলেছ। কিন্তু এটা একটা জালিয়াতি। যদি সত্যি স্যুটকেস খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে ঠক্করকে জালিয়াতি করতে আমি দেব না।

মনে হয় লোকটা ট্রেইন্ড। সঙ্গে অস্ত্র আছে। কিন্তু এখনই কিছু বলা বোকামি হবে। লেট হিম গো উইদ আস। তবে আমার ডিসিসন তোমায় জানিয়ে দিলাম। অ্যান্ড নাউ আজকের ঘটনাটা দ্যাখো। যে দুটো এজেন্সির লোক এসে তোমায় গল্প শুনিয়েছে আমি তার এক বিন্দু বিশ্বাস করি না। মিসেস সেনের স্বামী যদি বেঁচে থাকেন, এবং আছেন বলেই আমার মনে হয়, তিনি এমন এজেন্সিকে কাজটা দেবেন কেন যারা কমিকাল আচরণ করবে? ওদের পুরো স্টেটমেণ্টটাই মিথ্যে। মিস্টার সেন যদি বোর্ডিং কার্ড নিয়ে সিকিউরিটির বেড়া ডিঙিয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে না নিয়ে প্লেন ছাড়তে পারে না। পৃথিবীর কোন এয়ারলাইন্স বোর্ডিং কার্ড হোল্ডারকে ফেলে রেখে যাওয়ার ঝুঁকি নেবে না। তার সঙ্গে খোঁজ খবর নেওয়া হবে। ওই সময়টায় টয়লেটে মিস্টার সেন বসে রইলেন আর প্লেন উড়ে গেল এমন গাঁজাখুরি গল্প লোকদুটো শোনালো কি করে! তাছাড়া মিস্টার সেন যদি তাঁর পরিচিতের হাতে ব্রিফকেস দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি প্লেনে উঠে চুপ করে বসে থাকবেন? ব্রিফকেস যাচ্ছে আর তার মালিক এল না দেখে কাউকে জানাবেন না? ওই প্লেনে মিস্টার সেন যাওয়ার জন্যে আদৌ বোর্ডিং কার্ড নেননি। এবং এইটেই সত্যি। সিটি অফিসে টিকিট বুক করে এয়ারপোর্টে এসেছিলেন তিনি। নিশ্চয়ই কোথাও একটা গোলমাল পাকিয়ে রেখেছেন ভদ্রলোক যার জন্যে সবাই ভেবে নিয়েছে তিনি ওই প্লেনে ছিলেন।'

বসন্ত চুপচাপ শুনছিল। তার মনে হচ্ছিল অরিন্দম ভাল গোয়েন্দা হতে পারত। কারণ এতক্ষণ তারও মনে হচ্ছে এই কথাগুলোর পেছনে যুক্তি রয়েছে। এমনও হতে পারে মিস্টার সেনের টিকিট নিয়ে অন্য কেউ ট্রাভেল করেছে। তাহলে তো ওই প্লেনে সেই ব্রিফকেসটির থাকার কথা নয়। আবার তাই যদি হয় তাহলে মিস্টার সেন কেন ওই ব্রিফকেসের সন্ধানে এজেন্সির শরণাপন্ন হবেন?

বসন্ত নির্লিপ্ত হবার চেষ্টা করল, 'কিন্তু দাদা, এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কি দরকার আমাদের? ঠক্করের ব্যাপারে আপনি যা বলেছেন তাতে আমার মত রয়েছে। ওই ব্যাপারটা আমি কিছুতেই মানতে পারছিলাম না। কিন্তু টাকাটা—।'

'আপাতত তো টাকার সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। তোমার প্রোডিউসার টাকা নিয়ে এসেছেন। দ্যাখো স্পনসরের হাত থেকে মুক্ত হতে পার কিনা।'

'না, আর তা সম্ভব নয়। হরিশদা যে টাকা এনেছেন তাতে কুলোবে না।' বসন্তর কথা শেষ হতেই সহদেব ফিরে এল। এসে বলল, 'ভদ্রলোক ভারী অদ্ভুত মানুষ। এঁকে নিয়ে সমস্যা হবে। তবু আমার মনে হয় জিপেবল রোড পর্যন্ত

উনি সঙ্গে চলুন। মানসিক শক্তি বেশির ভাগ সময় মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।'

বসন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি একথা ওঁকে বলেছ ?'

'হ্যাঁ। কোনমতেই উনি আমাদের সঙ্গে হাঁটতে পারবেন না। মনে হয় বুঝতে পারলেন।'

সহদেব হাসল, 'এভাবে কোন অভিযান কখনও কেউ অর্গানাইজ করেছে বলে শুনিনি।'

ওরা কথাটাকে চুপচাপ মেনে নিল। মাঝে মাঝে সহদেবের কথাবার্তা শুনে মনে হয়, সে বাইরের লোক, বাধ্য হয়ে এসেছে। কিন্তু এসব কথা গায়ে মাখাটা আপাতত বোকামি।

অরিন্দম বলল, 'আমরা তো গ্যাংটককে বেস ক্যাম্প করছি কিন্তু জিপ তো তার পরেও অনেকটা যাবে। আমার তো মনে হয় গ্যাংটককেই ওঁর থেকে যাওয়া উচিত।'

আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পর ওরা মোটামুটি ম্যাপ দেখে যাত্রাপথ স্থির করে নিল। সরকারী বিবৃতি অনুযায়ী প্লেনটি ভেঙে পড়েছে চুংথাঙ বলে একটা জায়গার কাছে। গ্যাংটক থেকে চুংথাঙের আকাশপথের দূরত্ব সাতষট্টি কিলোমিটার। হাঁটাপথে সেটা বাড়বে। পথে টুমলঙ্ নামের জায়গাটা অনেক সাহায্যে আসবে। আবহাওয়া ঠিক থাকলে টুমলঙ্ পর্যন্ত জিপ যাবে।

বসন্তরা চলে যাওয়ার পর অরিন্দম দ্বিতীয় গ্লাস শেষ করল। শিলিগুড়িতে এখন রাত বেশি নয়। কয়েক বছর আগেও এই শহরে সন্ধের পর কেউ রাস্তায় বের হত না। অরিন্দমের ইচ্ছে করছিল একটা রিক্সা নিয়ে রাত্রের শহরটায় ঘুরে বেড়াতে। পাজামা পাঞ্জাবি পরেই সে বাইরে বের হল। করিডোরে কেউ নেই। মিটমিটিয়ে আলো জ্বলছে। হরিশ মল্লিকের ঘরের সামনে এসে সে দরজায় নক্ করল। দ্বিতীয়বারে হরিশ সাড়া দিল। দরজা খুলতেই তাকে দেখে হরিশ যেন অপ্রস্তুত হল। তার মুখ রীতিমত লাল। অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার শরীর কি খারাপ লাগছে ?'

'খারাপ ? না-না। আমি তো ভালই আছি।' হরিশ দরজাটা যতটা সম্ভব আড়াল করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও অরিন্দম মদের গ্লাস দেখতে পেল। সে কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। তার নিজের পেটেও এখন ব্রান্ডি আছে। এই মুহূর্তে কোন উপদেশ দেওয়াটা তার সাজে না। কিন্তু হরিশ তো স্রেফ আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। সে বলল, 'আমি একটু বের হচ্ছি। আমার মনে হয় এখন আপনার ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়া উচিত। ফিল্মের ক্যানগুলো উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আপনার শরীর-

টাকে সুস্থ রাখা উচিত।'

হঠাৎ হরিশ মল্লিক অরিন্দমের হাত জড়িয়ে ধরল, 'অরিন্দমবাবু, আপনি সত্যি করে বলুন তো আমার ক্যান খুঁজে পাব?'

'সেই উদ্দেশ্যেই তো যাচ্ছি। হতাশ হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আশা থাকে, তাই না?'

অরিন্দম আর দাঁড়াল না। তার খুব খারাপ লাগছিল। অবশ্য এরকম অবস্থায় কোন মানুষের যদি মাথা খারাপ হয়ে যায় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকত না। কিন্তু হতাশা থেকে যদি কেউ আত্মহননের পথ বেছে নেয় তাহলে খারাপ লাগবেই। হরিশ মল্লিকের হার্টের এই অবস্থায় মদ খাওয়া উচিত হচ্ছে না, এটা ওকে কে বোঝাবে।

অরিন্দম কাউন্টারে দাঁড়াল। রিসেপশনিস্ট ছেলেটি টেলিফোনে কথা বলছিল। তাকে দেখে তড়িঘড়ি কথা শেষ করে হাসিমুখে এগিয়ে এল, 'নমস্কার স্যার।'

'আমার সঙ্গে যে ভদ্রলোক এসেছেন তাঁকে আর মদ দেবেন না।'

'আচ্ছা স্যার। দুজন গেস্ট আসার পর উনি ড্রিঙ্কস্ চেয়ে পাঠিয়েছিলেন।'

'গেস্ট?' অবাক হল অরিন্দম। হরিশ মল্লিকের ঘরে কোন অতিথিরা এলেন? একমাত্র সহদেব সেন ছাড়া আর কেউ তো বিকেলের পর দেখা করতে যায়নি। সে রিসেপশনিস্ট ছেলেটিকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করার পর বাইরে লনে এসে দাঁড়াল। ঠান্ডা বাতাস বইছে। আকাশ এখন পরিষ্কার। শিলিগুড়ির প্রান্তে এই হোটেলের লনে এখন চেপে বসেছে নির্জনতা। অরিন্দম ভাবছিল হরিশ মল্লিককে জিজ্ঞাসা করবে কিনা। শেষ পর্যন্ত না করার সিদ্ধান্ত নিল। পাথর গড়িয়ে পড়া শুরু করলে পাহাড়ের আর কিছু করার থাকে না। হরিশ যাই করুক অভিযান চলবে। কিন্তু লোকদুটো ওকে কি বুঝিয়ে গেল? রিসেপশনিস্ট যে বর্ণনা দিল তার সঙ্গে বসন্তর কাছে আসা গোয়েন্দা সংস্থার লোকদুটোর চেহারা হুবহু মিলে যাচ্ছে। ওরা কি পরিচালককে না পেয়ে প্রযোজককে নিরস্ত করতে এসেছিল? এবং ওদের আপ্যায়ন করতে হরিশকে মদ বলতে হল! তবে ওরা যাই বলে যাক হরিশ যখন তাকে বলেছে ফিল্ম পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করতে তখন মনে হয় অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি।

অলস পায়ে হেঁটে অরিন্দম বাইরে বেরিয়ে এল। সে লক্ষ করল আজ গেটে কোন দারোয়ান নেই। এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় কাউকে দেখেছে বলেও মনে হল না। এদিকটায় জনবসতি বেশ ছাড়াছাড়া, দোকানপাট নেই, ফলে রিক্সার চলাচল

কম। তাছাড়া রাতও হয়েছে। অরিন্দম পিচের রাস্তায় এসে দুপাশে তাকাতেই অনেক দূরে পাহাড়ের ওপরে জ্বলা আলোর মালা দেখতে পেল। কালিম্পং ?

এই সময় গাড়িটাকে দেখতে পেল। হেড লাইট জ্বেলে ছুটে আসছে সেবক রোডের দিক থেকে। গাড়িটা সোজা না গিয়ে ডান দিকে নেমে গেল। ওটা হোটেলের রাস্তা। কয়েক গজ ছুটে বেশ শব্দ করে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল। হেড লাইটে সামনের পথ আলোকিত হওয়া সত্ত্বেও গাড়ির আরোহীদের দেখা যাচ্ছে না। দু' মুহূর্ত। তারপর গাড়িটা সাধারণ গতিতে আবার এগিয়ে গেল হোটেলের দিকে। অরিন্দম বুঝতে পারছিল না নাটকটা। অবশ্য এমন হতে পারে যে, আরোহীরা এই অন্ধকারে হেডলাইটের আলোয় শিলিগুড়ির রাস্তায় ফিল্ম আর্টিস্ট দেখে দেরিতে বুঝতে পেরে চমকে উঠে গাড়ি থামিয়েছিল।

রিক্সার জন্যে আরও মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে হল। তিন চাকার এই যানে দীর্ঘদিন পরে উঠে বেশ ভাল লাগছিল অরিন্দমের। বাতাসে ঠান্ডা মিশে থাকায় একটা চাদরের কথা মনে হলেও সে বেশ আরাম করে বসল। খানিকটা চলার পরে শহরে ঢুকে রিক্সাওয়ালা জানতে চাইল তাকে কোথায় যেতে হবে। অরিন্দম বলল, 'কোথাও না, তুমি এমনি ঘোরো।'

কথাটা শুনে লোকটার ফূর্তি আরও বেড়ে গেল। জোরে জোরে প্যাডেল ঘুরিয়ে ও অরিন্দমকে মহানন্দা নদী ছাড়িয়ে শহরে নিয়ে এল। রাস্তায় তেমন লোকজন নেই। বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর অরিন্দম বাসস্ট্যান্ডের কাছে ফিরে আসতেই ট্যাক্সিটাকে দেখতে পেল। সেই মুহূর্তেই গাড়িটা যেন ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ইঞ্জিন বন্ধ করে চালক দরজা খুলে নামছে। অরিন্দম চটজলদি রিক্সা থামিয়ে রিক্সাওয়ালাকে বলল ড্রাইভারটাকে ডেকে আনতে। সে দেখল প্রথমে লোকটা আসতে অস্বীকার করল। তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'অন্য গাড়ি দেখুন। আজ আর ভাড়া নেব না।' রিক্সায় বসেই অরিন্দম হাত তুলতেই লোকটা যেন অবাক হল। তারপর কয়েক পা এগিয়েই দ্রুত দূরত্বটা ঘোচালো, 'আরে ব্বাস, আপনি! বলুন স্যার।'

অরিন্দম বলল, 'তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে ভাই।'

'বলুন স্যার। আমি আজ সবাইকে বলেছি যে, আপনি এয়ারপোর্ট থেকে আমার গাড়িতে এসেছেন। দিনেরবেলা হলে এখানে পাবলিক জমে যেত। আপনি রিক্সা ছাড়ুন। কোথায় যাবেন বলুন, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।'

রিক্সাওয়ালাকে আশাতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে অরিন্দম গাড়িতে উঠে বসল। ড্রাইভার

খানিকটা যেতেই তাকে রাস্তার একপাশে গাড়িটাকে দাঁড় করাতে বলল সে। ছেলেটি অবাক হয়ে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল কিন্তু অরিন্দম হাত তুলে তাকে থামাল। গাড়ির ড্যাশবোর্ডের আলোয় খুব অল্পই দেখা যাচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। যদি ঠিকঠাক উত্তর দাও তাহলে আমাদের উপকার হবে।'

'বলুন।' ছেলেটি সন্দিগ্ধ গলায় উত্তর দিল।

'আজ বিকালে আমাদের হোটেল থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

'কালীমোড়া ডাকবাংলোয়।'

'সেটা কোথায়?'

'সেবক ব্রিজ ছাড়িয়ে খানিকটা। তিস্তা নদীর গায়ে।'

'যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা কি ওখানেই থেকে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। মনে হয় হোটেলে থাকতে কোন প্রব্লেম হচ্ছিল। একজন মহিলা ছিলেন। তাঁকে বাংলোয় নামিয়ে ভদ্রলোক আবার শিলিগুড়িতে ফিরে আসেন জিনিসপত্র কিনতে। কিন্তু সেগুলো দেখে মনে হয় অনেকদিন থাকার প্ল্যান আছে ওদের। তাছাড়া বাংলোয় ফিরে যাওয়ার আগে দুজন নেপালীর সঙ্গে কথা বলে গেল যারা খুব সুবিধের নয়।'

'বাংলোটা কাদের?'

'পি ডব্লু ডি-র; তবে পাবলিককে ভাড়া দেয়।' ছেলেটির কথা শুনে অরিন্দম বুঝতে পারছিল না, লোকাল লোকের সঙ্গে যদি যোগাযোগ থাকে তাহলে তার সন্দেহ ঠিক কিনা। এবার ছেলেটি উদ্যোগী হয়ে বলল, 'ভদ্রমহিলার খুব সাহস আছে। ওরকম নির্জন বাংলোয় একা কয়েক ঘন্টা থাকা কম কথা নয়। তাছাড়া, আমার মনে হল, ওঁরা স্বামী-স্ত্রী নয়।'

'কিসে তোমার একথা মনে হল?'

'উনি লোকটাকে যেভাবে ধমকাচ্ছিলেন তা স্বামীরা পছন্দ করবে না।'

'অনেক স্বামীকে তো স্ত্রীরা সারাজীবন ধমকেই যান।'

'না। মানে, আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না। কি একটা ব্যাপারে উনি লোকটাকে খুব শাসাচ্ছিলেন। লোকটা কোন একটা কাজ করতে চাইছিল না। ভদ্রমহিলা সেটা না করলে চলে যেতে বলেছিলেন ওকে। লোকটা আবার যেতেও পারছিল না। কেমন কেঁচো হয়ে ছিল।'

ড্রাইভার মোটামুটি জানাল।

অরিন্দমের মনে কৌতূহল জন্ম নিল, 'বাংলোর কাউকে তুমি চেন ?'

'হ্যাঁ। একজনই থাকে। গোবিন্দ চৌকিদার। ও ব্যাটা সন্ধ্যে হলেই মদে বেহুঁশ হয়ে যায়।'

'কতক্ষণ লাগবে যেতে আসতে ?'

'সোওয়া ঘণ্টা বড় জোর।'

'তুমি তো আর ভাড়া খাটবে না। তা না হলে জায়গাটা দেখে আসতাম।'

ড্রাইভার শব্দ করে হাসল, 'তখন আপনাকে না চিনে বলেছি। কিন্তু অন্ধকার রাত্রে তো আপনি কিছুই দেখতে পাবেন না। খুব সুন্দর জায়গা।'

'আমি ঠিক জায়গা দেখতে যেতে চাইছি না।'

ড্রাইভার ইঞ্জিন চালু করল। সোজা এগিয়ে হোটেলটাকে বাঁদিকে রেখে সে গাড়িটাকে তীব্র গতিতে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলল। অরিন্দম ভাবল ওকে আস্তে আস্তে চালাতে বলবে কিনা। কিন্তু এই গতি তার নিজেরও এখন ভাল লাগতে লাগল। শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে দুপাশে জঙ্গল আর মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট রেখে গাড়িটা ছুটে যাচ্ছিল। রাতের নির্জনতায় শুধু গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ আর তীব্র হেড-লাইটের আলো ছাড়া কোথাও প্রাণের চিহ্ন নেই। ওপাশ থেকে কোন গাড়ি আসছে না। ক্রমশ লেভেলক্রশিং ডান দিকে তিস্তার ওপরে রেলওয়ে ব্রিজ রেখে গাড়ি পাহাড়ের রাস্তা বেয়ে উঠতে লাগল। এখন গতি কমেছে। ছেলেটি কোন কথা বলছে না। সম্ভবত নিজের দেওয়া সময়ের আগেই ফিরে আসতে চাইছে সে। বাঁদিকে পাহাড় আর ডানদিকে খাদ। খাদ শেষ হয়েছে তিস্তার বুকে। যদিও অন্ধকার কিন্তু আবছা সবই বোঝা যাচ্ছে।

হঠাৎ দূরে আলো দেখা গেল। ড্রাইভার বলল, 'সেবক ব্রিজ। ডান দিকে মাল-বাজার আর সোজা কালিম্পং-গ্যাংটক। ব্রিজের গায়ে মিলিটারিদের ক্যাম্প আছে।'

বলতে বলতে ওরা করোনেশন ব্রিজের গায়ে এসে পড়তেই দৃশ্যটা দেখতে পেল। দুটো ধোপদুরস্ত মানুষকে মিলিটারিরা খুব জেরা করছে। আর লোক-দুটো ছাড়া পাওয়ার জন্যে কাকুতিমিনতি করছে। হ্যাজাকের আলোয় দৃশ্যটা দেখামাত্র অরিন্দম বলল, 'দাঁড়িও না।'

ড্রাইভার জায়গাটা পেরিয়ে বলল, 'এই ব্রিজটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সবসময় পাহারা থাকে।' আরও কিছুক্ষণ যাওয়ার পর বসন্তর দেওয়া বর্ণনা মনে পড়তেই পেছন ফিরে তাকাল অরিন্দম। কিছুই দেখা যাচ্ছে না আর। লোকদুটোর পেটে কি হরিশ মল্লিকের দেওয়া মদ রয়েছে এখনও ?

দূরে থেকে এই অন্ধকারেও বাংলোটা দেখা গেল। সুন্দর ছবির মত রঙিন বাংলোর গায়ে হেড লাইটের আলো পড়তেই ঝকমকিয়ে উঠল। ড্রাইভার তাকে কিছু বলতে যেতেই অরিন্দম বলল, 'পেরিয়ে যাও। ওই বাঁকের ওপাশে গাড়ি দাঁড় করাও।'

আড়ালে যাওয়ার পর গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে অরিন্দম সতর্ক পায়ে খানিকটা রাস্তা ধরে নামতেই বাংলোর গেটটা দেখতে পেল। গেটের ওপাশে সিঁড়ি সোজা ওপরে উঠে গেছে। নিচে তিস্তার গর্জন। আশে পাশে কোন বাড়ি ঘর নেই। বাংলোর ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে। হঠাৎ টর্চের আলো জ্বলে উঠতেই অরিন্দম ছিটকে সরে গেল। এবং তারপরই চিৎকার। একজন লোক গলা তুলে পরিচয় জানতে চাইছে। অর্থাৎ পাহারাদার এসে গেছে ইতিমধ্যে। অরিন্দম আর ঝুঁকি না নিয়ে পেছন ফিরতেই দেখল গাড়িটা নামিয়ে নিয়ে দরজা খুলে দিয়েছে ড্রাইভার। ততক্ষণে লোকের সংখ্যা আরও বাড়ছে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছে তারা। তীব্র গতিতে গাড়ি পাহাড়ী পথেই ছুটিয়ে মিনিট কুড়ির মধ্যেই হোটেলে পৌঁছে গেল ড্রাইভার। ধন্যবাদ জানিয়ে টাকা দিয়ে আগামীকাল সকালে আসতে বলে অরিন্দম সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই রিসেপ-শনিস্ট বলল, 'স্যার, ইনি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

লোকটার দিকে তাকিয়ে অরিন্দমের মনে হল প্রকৃত খুনীর চেহারা এই রকমই হওয়া উচিত। লম্বা, ছিপছিপে, মেদহীন শরীরে লেগে থাকা শার্ট আর জিনসের প্যান্ট, হাতের শিরায় শক্তির চমৎকার বিজ্ঞাপন। চোখ দুটো ছোট এবং শীতল। মুখের গড়নে এক ধরনের নিস্পৃহ ভাব এঁটে বসানো। লোকটা দাঁড়িয়েছিল কাউন্টারে হেলান দিয়ে, এবার সোজা হল।

অরিন্দম গম্ভীর গলায় বলল, 'বলুন।'

লোকটি হিন্দীতে বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। বেশ কিছু-ক্ষণ ধরে আমি অপেক্ষা করছি। কোথায় বসে কথা বলা যেতে পারে?'

লোকটাকে আবার ভাল করে দেখল সে। যে ভঙ্গিতে কথা বলছে তাতে মনে হচ্ছে ওর কথাই শেষ কথা। প্রতিটি শব্দের সঙ্গে কর্তৃত্ব মিশিয়ে দিচ্ছে। অরিন্দম বলল, 'আই অ্যাম সরি। আমি খুব টায়ার্ড। আপনাকে আমি চিনি না, আপনি বরং কাল যোগাযোগ করবেন ব্যাপারটা জরুরী হলে।'

'জরুরী না হলে আমি এখানে আসব কেন? বসন্তবাবুর কাছে আমি কৈফিয়ত চেয়েছিলাম। আমাকে বলা হয়েছিল তিনিই দলনেতা। কিন্তু বসন্তবাবু বললেন

আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। দ্যাটস হোয়াই আপনার সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি।' দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে টান টান দাঁড়ানো লোকটা কথা বলছিল।

অরিন্দম রিসেপশনিস্টের দিকে তাকাল। ছেলেটা এর মধ্যে কৌতূহলী হয়ে পড়েছে। এবং স্পষ্টত সে লোকটাকে পছন্দ করছে না মুখের ভঙ্গিতে বোঝাচ্ছে। ভিজিটর কাটিয়ে দেবার কায়দা অরিন্দমের চমৎকার জানা আছে। কত রকমের নাছোড়বান্দা ভক্ত অথবা গায়ে-পড়া মহিলাফ্যানকে সে এড়িয়ে গেছে অবহেলায়। কিন্তু এই লোকটি তার সঙ্গে যে গলায় কথা বলছে একমাত্র ক্যামেরার সামনে ছাড়া কেউ বলতে সাহস করে না। অরিন্দম দেখল ওপাশে একটা সোফা খালি রয়েছে। একে ঘরে নিয়ে যাওয়ার সম্মান দেওয়া যেতে পারে না। ইঙ্গিত করে সে সোফায় চলে এল। লোকটা হেঁটে এল লম্বা পা ফেলে। খানিকটা দূরত্ব রেখে যেভাবে বসল তাতে হঠাৎ অরিন্দম ঈর্ষান্বিত হল। ওই শরীর এবং তার স্মার্টনেস বাংলা ছবির নায়কদের কারো নেই। বোঝাই যায় শরীর রাখতে লোকটা রীতিমত পরিশ্রম করে।

'যদি খুব ভুল না করে থাকি তাহলে আপনার নাম ঠক্কর?'

'হ্যাঁ। আমি অবশ্য আপনার নাম আগে শুনিনি। ফিল্মও দেখি না।' লোকটি নির্লিপ্ত গলায় বলল।

নিজের শরীরে একটা অস্বস্তি, অরিন্দম সোফায় নড়েচড়ে বসল, 'বলুন, কি দরকার?'

'আপনি কি জানেন কেন আমি এই দলের সঙ্গে যাচ্ছি?'

'কিছুটা জানি।'

'কিছুটা মানে?'

অরিন্দম সঙ্গে সঙ্গে স্থির করল এর সঙ্গে বেশি কথা বলা উচিত হবে না। সে নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'যাঁরা টাকা দিচ্ছেন তাঁরা আপনাকে আমাদের সঙ্গে পাঠাচ্ছেন সম্ভবত ঠিক জায়গায় পেঁছাচ্ছি কিনা দেখতে।'

ঠক্কর শীতল তাকালো, 'আজ বিকেলে কেউ আমার ঘরে ঢুকেছিল। এই ব্যাপারটা আমি পছন্দ করছি না। সন্ধ্যের পরে আমি লোকটাকে আবিষ্কার করি। কিন্তু তখন সে দার্জিলিং মেলে উঠে বসেছে কলকাতায় যাওয়ার জন্যে। আমি জানতে চাইছি আমার ওপর স্পাইং করা হচ্ছে কেন?'

অরিন্দম এবার উঠে দাঁড়াল, 'যে বিষয় আমার জানা নেই সে বিষয়ে কিছু বলতে পারব না। যা হোক, আপনি যখন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন তখন আশা করব দলের একজন হয়ে যাবেন। আর কেউ যাতে এরকম ব্যবহার না করে তার ব্যবস্থা।'

করতে আমি বসন্তকে বলব। ঠিক আছে ?'

'না ঠিক নেই। আপনাকে দলের নেতা বলা হয়েছে। তাই আপনাকে জানানো প্রয়োজন ওই ভেঙে-পড়া প্লেনের সন্ধানে এই শহর থেকে আরও কয়েকটা দল রওনা হয়েছে বা হচ্ছে। এই দলগুলোর কেউ চায় না অন্য দল ওই স্পটে যাক। ফলে একটা হাঙ্গামা আমি আশঙ্কা করছি। আপনারা কি তৈরি হয়ে যাচ্ছেন মোকাবিলা করার জন্যে ?'

'তৈরি ? না না। আমরা কারো সঙ্গে মারপিট করতে চাই না। তৈরি হওয়ার তাই প্রশ্নই ওঠে না।'

ঠক্করকে যেন এবার একটু স্বাভাবিক দেখাল। অরিন্দমের মনে হল লোকটা তার কাছে কোন অস্ত্র নেই জেনে নিশ্চিন্ত হল। এইটে জানবার জন্যে কি ও এখানে অপেক্ষা করছিল ? অরিন্দম মাথা নেড়ে বিদায় নিয়ে এগিয়ে যেতেই কথাটা খেয়াল করে ঘুরে দাঁড়াল। ততক্ষণে লোকটা নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি বেয়ে। শীতল সাপের মত অন্ধকারে মিশে গেল মুহূর্তেই। অরিন্দম রিসেপশনিস্টকে অনুরোধ করল টেলিফোন ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্যে। শিলিগুড়িতে লাইন পেতে দেরি হল না। বসন্তর ঘরে টেলিফোন নেই। তাকে ডাকতে পাঠানো হল। মিনিটখানেক রিসিভার ধরে রাখা খুবই বিরক্তিকর। শেষ পর্যন্ত বসন্তর গলা পাওয়া গেল। অরিন্দম বলল, 'বসন্ত, যে লোকটিকে তুমি আজ দার্জিলিং মেলে ফেরত পাঠিয়েছ সে কি একা স্টেশনে গিয়েছিল ?'

বসন্ত যেন হকচকিয়ে গেল, 'কেন বলুন তো ? আমি ঠিক জানি না। কিছু হয়েছে নাকি ?'

'আমার একটা অনুমান, অনুমানই বলতে পার, লোকটা যদি একা গিয়ে থাকে তাহলে ওর খবর ভাল নাও হতে পারে। তুমি প্রোডাকসন ম্যানেজারকে বল খোঁজ-খবর নিতে। আর ঠক্কর লোকটাকে কেউ যেন না ঘাঁটায়। ওকে ওর মত থাকতে দাও। রাখছি।'

সকালেই সমস্ত ইউনিট রওনা হয়ে গেছে গ্যাংটকের উদ্দেশে। যারা ওখানে থাকতে চায় তারাই অবশ্য এখন এই দলে। সহদেব সেন এবং বসন্ত প্রত্যেককে বুঝিয়েছে শুধু আবেগ বা কৌতূহলের বশে গ্যাংটক থেকে পা বাড়ানো মানে আত্মহত্যা করা। শরীর শক্তিহীন হলে পাহাড় ক্ষমা করে না। নিজেকে অশক্ত বা বয়স্ক হিসেবে পাঁচজনের সামনে প্রমাণিত হতে দিতে কারোরই ইচ্ছে করে না। ফলে সহদেবদের সময় লেগেছে অনেক। ওরা ঠিক করেছিল এখন থেকে দলের নির্বাচিত সদস্যদের নাম ঘোষণা করে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হওয়ার বদলে একদম অশক্তদের শিলিগুড়িতেই বাদ দিয়ে বাকিদের গ্যাংটকে জানালেই চলবে। হরিশ মল্লিককে গ্যাংটক পর্যন্ত নিয়ে যেতেই হবে। ওই মানুষ শিলিগুড়ি থেকে ফেরার পাত্র নন। তাছাড়া, ছবিটার সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং মানসিক সম্পর্ক যাঁর অঙ্গাঙ্গি তাঁকে ফেরত পাঠানো মানে হয়তো এখনই আর একটা দুর্ঘটনা ডেকে আনা।

কালকের সেই ট্যাক্সিতে অরিন্দম, হরিশ মল্লিক, বসন্ত আর সহদেব সেন শিলিগুড়ি ছাড়ল একটু বেলায়। মিনিবাসকে পথেই ধরে নেবে ছোকরা এমন তড়পাচ্ছিল। কিন্তু অরিন্দম তাকে একদম তাড়াহুড়া না করার উপদেশ দিল। হরিশ মল্লিককে আজ সকাল থেকে বেশ চাঙ্গা দেখাচ্ছে তবু কোন ঝুঁকি নয়। অরিন্দম বুঝতে পারছিল না মদ পেটে পড়ায় না যাওয়ার আনন্দে হরিশের এই পরিবর্তন। আজ সকালে তাকে যুধিষ্ঠিরের মত সত্যি কথা বলতে হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ এসেছিল দুটো ব্যাপারে খোঁজ করতে। কলকাতা থেকে খবর নিতে বলা হয়েছিল শিলিগুড়ির অভিযাত্রী দলে হরিশ মল্লিক আছেন কিনা। তাঁর স্ত্রী নিখোঁজ হওয়ার খবর জানার পর থানায় ডায়েরি করেছেন। অরিন্দমের সামনে দাঁড়িয়ে পুলকিত পুলিশ অফিসার বলেছিল, 'বুঝতেই পারছেন এটা আমার ডিউটি। হরিশবাবু যখন কোন ক্রাইম করেননি তখন আপনি যা বলবেন সেই মত রিপোর্ট দেব। উনি যে এখানে আছেন তা আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু ওঁর স্ত্রী কেন ডায়েরি করলেন তা বুঝতে পারছি না।'

অরিন্দম জবাব দিয়েছিল, 'আপনি যদি বিবাহিত হন তাহলে এটা বুঝতে কোন অসুবিধে হবার কারণ নেই। বিয়ের আট দশ বছর বাদে প্রায় প্রতিটি স্বামী এবং স্ত্রী আলাদা করে মাঝে মাঝে নিজেদের কাছ থেকে পালাতে চায়। প্রায়ই তো তাদের মনে হয় এত মেনে নিয়ে একত্রে বাস করা সম্ভব নয়। তবু থাকতে হয়।'

অফিসারটি সিনেমার নায়কের মুখে এই সংলাপ শুনে আরও খুশি হল, 'যা বলেছেন। দ্বিতীয় সমস্যাটি, সমস্যা ঠিক নয় যদিও, আপনাদের দলের একজনকে কাল রাত্রে দার্জিলিং মেলে আহত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। লোকটাকে হসপিটা-লাইজড করা হয়েছে। সে বলতে পারছে না কিভাবে আহত হল। আততায়ী নাকি পেছন থেকে আক্রমণ করায় সে কিছু বুঝতে পারেনি। আপনার পরিচালকও কিছু বলতে পারলেন না।'

খবরটা কাল রাত্রেই শোনার পর অত্যন্ত অস্বস্তিতে ছিল অরিন্দম। বেশ রাত্রে রিক্সা নিয়ে ছুটে এসেছিল বসন্ত। হসপিটালগুলোয় খোঁজ নিয়েছিল সে অরিন্দমের ফোন পেয়ে। আর তখনই জেনে গিয়েছিল দুর্ঘটনার কথা। অর্থাৎ লোকটাকে আহত করে ঠক্কর এসেছিল অরিন্দমের কাছে। অথচ তার ব্যবহারে সেটা কিছুতেই বোঝা যায়নি, বসন্ত উত্তেজিত হয়ে তখনই ঠক্করের নাম পুলিশকে জানাতে চেয়েছিল। কিন্তু অরিন্দম আপত্তি করেছিল। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে দার্জিলিং মেল ছাড়ার আগে যে ভিড় হয় সেই ভিড়ে ঘটনাটা ঘটিয়ে যখন ঠক্কর বেরিয়ে এসেছে কারো চোখে না পড়ে, তখন পুলিশ প্রমাণ করতে পারবে না কিছু। মাঝখান থেকে লোকটার সঙ্গে সম্পর্ক আরও খারাপ হবে। ঠক্করকে রেখে গেলে স্পনসর চুক্তি বাতিল করে দিতে পারে। সে বসন্তকে উপদেশ দিয়েছিল ঘটনাটা কাউকে না জানাতে। ইউনিটের সবাই জানুক এটা একটা দুর্ঘটনা। অনেক কথার পর বসন্তকে ঠাণ্ডা করা গিয়েছিল। সকালে পুলিশ অফিসারকে অরিন্দম জবাব দিয়েছিল, 'এটা আপনাদের ব্যাপার। যাকে আক্রমণ করা হল সে যখন বলতে পারছে না আততায়ী কে, তখন আমি এত দূরে হোটেলে বসে কি করে বলব এ সম্পর্কে। আপনারা তদন্ত করুন। দলের সবাই পাহাড়ে যাচ্ছি। ফিরতে তো হবে এই পথেই। দলের কেউ যদি ঘটনাটার জন্যে দায়ী হয় তবে তখন তাকে পেতে আপনার অসুবিধে হবে না।' কিন্তু একথা বলার পরেও অস্বস্তিটা থেকেই গিয়েছিল। যে লোক অমন কাজ সুন্দর হাতে করে নির্লিপ্ত হয়ে থাকতে পারে তার কাছে খুন করা কোন ব্যাপারই নয়। তা ছাড়া, ঠক্কর গত রাত্রে এসেছিল সংগে কোন অস্ত্র আছে কিনা জানতে। এই ব্যাপারটাও খুবই অস্বস্তিকর।

ট্যাক্সি ড্রাইভার ছোকরাটি অরিন্দমের খুব বাধ্য হয়ে উঠেছে। সে বসেছে ড্রাইভারের পাশে, একা। পেছনে বাকি তিনজন। হরিশ খুব উৎফুল্ল মুখে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, 'পুলিশ আসবে জানতাম। শিবানী এত সহজে আমাকে ছেড়ে দেবে না। কি মনে হয়, গ্যাংটকে আবার ঝামেলা হবে?'

অরিন্দম দুপাশের ক্যান্টনমেন্ট আর জঙ্গল দেখতে দেখতে বলল, 'আপনি তো অপ্রাপ্তবয়স্ক নন। এসব নিয়ে না ভেবে প্রকৃতি দেখুন। আর যদি শিবানীদেবী নিজেই এসে পড়েন তো দুজন পাহাড়ি হলি ডে এনজয় করবেন। ওই দেখুন, ওপাশে তিস্তা।'

সহদেব বললেন, 'নদীটাকে দেখলে বোঝাই যাবে না আটষট্টি সালের বন্যায় কি ফেরোসাস হয়েছিল। এই পাহাড়ি রাস্তায় জল উঠে এসেছিল, ভাবতে পারেন।'

অরিন্দম হেসে বলল, 'এই জন্যেই সম্ভবত নদীকে মেয়েদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। দেখে কিছুই বোঝা যায় না।' সেবক পেরিয়ে যাওয়ার সময় গত রাতের লোক দুটোর কথা মনে পড়ল। মিলিটারিরা ওদের ছেড়ে দিয়েছে কিনা কে জানে। এবং তখনই খেয়াল হল হরিশ মল্লিক তার গেস্ট দুজনের ব্যাপারে কিছুই বলেনি এখনও।

কালিঝোরা বাংলো ছাড়িয়েই গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। বসন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে থামলেন কেন?'

দরজা খুলে অরিন্দম বলল, 'পাঁচ মিনিট। আমি এখনই আসছি।'

কাল রাত্রের অন্ধকারে যা ছিল রহস্যময় এখন তা ছবির মত উজ্জ্বল। ডান দিকে একটা ঝরনা সশব্দে নেমে যাচ্ছে পাহাড় থেকে তিস্তার বুকে। রঙিন বাংলো নিশ্চুপ। ঝিঁঝি ডাকছে জঙ্গলে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিল অরিন্দম। পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে দেখল ড্রাইভার ছোকরা উৎসাহিত হয়ে আসছে দৌড়ে। সে কিছু বলার আগে ছোকরা বলল, 'আমি আগে যাই। কাল এখান থেকে টর্চ ফেলেছিল ওরা।'

অরবিন্দ ওকে যেতে দিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে বাঁধানো চাতালে উঠে আসতেই তিস্তা নদীটিকে দেখতে পেল। পাহাড় থেকে নেমে যাওয়ার শেষ পর্বে নদী এখানে বেশি চওড়া নয়। বাংলোর এবং ওপাশের খাড়া পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে তীব্র স্রোত নিয়ে বয়ে যাচ্ছে। দৃশ্যটি মন ভরানোর। এই সময় ড্রাইভারের চিৎকার ভেসে এল, 'কেউ নেই স্যার। বাংলো ফাঁকা।'

এই রকমটাই আশা করেছিল অরিন্দম। ভদ্রমহিলা সব সময় তাদের থেকে

এগিয়ে যাবেন। অরিন্দম ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল চারপাশ। গত রাত্রে এখানে লোক ছিল তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু সেই চৌকিদারটা কোথায় গেল। তৃতীয় ঘরটায় গিয়ে অরিন্দম বুঝতে পারল এই ঘরেই ভদ্রমহিলা ছিলেন। মেয়েলি গন্ধ এখন বাতাসে ছড়ানো। অরিন্দম ড্রয়ারগুলো টেনে দেখতে লাগল। খবরের কাগজের দুটো পাতা, খাবারের এঁটো প্লেট ছাড়া কিছু নেই। সে টয়লেটে ঢুকল। প্রথমে নজর এড়িয়ে গিয়েছিল, তারপর সন্দেহ হতে এগিয়ে গিয়ে র‍্যাক থেকে সে ঘড়িটা তুলে নিল। একটা সুন্দর দামী লেডিস ঘড়ি। অরিন্দম বস্তুটিকে নাকের কাছাকাছি আনতে একটু গন্ধ পেল যা ঘরের বাতাসে ভাসছে। মহিলা কি স্নান করবেন বলে এখানে ঢুকে ঘড়িটা খুলে রেখেছিলেন এবং নব্বুই ভাগ ক্ষেত্রে যা হয়, যাওয়ার সময় এটার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন? অবশ্য ঘড়িটি ওই মহিলারই কিনা তা নিয়ে তর্ক তোলা যেতে পারে। কিন্তু অরিন্দমের মনে হল সেটা না হওয়ার কোন কারণ নেই। সে পকেটে সযত্নে ঘড়িটাকে রাখতেই ড্রাইভার এসে দাঁড়াল, 'স্যাব, কাল রাত্রে এখানে ছ'জন লোক ছিল।'

'কি করে বুঝলে?'

'ছ'টা খাবারের এঁটো প্লেট পড়ে রয়েছে। চৌকিদার এখনও ওগুলো ধোয়নি।'

অরিন্দম খুশি হল, 'বাঃ, তুমি তো দেখছি ভাল ডিটেকটিভ হতে পার।'

মাথা চুলকে ছেলেটি বলল, 'আমি প্রত্যেক বছর ফেলুদা পড়ি স্যার।'

আর কোন সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া গেল না। চৌকিদার এখনও বেপাত্তা। অরিন্দম নেমে এল। মনে হচ্ছিল যদি কখনও সাতদিনের অবকাশ পাওয়া যায় তাহলে এই বাংলোয় এসে থাকতে হবে। এত নির্জন সুন্দর যে সমস্ত শরীরে অক্সিজেন ছড়ায়। সে হেসে ফেলল। ভাল জায়গা দেখলে কতবার এ কথা মনে হয়েছে, কিন্তু কলকাতায় ফিরলেই সব এলোমেলো হয়ে যায়।

সেবক রোড থেকে তিস্তা বাজার হয়ে কালিম্পং-এর পাশ ঘেঁষে গ্যাংটকে যাওয়ার এই পথটি সম্ভবত পৃথিবীর যে কোন সুন্দর পাহাড়ি জায়গার সঙ্গে

পাল্লা দিতে পারে। অন্তত তিস্তা বাজারে দাঁড়িয়ে ওরা যখন গাড়িটাকে কয়েক মিনিট বিশ্রাম দিচ্ছে তখন অরিন্দমের মনে হল কলকাতা ছাড়া পরিচিত পৃথিবীতে লোভনীয় থাকার জায়গার সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। সহদেব সেন আর বসন্ত গিয়েছে চায়ের সন্ধানে। গাড়ি থেকে নেমে হরিশ মল্লিক বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি জানেন যে আমাদের সঙ্গে অন্য পার্টিও যাচ্ছে?'

অবাক হতে হতেও হেসে ফেলল অরিন্দম, 'তাই নাকি? আপনি জানলেন কি করে?'

'একটা ব্যাপার হয়েছে।' হরিশ মল্লিক এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিলেন, 'কাল রাতে দুটো লোক এসে আমাকে প্রথমে অনেক অনুরোধ করল, পরে শাসালো। ওদের বক্তব্য এই অভিযান করে যখন লাভ হবে না তখন খামোকা কষ্ট করে কি লাভ। আমরা যাচ্ছি বলেই ওদের যেতে হচ্ছে।"

অরিন্দম মানুষটির দিকে তাকাল, 'আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন?'

'আমাকে নিষেধ করা হয়েছিল যেন কাউকে একথা না বলি। ওরা অবশ্য কিছুতেই বলল না, কেন ওদের যেতে হচ্ছে। কিন্তু আপনাকে ব্যাপারটা না বললে অন্যায় হত।'

'ঠিক আছে। আর কাউকে বলার দরকার নেই। এসব নিয়ে ভাববেন না।'

গ্যাংটক শহরটা দেখে মোটেই খুশি হল না অরিন্দম। যে কোন অভিজাত পাহাড়ি শহরের সঙ্গে তুলনায় আসে না। অনন্ত যে হোটেলে ওদের থাকার ব্যবস্থা করেছিল তার নাম দি ক্যাসেল। বাড়িটার সঙ্গে নামের চমৎকার মিল রয়েছে। সহদেবকে নিয়ে বসন্ত চলে গিয়েছে দলের অন্যান্যরা যেখানে রয়েছে সেখানে থাকতে। তাদের আজ সারাদিন অনেক কাজ শেষ করতে হবে।

এখন দুপুর। এখানে ঠান্ডাটা চমৎকার। এতটা পথ পাহাড়ি রাস্তায় আসার পরিশ্রমে হরিশ মল্লিক বেশ ক্লান্ত। সামান্য কিছু মুখে দিয়ে সে তার ঘরে শুয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে আজ আর বাইরে বেরুবার সামর্থ্য হবে না। অরিন্দম ঠিক করল, অনেক হয়েছে, এবার বসন্তকে বলতে হবে মিসেস মল্লিককে খবরটা পাঠাতে। তিনি এসে স্বামীকে সঙ্গ দিন।

হোটেলে থাকতে মোটেই ভাল লাগছিল না অরিন্দমের। সে সেজেগুজে যখন বেরিয়ে এল তখন আড়াইটে বেজে গেছে। এরই মধ্যে রোদের চেহারা ফিনফিনে। হালকা ঠান্ডা বাতাস বইছে। রিসেপশন পেরোতেই সে দেখতে পেয়েছিল, ড্রাইভার ছোকরাটি অপেক্ষা করছে। বাইরে এসে দাঁড়াতেই ছেলেটা বলল, 'নমস্কার স্যার,

সব কথা বলা হয়ে গেছে।'

অরিন্দম গলায় বিরক্তি নিয়ে বলল, 'তুমি প্রায়ই নমস্কার বলে কথা শুরু কর কেন বল তো ?'

'আপনি স্যার কত নামী লোক, আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাব তাই কোনদিন ভাবিনি।'

ছেলেটি বিগলিত, 'আমি জঙ বাহাদুরের সঙ্গে কথা বলেছি। ও তিনটে নাগাদ যেতে বলেছে। আমি তো মালটা চিনি না, যদিও ঠকাবে বলে মনে হয় না, তবু আপনার যাওয়া উচিত।'

'জঙ্ বাহাদুর কত দূরে থাকে ?'

'ও বাজারের নিচে পুরোন জিনিসপত্রের বিরাট দোকানটায় থাকবে।'

অরিন্দম একটু ইতস্তত করল। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বেআইনী। পুলিশ জানলে তো ঝামেলা হবেই, খবরটা জানাজানি হলে খবরের কাগজের মুখরোচক মশলা হয়ে যাবে। কিন্তু শহরটা গ্যাংটক বলেই তার পক্ষে যাওয়া চলতে পারে। কারণ হোটেল ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে এই যে তারা নেমে আসছে কেউ তাকে লক্ষ্যই করছে না। বাঙালী ফিল্মফ্যান সম্ভবত এখানে খুব কম। ছেলেটিকে কোন উত্তর না দিয়ে সে হাঁটতে লাগল। খানিকটা দূরত্ব রেখে ছেলেটি হাঁটছে। তার মুখ চোখে বেশ কৌতূহল। অরিন্দম ব্যাপারটাকে পাত্তা না দিয়ে শহরটাকে দেখছিল। এদিকে দোকানপাট নেই। কালিম্পং-এর বাজার পেরিয়ে টুরিস্ট লজের দিকে যাওয়ার রাস্তাটা অনেকটা এই রকম। হঠাৎ ছেলেটা বলল, 'মারপিট হতে পারে স্যার ?'

অরিন্দম মাথা নাড়ল, 'হতেও পারে নাও পারে। শুনেছি ওসব অঞ্চলে ডাকাতি হয় খুব।'

বাজারে এসে অরিন্দম বুঝতে পারল কেউ কেউ তাকে দেখছে। সে খুশি হল। এটা এখন অভ্যেসের মধ্যে চলে এসেছে। একটা চওড়া রাস্তার দুপাশে জমজমাট দোকানপাট ছাড়িয়ে ওরা খানিকটা নিচে নেমে আসতেই ছেলেটি বলল, 'ওই যে স্যার, ওই দোকানটা।'

একটা বড়সড় কিউরিও শপ। এখন কোন খদ্দের আছে বলে মনে হল না। অরিন্দম নিজে যাওয়ার ঝুঁকি নিল। দোকানে ঢুকতেই একজন বৃদ্ধ সিকিমিজ এগিয়ে এলেন। খুব নরম গরম গলায় ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কোন সাহায্য করতে পারেন কিনা। কিছু জবাব দেবার আগেই ছেলেটি বলল, 'জঙ বাহাদুর কোথায় ? সে আমাদের এখানে আসতে বলেছে।' চারপাশে লোভনীয়

জিনিসপত্র সাজানো। এরকম দোকানে ঢুকলেই মনে হয় সব কিনে ফেলি। অরিন্দম একটা প্রাচীন ভোজালি দেখার ভান করল। বৃদ্ধ একটু সময় নিয়ে বললেন, 'আমি তো তার খবর রাখি না। তবে হ্যাঁ, আপনারা অপেক্ষা করতে পারেন, সে যদি এসে পড়ে ভালই।'

অরিন্দম ভোজালিটার দাম জিজ্ঞাসা করতেই বৃদ্ধ পাশে এগিয়ে এলেন। মিষ্টি গলায় যে দাম বললেন তা অবিশ্বাস্য বলে ঠেকল। সে কথা জানাতেই বৃদ্ধ বললেন, 'এর ইতিহাস জানলে মনে হবে জলের দরে পেয়ে যাচ্ছেন। ঠিক আছে, আপনি ভেতরে আসুন, সেখানে আরও জিনিস আছে, দামও কম হবে। পছন্দমত বেছে নিতে পারবেন।' কথাগুলো শেষ করে একটা সিকিমিজ শব্দ উচ্চারণ করলেন বৃদ্ধ। অরিন্দম দেখল একটি ফুটফুটে কিশোরী বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। তারপর নির্লিপ্ত মুখে কাউন্টারে গিয়ে বসল। বৃদ্ধ তাকে ইশারা করল ভেতরে আসতে। অরিন্দম ছেলেটিকে ইঙ্গিত করল বাইরেই অপেক্ষা করতে। মনে হল এতে সে খুশি হল না। ভেতরের ঘরটি মাঝারি, একটু অন্ধকার অন্ধকার। জিনিসপত্র এখানেও সাজানো। একটা ছোট টেবিলের দুপাশে সুন্দর মোড়া সাজানো। বৃদ্ধ তাকে বসতে বলে নিজে বিপরীত দিকে আরাম করে বসলেন, 'আপনি কোথায় উঠেছেন?'

'দি ক্যাসেলস-এ। আমার এখানে আসার কারণটা কিন্তু ভোজালি কিনতে নয়।'

'ওই ছেলেটি ট্যাক্সি চালায়। গল্প ছড়িয়ে দেবার পক্ষে খুব ভাল। মালটা আপনার কেন চাই আমি জিজ্ঞাসা করছি না। তবে আমার দোকান থেকে ওটা বিক্রি হবে না। আপনি কি টাকা সঙ্গে এনেছেন?' বৃদ্ধ একই স্বরে কথা বলে যাচ্ছিলেন।

অরিন্দম একটু ইতস্তত করল। তারপর বলল, 'জিনিসটা যখন এখান থেকে বিক্রি হবে না তখন টাকার প্রশ্ন উঠছে কেন?'

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, 'ঠিক কথা। জিনিসটা জার্মানির। লেটেস্ট মডেল। ব্যবহার করতে কোন ঝামেলা নেই। আপনি সাড়ে চার হাজার দেবেন। খুব সস্তায় পাচ্ছেন। এক ডজন ফ্রি পাবেন সঙ্গে।

'সাড়ে চার হাজার?' অরিন্দম অবাক হল।

'আসল দাম অনেক বেশি। দরাদরি করবেন না। আপনি হোটেলে পৌঁছবার আগেই একটা প্যাকেট পৌঁছে যাবে। জঙ বাহাদুরই পৌঁছে দেবে। কিন্তু টাকাটা

এখানেই দিয়ে যেতে হবে। আপনি বলতে পারেন কিভাবে আমাকে বিশ্বাস করবেন ? এই ব্যবসায় কিন্তু বিশ্বাসটাই আসল কথা। বাইরের কাউন্টারে যাকে দেখলেন সে আমার নাতনি। ও আপনার সঙ্গে যাবে। প্যাকেট পেয়ে গেলে ওকে না হয় ছেড়ে দেবেন।' বৃদ্ধ হাসলেন।

'আমি আপনাকে চার হাজার দেব। আর আপনার নাতনিকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না।' অরিন্দম দ্রুত টাকাটা বের করে গুনে টেবিলের ওপর রেখে উঠে দাঁড়াল। বাইরে বেরিয়ে আসার সময় যদিও মনে হচ্ছিল ঝুঁকিটা একটু বেশি নেওয়া হয়ে গেল তবু তার ভাল লাগছিল। এই বৃদ্ধ জিনিসটা পাঠাবেই। এখন দামের ব্যাপারে সে ঠকতে পারে, এই পর্যন্ত।

ছেলেটি বেশ উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'জঙ বাহাদুর কি ভেতরে, ছিল স্যার ?'

'না। তাকে তো দেখলাম না।'

'দেখেছেন ? আমাকে টুপি পরাল। আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না। আমি এখনই ওকে খুঁজে বের করছি। আমি জানি ও এই কারবার করে।'

'তুমি কি করে জানলে ?'

'ট্যাক্সি চালাতে চালাতে এসব খবর কানে আসে স্যার। এর আগে স্মাগলিং করতে গিয়ে ধরা পড়ে তিন বছর জেল খেটেছিল।'

অরিন্দম পার্স বের করে একটা একশ টাকার নোট এগিয়ে ধরল, 'তুমি অনেক করেছ।'

ছেলেটি দু'পা সরে গেল, 'না না স্যার। আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে পারি ? তাছাড়া কাজটাই তো হল না। আমাকে আবার এখনই কালিম্পং-এ নেমে যেতে হবে। কি যে করি।'

'তোমাকে কিছুই করতে হবে না। শুধু এসব ব্যাপার যেন জানাজানি না হয় তাই দেখো।'

ছেলেটিকে সরিয়ে অরিন্দম একা একা হাঁটছিল। হঠাৎ তার নিজেকে প্রতারিত বলে মনে হচ্ছিল। বৃদ্ধ যদি তার টাকাটা স্রেফ হজম করে দেয় তাহলে কিছুই করার থাকবে না। হঠাৎ ওরকম স্মার্ট হতে গেল কেন সে ? আফশোসবোধটা ক্রমশ বড় হতে লাগল। হোটেলের সামনে ফিরে আসতে আসতেই দিনের আলো নিভল। বসন্তদের আসার সময় হয়ে গেল। রিসেপশনের সামনে এসে চাবি চাইতেই লোকটি চাবির সঙ্গে একটা কাগজে মোড়া বাক্স এগিয়ে দিল, একজন আপনাকে এই গিফট

দিয়ে গেছে।'

অরিন্দমের হাত কাঁপছিল, 'একজন মানে ?'

'একটি সিকিমিজ মেয়ে।'

অরিন্দম মাথা নাড়ল। তারপর জিনিস দুটো নিয়ে উত্তেজনা চেপে এগিয়ে যাওয়ার মুখে থমকে দাঁড়াল। লাউঞ্জের বেতের চেয়ারে জিন্স-এর প্যান্ট এবং সাদা পুলওভার পরা যে মহিলা বসেছিলেন একটা ইংরেজি-পত্রিকা হাতে নিয়ে তিনি এবার উঠে দাঁড়ালেন সম্রাজ্ঞীর মত।

অরিন্দম দেখল তিরতিরে একটা হাসি ঢেউ-এর মত দুলে গেল ঠোঁটের কেন্দ্র থেকে দু প্রান্তে। এতদিন ফিল্মে প্রচুর অভিনেত্রীর মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও অরিন্দম স্পষ্ট অনুভব করল তার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। সৌন্দর্য অনেকেরই থাকে, কেউ কেউ তা লালনও করে থাকেন কিন্তু রূপের এমন ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখেন সম্ভবত মুষ্টিমেয়। একটি ইংরেজি ছবিতে আহত নায়ক নায়িকাকে নিজের রক্ত আঙুলে তুলে বলেছিল, দিস ইজ মাই ব্লাড, দিস ইজ ইউ। এ যেন রক্তে মিশিয়ে নেওয়া। আর এই মহিলা যেন অনুমতি অথবা ইচ্ছের অপেক্ষা না রেখে অনায়াসে সেখানে ঘাই মারতে পারেন মাছের মত।

দুটো হাত যুক্ত করতে গিয়ে সামলে নিল অরিন্দম। প্যাকেটটা খুব ছোট নয়। সে মুখেই নমস্কার শব্দটা উচ্চারণ করে সমতা আনার চেষ্টা করল। ভদ্রমহিলা এবার তার মুখোমুখি। অন্তত পাঁচ সাত হবেই। মেয়েলি স্বর নয়, ছেলেদের মত ক্যাটকেটে ভাবও নেই, এক ধরনের নিষ্প্রভ করে দেওয়া গলায় শব্দ বাজল, 'যদি খুব ভুল করে না থাকি, আপনি অরিন্দম ?'

ভুল তুমি করনি খুকি, ভুল করার খুকি তুমি নও। অরিন্দম মাথা নাড়ল, 'যথার্থ।'

'আপনি কি খুবই ব্যস্ত ? আই মিন— !' কথা শেষ না করে চোখে যে মুদ্রা ফুটে উঠল তার একটাই অর্থ, যতই ব্যস্ত হও আমার তাতে কিস্যু এসে যায় না। অরিন্দম ব্যাপারটা উপভোগ করল। যার সম্পদ আছে তার ক্রীতদাস হওয়ার মত সুখ আর কিসে ? তবু দীর্ঘদিনের অভ্যেস, ফিল্মের নায়ক হবার অভিজ্ঞতা কাজে লেগে গেল মুহূর্তে, 'পাঁচ মিনিট সময় পেতে পারি ? একবার ঘরে যাওয়া খুব প্রয়োজন।'

'ও সিওর।' কাঁধ ঝাঁকালেন মহিলা, 'পাঁচ মিনিট মানে তো তিনশো সেকেন্ড।' কথাটা শেষ করেই নিজের চেয়ারে ফিরে গেলেন মহিলা। অরিন্দম আর দাঁড়াল

না। অনেকদিন পরে মনে হচ্ছে সমস্ত শরীরে ঝিমঝিমে ভাব এসেছে কোন মহিলার সামনে দাঁড়িয়ে। কিশোরকালে বরানগরের কুঠিঘাট রোডে এক কিশোরীকে দেখে এই রকম হয়েছিল। সে ছিল শুধু চোখের দেখা। নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করল অরিন্দম। এবং তখনই টেলিফোন বাজল।

প্যাকেটটা টেবিলের ওপর রেখে রিসিভার তুলতেই বসন্ত কথা বলল, 'দাদা, বেরিয়েছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ। কি খবর?' বসন্তর সঙ্গে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে করছিল না।

'আমরা আপনার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি। হরিশবাবুর ঘরে আছি। আমরা যাব না আপনি আসবেন? অনেক জরুরী আলোচনা রয়েছে।' বসন্ত জানাল।

তিনশ সেকেণ্ড হতে কত বাকি? অরিন্দম বলল, 'আমাকে একটু সময় দিতে হবে যে। ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি নিজেই হাজির হব।' কথা বাড়াতে না দিয়ে লাইনটা ছেড়ে দিল সে। এবং তারপরেই প্যাকেটটা নজর করল। চটপটে আঙুলে প্যাকেট খোলার চেষ্টা করল সে। একজন, তার দেখা সুন্দরীদের মধ্যে অন্যতমা নিচে অপেক্ষা করছেন আর সে কতটা বোকা বনল তার প্রমাণ প্যাকেটের মধ্যে অপেক্ষা করছে—কৌতূহল দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে জরুরি হল। ছোট্ট কাঠের বাক্স, পেরেক মারা। খোলার যন্ত্র কাছে নেই। অনেক কষ্টে একটা নেল কাটারের ছুরির সাহায্যে মুখ বড় করল অরিন্দম। এবং তারপরই বস্তুটি চোখে পড়ল। বৃদ্ধ ঠকায়নি। ভেলভেট জাতীয় কাপড়ের বুকে শুয়ে আছে রিভলভারটা। পাশেই একডজন গুলি। সযত্নে ওটাকে হাতে তুলে ঘুরিয়ে দেখল অরিন্দম। বিদেশী কোম্পানির ছাপ, হাতল এবং নলের মুখ বলে দিচ্ছে এটি এর আগে ব্যবহৃত হয়নি। কোথাও কোথাও বিশ্বাস করলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। কথাটা আর একবার সত্যি হল। ভেতরটা খুলে দেখল সে। গুলি নেই। যন্ত্রটা এখন কতটা চালু তা পরীক্ষা করার উপায় নেই। সে ফলস ট্রিগার টিপল। আওয়াজটা খারাপ শোনাচ্ছে না। এবং তখনই অরিন্দমের মনে পড়ল লাইসেন্স-বিহীন আগ্নেয়াস্ত্র রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ। পুলিশ যদি এর সন্ধান পায় তাহলে আর রক্ষে থাকবে না। যে কারণে তাকে বিশ্বাস করে কিউরিও শপের মালিক দোকান থেকেই এটিকে বিক্রি করেনি, সেই একই কারণে এই ঘরে রাখা বিপজ্জনক। ট্যাক্সি ড্রাইভার এবং বৃদ্ধ সিকিমিজ ছাড়া যদিও আর কেউ জানে না, সে এটির সন্ধানে ছিল, না, অরিন্দম মাথা নাড়ল। অন্তত আরও দুজন এই ব্যাপারটার সঙ্গে

জড়িত। যে এই হোটেলে পেঁৗছে দিয়ে গেল প্যাকেটটা আর জঙ্ বাহাদুর নামের সেই লোকটাও ওয়াকিবহাল থেকে যাচ্ছে। এই অজানা জায়গায় কার কি মতলব আছে তা টের পাওয়া মুশকিল। স্মাগলড্ জিনিস বিক্রি করে পুলিশকে খবর দিয়ে খদ্দেরকে গ্রেফতার করানোর ঘটনা অনেক। অরিন্দম ঘড়ি দেখল। তিনশো সেকেণ্ড তো দূরের কথা সময় দশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। সে চটপট রিভলভারটাকে পকেটে ভরে নিল। আজই পরে ভেবেচিন্তে এর একটা সুরাহা করতে হবে। খালি প্যাকেট-টাকে সযত্নে আগের চেহারায় ফিরিয়ে এনে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

লবিতে নেমে সে ঠোঁট কামড়াল। ভদ্রমহিলা নেই। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে হোটেলের সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল। না, কোথাও ওঁকে দেখা যাচ্ছে না। খারাপ লাগছিল অরিন্দমের। কোন বাঙালী মেয়েকে এত সময়-সচেতন হতে এর আগে দেখেনি সে। এইসময় একটি বেয়ারা এগিয়ে এল তার দিকে। সেলাম জানিয়ে বলল, 'মেমসাহেব আপকো কামরামে বোলায়া।'

'কামরামে? কোন সা কামরা?'

'ফিফটিন।' বেয়ারা তার কাজে চলে গেল।

অর্থাৎ ভদ্রমহিলা তাকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছেন এখানে অপেক্ষা করে। এবার যদি অরিন্দমের গরজ বেশি হয় সে স্তাবকের মত ও'র ঘরে দেখা করতে যেতে পারে। অরিন্দম লম্বা পা ফেলে হোটেলের বাইরে চলে এল। এখন অন্ধকার মশারির মত নেমে এসেছে গ্যাংটকের ওপর। আলো জ্বলছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। রাস্তার আলোগুলো এর মধ্যেই ভুতুড়ে হয়ে উঠেছে। শীতবস্ত্র থাকা সত্ত্বেও অরিন্দম ঠান্ডা টের পাচ্ছিল। বাজারের দিকে কিছুটা এগিয়ে এসে সে প্যাকেটটাকে ছুঁড়ে ফেলল এমন জায়গায় যেখানে সচরাচর মানুষজন যাবে না। রিভলভারটা গ্যাংটক ছাড়ার মুহূর্ত পর্যন্ত অন্য কারোর কাছে রাখা দরকার। বসন্তকে জড়িয়ে কোন লাভ নেই। বেচারা একেই খুব টেনশনে রয়েছে। অথচ এই বস্তুটিকে বিশ্বাস করে কাউকে দেওয়ার মত মুখ মনে পড়ছে না। অরিন্দম দাঁড়িয়েছিল অন্ধকার রাস্তায়। এখন রাতের অন্ধকারে শহরটা আলোর মালায় চমৎকার দেখাচ্ছে। এবং এইসময় সে কয়েকটি মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। দূরে আবছা যাদের দেখা যাচ্ছে তাদের প্রথম মানুষটি অবশ্যই বাংলায় কথা বলছে। যদি ওরা তার দলের লোকজন হয় তাহলে এখানে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে নিশ্চয়ই অবাক হবে। অরিন্দম চটপট সরে এল একটা গাছের আড়ালে। পায়ের তলায় বুনো ঘাস, মাথার ওপর পাখি ডেকে উঠল। লোকগুলো যখন অরিন্দমের সামনে দিয়ে যাচ্ছে তখন

অরিন্দম অনন্তকে চিনতে পারল। কোন একটা সমস্যা সমাধানের পথ বাতলাতে বাতলাতে হাঁটছে। অরিন্দম জানান দিল না। ওরা চলে যাওয়ার পর আড়াল ছাড়তে গিয়েই সে সতর্ক হল। আরও দুটো মানুষ যেন সন্তর্পণে নিচ থেকে উঠে আসছে। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে এরা আগের দলটাকে অনুসরণ করছে।

অন্ধকার লোক দুটোর চেহারা আড়াল করছিল। ওরা যখন একদম সামনে তখন সেবক ব্রিজের দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। এই লোক দুটোকেই কি মিলিটারিরা আটক করেছিল ? সম্ভবত এরাই সেই জোড়া গোয়েন্দা যারা মিস্টার সেনের গপ্পোটা বসন্তকে শুনিয়েছিল। ওরা এগিয়ে যেতে অরিন্দম এদের অনু-সরণ শুরু করল। অনন্তরা যাচ্ছে হোটেলের দিকে। অনন্তদের পেছনে জোড়া গোয়েন্দা। তারও পরে সে। অরিন্দম হেসে ফেলল তার পেছনেও কেউ আছে কিনা কে জানে !

বাঁক ঘুরতেই হোটেলের আলো দেখা গেল। সেখান থেকেই লোক দুটোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অরিন্দম বুঝল অনন্তরা ভেতরে ঢুকে গেছে। জোড়া গোয়েন্দা কি করবে বুঝতে পারছে না। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। শেষ পর্যন্ত একজন এগিয়ে গেল হোটেলের দিকে। দ্বিতীয়জন খানিকটা নার্ভাস হয়ে রাস্তার আলোর নিচে দাঁড়িয়ে এপাশ ওপাশ তাকাতে লাগল। এখন অরিন্দমের খুব ইচ্ছে করছিল লোকটার সঙ্গে কথা বলতে। এবং সেটা বেড়ে উঠতেই সে পা বাড়াল। এতক্ষণ পরে তার ওপর লোকটার নজর পড়েছে। বোধহয় বাংলা ছবি দ্যাখে না। কারণ চলচ্চিত্রের নায়ককে দেখলে যে প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত, তা হল না বরং বেশ ভীতু ভীতু চোখে তাকাল। অরিন্দম একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে হাসল, 'আরে আপনি ? ভাল আছেন ?'

লোকটি একদম ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। এবং সেই অবস্থায় দ্রুত মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, 'ঠাণ্ডার মধ্যে এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন ?'

লোকটির গলা পরিষ্কার হল না, 'ইয়ে মানে, একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'তাতো বুঝতেই পেরেছি। যাই বলুন আপনার এই গোয়েন্দার চাকরিটা খুব খারাপ।'

'খারাপ মানে ?' লোকটি হঠাৎ কথা খুঁজে পেল যেন, 'চূড়ান্ত খারাপ। ভদ্র-লোকের ছেলে এই কাজ করে ? নেহাত টাকাটা ভাল। কিন্তু আপনি কে ?'

'আমাকে চিনতে পারছেন না ?'

'আজ্ঞে না।'

'আমি কিন্তু আপনাকে চিনি। যা হোক, মিস্টার সেনের গপ্পোটা কেন বসন্তবাবুকে শোনালেন ? যাই বলুন, খুব কাঁচা মাথার গপ্পো। বোর্ডিং কার্ড দেওয়ার পর প্যাসেঞ্জারকে ফেলে কোন প্লেন এয়ারপোর্ট ছাড়ে ?' অরিন্দম মজা পাচ্ছিল কথা বলতে।

'হাজারবার বলেছিলাম পার্টনারকে, কিন্তু এর চেয়ে ভাল গল্প ও বানাতে পারল না যে।'

'বুঝলাম। কিন্তু এতদূর রাস্তা পাহাড় ভেঙে বরফ পেরিয়ে যাবেন, প্রিপারেশন কমপ্লিট ?'

'এখনও হয়নি। কিন্তু আপনি এতসব কথা জানতে পারলেন কি করে ?'

'পারি। আচ্ছা ধরুন মিস্টার সেনের ব্রিফকেস তাঁর কাছেই রয়েছে। তিনি একটা দামী জিনিস খামোকা তাঁর বন্ধুকে দিতে যাবেন কেন ? দুর্ঘটনা ঘটার পর তাঁর স্ত্রী অনুসন্ধানে যাবেন জেনে আপনাদের ব্রিফকেস খোঁজার নাম করে স্ত্রীর ওপর নজর রাখতে পাঠিয়েছেন তাহলে গপ্পোটা কেমন হবে ?'

'সত্যি বলুন তো আপনি কে ?'

'আমি অরিন্দম। সিনেমায় অভিনয় করি।'

'যাঃ। গুল মারবেন না।' লোকটা এতক্ষণে খিকখিকিয়ে হাসল।

'তার মানে', হতভম্ব হয়ে গেল অরিন্দম।

'ফিল্মস্টার গ্যাংটকের রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় নাকি ? আমার সঙ্গে কথা বলতে তাঁর বয়েই গেছে।'

'আচ্ছা। তিনি এখন কি করতে পারেন বলে আপনার ধারণা ?'

'আমার পার্টনারের সঙ্গে এখন কথা বলছেন ওই হোটেলে।'

অরিন্দম আর দাঁড়াল না। হঠাৎ তার মনে হল পৃথিবীর সমস্ত পরিচিত মানুষেরা যদি এখন থেকে তাকে অরিন্দম বলে চিনতে না পারে তাহলে অবস্থাটা কেমন হবে ? সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল তার। হোটেলে ঢুকেই ইউনিটের কয়েকজনকে অপেক্ষা করতে দেখল। তাকে দেখা মাত্র লোকগুলো এগিয়ে এল, 'দাদা, কথা আছে।'

'বল।' শব্দটা আলতো করে উচ্চারণ করল অরিন্দম।

'বসন্তদা ঠিক করেছেন আটজনের দল যাবে। আমরা তাহলে কি করব ?'

'বসন্তদা কি করতে বলেছেন ?'

'বলেছেন এখানেই অপেক্ষা করতে।'

'তাই করো। বিশ্রাম হবে।'

'একি বলছেন দাদা! আমরা এলাম জান লড়িয়ে ক্যান খুঁজব বলে, এরকম জানলে— ।'

'বসন্ত তোমাদের প্রত্যেককেই নিষেধ করেনি কলকাতায় ?'

'তা করেছেন। কিন্তু আপনি বলুন দাদা, ছবিটার জন্যে আমরা কত খেটেছি! এখন যদি ক্যান খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে স্পটে না থাকলে কি আমরা শেয়ার পাব ?'

অরিন্দম লোকগুলোকে দেখল। মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এইরকম ভঙ্গি। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'কে খুঁজে পাচ্ছে সেটা বড় কথা নয়। যদি পাওয়া যায় তাহলে হরিশবাবু সবাইকে শেয়ার দেবেন।'

যেন কথাগুলো বিশ্বাস করতে ওদের অসুবিধে হচ্ছে কিন্তু মুখের ওপর কিছু বলার ছিল না। অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা একা ? অনন্ত কোথায় ?'

'অনন্তদা ওপরে গিয়েছেন এ ব্যাপারে কথা বলতে। ও'র নামও লিস্টে নেই।' লোকটাকে আবার উত্তেজিত দেখাল, 'অথচ জানেন, ওই ঠক্কর না ফোক্কর, ওর নাম আছে।'

এইসময় ওপর থেকে দুটো বেয়ারা একটি লোককে প্রায় জোর করে ধরে নামিয়ে আনছিল। লোকটা ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছে নিজেকে, 'আঃ কি হচ্ছে কি! ছাড় না মাইরি! মেমসাহেব বের করে দিতে বলেছেন, তাই বলে কি এইভাবে ধরতে বলেছেন ?'

অরিন্দম চট করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একটু ঘুরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। জোড়া গোয়েন্দার প্রথমটির মুখোমুখি হওয়ার বিন্দুমাত্র বাসনা তার নেই। লোকটা তখন রিসেপশনের সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে, 'আই হ্যাভ আইডেন্টিটি কার্ড। কল পুলিশ। আমি নক করতেই উনি কাম ইন বলায় ভেতরে ঢুকেছিলাম। নো নো, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু হিয়ার এনিথিং। কল পুলিশ।'

হরিশ মল্লিকের ঘরের দরজা খোলাই ছিল। অরিন্দম সেখানে পেঁছিতেই বসন্ত যেন স্বস্তির গলায় বলে উঠল, 'আসুন দাদা। আপনি হোটেলে নেই অথচ ফোনে তখন বললেন না যে কোথাও বের হচ্ছেন, খুব চিন্তা হচ্ছিল।'

কথা না বলে অরিন্দম তার পেটেণ্ট হাসিটা হাসল। সে দেখল হরিশ বিছানায় বসে রয়েছে। সামনের সোফায় বসন্ত, সহদেব সেন এবং কল্পনা। এই মেয়েটির কথা তার মাথাতেই ছিল না। শাড়ির ওপরে শাল জড়িয়ে বসে তাকে লক্ষ্য করছে। অরিন্দম গুরুত্ব না দিয়ে পঞ্চম ব্যক্তিকে দেখল। প্রোডাকসন ম্যানেজার অনন্ত বিষণ্ণ মুখে ওপাশের চেয়ারে বসেছিল। এবার তাকে দেখামাত্র উঠে দাঁড়াল। অরিন্দম তাকে ইশারায় বসতে বলে হরিশ মল্লিকের খাটের কাছে এসে দাঁড়াল, 'বসতে পারি?'

অনন্ত বলল, 'আপনি এখানে বসুন দাদা।'

অরিন্দম মাথা নাড়ল, 'বরানগরের ছেলে ভাই, বিছানায় বসতেই বেশি আরাম পাই।' হরিশ মল্লিক একটু সরে বসতেই অরিন্দম আরাম করে বসতে গিয়ে থাই-তে খোঁচা খেল। পা ঝুলিয়ে বসায় রিভলভারটায় টান পড়েছে। সে সতর্ক হবার চেষ্টা করেও সামলে নিল। ওখানে হাত দিলেই কারোর না কারো নজর পড়বেই। অরিন্দম বলল 'সমস্যাটা কি?'

বসন্ত বলল, 'আমরা আটজনের দল করেছি। এই যে লিস্ট।' সে একটা কাগজ এগিয়ে দিল। অরিন্দম লিস্টটা দেখল। প্রথমেই তার নাম। তারপর বসন্ত, সহদেব সেন, ঠক্কর, ক্যামেরাম্যান বিক্রম সেন, কল্পনা এবং দুজন পোর্টার। প্রযোজক হরিশ মল্লিকের নামও এই লিস্টে নেই। সে মুখ তুলে হরিশ মল্লিকের দিকে তাকাতেই হরিশ বলল, 'আমিই বসন্তকে বলেছি বাদ দিতে।' বসন্ত বলল, 'এই শরীর নিয়ে দাদার পক্ষে হাঁটা সম্ভব নয়। লোকাল ডাক্তার তাই বলল।'

স্বস্তি পেল অরন্দিম। সে লিস্টটা ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মালপত্র তো অনেক হবে সহদেববাবু, মাত্র দুজন পোর্টার নিচ্ছেন কেন?'

সহদেব বলল, 'এখান থেকে তো সবাই জিপে যাচ্ছি। চুং থাং-এর আগে একটি গ্রামে আমাদের পোর্টার দ্বজনের বাড়ি। ওরা বলেছে ওখান থেকেই বাকিদের নেবে। ওরা পাহাড়টাকে ভাল জানবে। শহর থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না।'

অরিন্দম অনন্তর দিকে তাকাল, 'তাহলে কোন সমস্যা নেই আর, কি বল ?'

অনন্ত মাথা নাড়ল, 'আছে। দলের সবাই যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছিল। প্রত্যেকেই খ্বব ক্ষেপে গেছে। নিজেদের বঞ্চিত বলে ভাবছে সবাই।'

সহদেব বলল, 'আপনাকে তো এতক্ষণ ব্বঝিয়ে বললাম।'

'আপনি চুপ কর্বন। আপনি ফিল্মের লোক নন, এসব ব্বঝবেন না।' অনন্ত ম্বখ ফেরাল।

অরিন্দম বলল, 'তোমার সঙ্গে যারা এসেছে, তাদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

অনন্ত ম্বখ তুলল, 'সবাই বলছে অত ওপরে স্যুটিং করতে পারলাম আর এখন বাদ পড়ছি কেন ? কল্পনাদি মেয়েছেলে হয়ে যেতে পারছে যখন, তখন তারা কি দোষ করল ?'

কল্পনা এবার কথা বলল, 'আমার যাওয়া নিয়ে যদি আপত্তি থাকে তাহলে আমার জায়গায় আপনাদের যে কোন একজন যেতে পারে।'

অনন্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমি সেকথা বলিনি।'

এবার হরিশ মল্লিক ম্বখ খ্বলল, 'অনন্ত। তুমি সবাইকে ব্বঝিয়ে বল এ ব্যাপারে দলনেতা যা বলবেন তাই মেনে নিতে হবে। ফেল্লারে যেমন ডিরেক্টরের কথাই শেষ কথা, এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হবার কারণ নেই। যদি কারো এটা মানতে ইচ্ছে না করে তাহলে সে স্বচ্ছন্দে কলকাতায় ফিরে যেতে পারে।'

অনন্ত ম্বখ নিচু করল। বসন্ত সেটা লক্ষ্য করল। এইসব প্রোডাকশন ম্যানেজাররাই পরোক্ষভাবে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি কণ্ট্রোল করে থাকেন। এঁরা ইচ্ছে করলে, কম খরচে একটা ছবির কাজ স্বচার্বভাবে শেষ করতে পারেন, বিগড়ে গেলে উল্টোটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। নামী প্রোডাকশন ম্যানেজারের কথার ওপর নির্ভর করে অনেক সময় প্রযোজকরা পরিচালক নিয়োগ করেন। বসন্ত সহদেবকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি বলেছিলে একটা বেস ক্যাম্পের কথা। সেখানে আমাদের কিছ্ব লোকজন অপেক্ষা করবে জিনিসপত্র নিয়ে। পাহাড়ে যদি আমাদের কেউ আহত হয় তাহলে বেস ক্যাম্পে পেঁছে দিলে এরা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। সেটার কি হল ?'

সহদেব মাথা নাড়ল, ‘আমি ভেবেছিলাম আটজনের যে কোন দুজন বেস ক্যাম্পে থেকে যাবে। ইনফ্যাক্ট, জিপ যে জায়গায় শেষ পর্যন্ত যেতে পারছে, সেখানেই ক্যাম্পটা করা দরকার।’

অনন্ত এবার উৎসাহী হল, ‘জিপ যদি পেঁছতে পারে তাহলে আমার যেতে আপত্তি কোথায়? আমি তো জিপে বসেই যাব। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি, আপনাদের কোন চিন্তা করতে হবে না। আমি চারজন সুস্থ টেকনিসিয়ানকে বেছে নিচ্ছি। বেস ক্যাম্পে গিয়ে থাকছি জানলেও ওরা খুশি হবে। কি, এই ব্যাপারে আপনাদের আপত্তি আছে?’

অরিন্দম বলল, ‘না। আমি তো আপত্তির কিছু দেখছি না। গ্যাংটকে থাকলে আরামে থাকতে পারতে, ওরকম জায়গায় পাঁচজন থাকলে দলের খরচ কম হবে।’

কথাটা কানে যাওয়া মাত্র বসন্ত বলল, ‘ওহো দাদা, আপনার কাছ থেকে কলকাতায় যেটা নিয়েছিলাম সেটা হরিশদা ফেরত দিতে বলেছেন। এই নিন।’

অরিন্দম দেখল বসন্ত তার সাইডব্যাগ থেকে একটা মোটা প্যাকেট বের করে সামনে রাখল। টাকা ফেরত পেতে কার না ভাল লাগে। সে প্যাকেটটা তুলে নিয়ে পাশে রেখে হাসল, ‘চমৎকার সময়ে এটা ফেরত দিলে। পথে একটা ভাল বার পর্যন্ত পাব না যে টাকাটা খরচ করব। আর বরফে যদি চাপা পড়ি তো হয়ে গেল। যাক, সহদেববাবু, আপনার প্রিপারেশন কমপ্লিট?’

‘হ্যাঁ। বসন্ত চেয়েছিল আর একটা দিন এখানে অপেক্ষা করতে। কিন্তু যে কাজ বাকি আছে তা আমরা চুং থাং-এই সারতে পারব। এই অবস্থায় আমি ওকে বলেছি আগামীকাল ব্রেকফাস্টের পর রওনা হতে।’ সহদেব জানল।

অরিন্দম বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল, ‘ওয়েল। আমি কাল সকালে তৈরি থাকব। এবার আসতে পারি?’ ব্যাপারটা এমন আচমকা ঘোষণা করল অরিন্দম যে, কেউ কিছু কথা বলল না। অরিন্দম ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। তার একটু আগে মনে হয়েছিল যে ঘটনাগুলো পাশাপাশি ঘটছে সেগুলো সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করে দেওয়া দরকার। কিন্তু চিন্তাটা বাতিল করেছিল সে চটজলদি। আর যাই হোক, এই ঘটনাগুলো হরিশ মল্লিক প্রোডাকসন্সের ক্যান খুঁজে আনতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না যখন, তখন সবাইকে জানিয়ে অনাবশ্যক নার্ভাস করে লাভ কি!’

দুজন টিবেটিয়ান পোশাক-পরা ভদ্রলোক করিডোর দিয়ে চলে গেলেন। ওঁদের দৃষ্টির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হল না।

এইরকম সময়ে খুব মেজাজ খারাপ হয়ে যায় অরিন্দমের। বাংলা ভাষায় কথা বলা অভিনেতার প্রচার যে কত কম তা ভাবতে ভাল লাগে না। আর তখনই একজন বিখ্যাত লেখকের কথা মনে পড়ল তার। আজকের সাহিত্যে তাঁর মত জনপ্রিয় লেখক খুবই কম আছেন। ভদ্রলোক আকাদেমি পেয়েছেন, ছবি হচ্ছে, পাঠক পাঠিকারা তাঁর সম্পর্কে খুব ক্রেজি। তিনি বলেছিলেন, 'টিভি কিংবা ফিল্মে একবার মুখ দেখালেই লোকে রাস্তায় দেখতে পেলে চিনতে পারে। পঞ্চাশটা উপন্যাসের দশটা করে সংস্করণ হওয়া সত্ত্বেও আমাকে কেউ চেনে না মশাই। অথচ একজন অভিনেতা তা তিনি যতই বড় মাপের হোক না কেন, একজন ক্ষমতাবান লেখক অনেক বেশি বছর পাঠকের কাছে বেঁচে থাকেন। তবু তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি আপনারাই পেয়ে যান।'

ঘণ্টা! অরিন্দম হেসে উঠল। যতক্ষণ তুমি পরিচিত দর্শকমণ্ডলীকে কিছু দিয়ে যেতে পারছ, ততক্ষণই তোমরা তাকে মনে রাখবে। রবীন মজুমদারের মত জনপ্রিয় নায়ককে একসময় রিকশায় চেপে বিশ্বরূপা থিয়েটারে নাটক করতে যেতে হত! শেষ বয়সের সেই প্রতিভাবান অভিনেতাকে দেখে কজন মানুষ চোখ তুলত?

প্যাকেটটা নিয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল অরিন্দম। এটাকে সঙ্গে বয়ে বেড়ানোর কোন মানে হয় না! গ্যাংটকেই কারো কাছে রেখে গেলে হয়। হোটেলে লকার আছে? কাল সকালে খোঁজ নিতে হবে। অরিন্দম দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই স্থির হল। কেউ ঢুকেছিল তার ঘরে। সুটকেশ এখন যেখানে, সেখানে যাওয়ার সময় ছিল না। বিছানার চাদর যেভাবে ঝুলছে তা সে দেখে যায়নি। দরজা বন্ধ করে সে টয়লেটের দিকে এগিয়ে গেল। সন্তর্পণে দরজা খুলে আলো জ্বালল। কেউ নেই। কিন্তু—! অরিন্দম সুটকেশের সামনে ফিরে এল। তালা খোলা। অর্থাৎ যিনি এটিকে খুলেছেন তিনি আর লাগাবার সময় পাননি অথবা চেষ্টা করেননি। লকটা এখনও ঠিক রয়েছে। সে সুটকেস খুলে ভেতরের জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড অবস্থায় দেখল। কেউ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে জামাকাপড়। এমনকি তার চামড়ার হ্যাণ্ড

ব্যাগটাও বাদ যায়নি। ওটার ভেতর দরকারি কাগজপত্র, পাশপোর্ট, টাকাপয়সা সবসময় থাকে। সঙ্গে যে টাকা সে এনেছিল তা থেকে রিভলভারের দাম মিটিয়ে দেবার পরেও তিন হাজার টাকা এখানে ছিল। টাকাগুলো নেই। অরিন্দম চেয়ারে গিয়ে বসল। কি খুঁজতে এসেছিল লোকটা? এবং তখনই রিভলভারটার কথা মনে পড়ল। আগন্তুক কি এটির সন্ধানেই এসেছিল? জানল কি করে? এখানে বসে অনুমান করার কোন মানে হয় না। ব্যাপারটা এখনই হোটেলের ম্যানেজার এবং পুলিশকে জানানো দরকার। এত বড় হোটেলে উঠে সে অন্তত কিছুটা নিরাপত্তা আশা করতে পারে। টাকার প্যাকেটটা ওয়ার্ডরোবে ফেলে রাখতে একটু দ্বিধা করল না। হতাশ আগন্তুক নিশ্চয়ই দ্বিতীয়বার ফিরে আসবে না। কিন্তু তারপরেই মত পাল্টালো। খবর পাওয়ার পর পুলিশ কিংবা হোটেল কর্তৃপক্ষ যদি তদন্ত করতে ঘরে ঢোকে, এবং সেটাই স্বাভাবিক, তাহলে এত টাকা ওভাবে পড়ে আছে দেখলে তাদের ভাল লাগার কথা নয়। প্যাকেটটা তুলে নিয়ে সে আবার ঘরের বাইরে চলে এল। চাবি দেখে নিয়ে দরজা বন্ধ করে উল্টোদিকে হাঁটতে গিয়ে তার চোখ একটা দরজার ওপর আটকে গেল। ফিফটিন। রুপোলি ইংরেজি অক্ষর দুটো দরজার গায়ে আটকানো।

বেয়ারার কাছে খবর রেখে মেমসাহেব এখানে অপেক্ষা করছেন। ঠোঁট, চাহনি, দাঁড়াবার ভঙ্গি মনে পড়তেই শরীরে ঝিমঝিমে অনুভূতি ফিরে এল। ম্যানেজার কিংবা পুলিশ না এই পনের নম্বর ঘর, কোনটা আগে সারবে স্থির করতে পারছিল না অরিন্দম। তারপরেই সে হুঁশ ফিরে পেল। তার মতো একজন খ্যাতিমান অভিজ্ঞ অভিনেতা একটি সুন্দরী মহিলার আকর্ষণের কাছে আত্মসমর্পণ করবে? সে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই পনের নম্বর ঘরের দরজা খুলে গেল। অরিন্দমের দুটো পা তখন বরফ। দরজায় যে টিবেটিয়ান দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর পেছনে আলোর ঝরনা। ফলে রহস্যময়ী বলে মনে হচ্ছে তাঁকে। এবং তখনই শব্দ বাজল, 'ওঃ, আপনি! আরে, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? আসুন।' ডান হাত ঈষৎ নড়ল। এবং প্রতিক্রিয়ার জন্যে অপেক্ষা না করে ভদ্রমহিলা ঘরের ভেতরে চলে গেলেন। অর্থাৎ জানেন অরিন্দম আসবেই।

সন্ধ্যেবেলায় দেখা লবিতে বসে থাকা সুন্দরীর সঙ্গে এই মহিলার মিল গলার স্বরে। কিন্তু যে পোশাকই ওঁর অঙ্গে ওঠে সেই পোশাকই সুন্দর হয়ে ওঠে। অরিন্দমের মনে হল, তার ঘরে যে আগন্তুক ঢুকেছিল তার খবরাখবর এই মহিলা রাখেন কিনা! না হলে সে যে এই মুহূর্তে দরজার বাইরে থমকে দাঁড়িয়েছে তা

বন্ধ ঘরে বসে মহিলা টের পেলেন কি করে ? কেউ কি তার ওপর সবসময় নজর রাখছে ? এবং সেই খবর মহিলা পেয়ে যাচ্ছেন ? এবার এক ধরনের জেদ তীব্রতর হল । ওপাশে মানুষের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে । অরিন্দম বুঝল বসন্তরা আলোচনা শেষ করে ফিরে যাচ্ছে । ওদের যেতে হবে এই পথেই । অতএব এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে । সে দ্রুত পা চালালো ।

একই ধরনের ঘর । সুন্দরী নেই । অরিন্দম দরজা টেনে দিতেই টেলিফোন বাজল । সঙ্গে সঙ্গে টয়লেটের দরজা খুলে গেল । হাঁসের মতন স্বচ্ছন্দে সুন্দরী এগিয়ে গেলেন টেলিফোনের দিকে । তারপর অরিন্দমের দিকে পেছন ফিরে রিসিভার কানের কাছে তুললেন । যে কথা বলছে ওপাশে সে সম্ভবত কিছু শুনতে চায় না । সেকেন্ড তিরিশেক তাকে কথা বলতে দিয়ে সুন্দরী বসলেন, 'থ্যাংকস । আধ ঘণ্টা পরে করো ।' রিসিভার নামিয়ে রেখে স্প্রিং-এর মত শরীরটাকে ঘুরিয়ে সুন্দরী বললেন, 'সময় রাখতে সবাই পারে না । আমি মেনে নিয়েছি । তবে আপনাকে আরও আগে এখানে আশা করেছিলাম । বলুন কি খাবেন ?' ঠিক বিপরীত দিকের সোফায় বসে তিনি অরিন্দমকে বসতে ইঙ্গিত করলেন । অরিন্দম বসল । তারপর বলল, 'দুঃখিত ।'

'না না । ফিল্মের নায়কদের কখনই এমন সংলাপ বলা উচিত নয় । আচ্ছা, আমাকে দেখে আপনার কেমন লাগছে ? ফিল্মে নামলে কিছু হতো ?' মুক্তোর মত দাঁত লাল ঠোঁটে ঈষৎ ঝিলিক রেখে গেল ।

অরিন্দম সোজা হল, 'মিসেস সেন । স্বীকার করছি সব লাইনেই আপনি সফল হতেন ।'

সুন্দরী আচমকা স্থির হয়ে গেলেন । তাঁর চোখ স্থির হল । হঠাৎ হাসিতে ভেঙে পড়লেন তিনি তার পরেই । অরিন্দমের মনে হল সে যেন কোন ঝরনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে । হাতের উল্টো দিক দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে এক ঝটকায় কাঁধ ছোঁওয়া চুলের রাশি পেছনে ঠেলে দিয়ে মিসেস সেন বললেন, 'আপনি বড্ড বেশি ঝুঁকি নিচ্ছেন । আমার ব্যাপারে কেউ নাক গলালে আমিও স্থির থাকতে পারি না । আপনার বসতেও দেখছি খুব অসুবিধে হচ্ছে ? রিভলভারটা কাছে রেখেছেন কিন্তু ওটা বে-আইনী এটাও তো জানেন ! আচ্ছা ,এক কাজ করা যাক, ওটা আমার কাছেই রেখে যান ।'

অরিন্দম উঠে দাঁড়াল, 'মাপ করবেন । আপনি কতটা যোগ্য তা না জানার আগে রেখে যাই কি করে ! আপনাকে ধন্যবাদ । নইলে আজ রাত্রে থানা পুলিশ

করতে হত।' কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অরিন্দম ঘর ছেড়ে বেরিয়ে দ্রুত নিচে নেমে এল। তখনও রিসেপশনের সামনে বসন্তরা কথা বলছে। অরিন্দম কাছে গিয়ে কল্পনাকে ডাকল, 'শোন, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।' কল্পনা অবাক। ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার সঙ্গে ?'

কল্পনার চোখে বিস্ময়-সন্দেহে গোলা একটা বিচিত্র দৃষ্টি। অরিন্দম সেটা দেখেও দেখল না। বসন্তরাও হঠাৎ এইভাবে অরিন্দমের নেমে আসায় অবাক হয়েছিল। কিন্তু অরিন্দম নিচু গলায় আবার কল্পনাকে বলল, 'আমি তোমার সাহায্য-প্রার্থী। একটু উপকার করবে ?'

কল্পনা বেশ ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'আমি ? আমি করব আপনার উপকার ?'

'হ্যাঁ। শোন,' অরিন্দম চারপাশে তাকাল, 'তুমি বরং আমার ঘরে এসো একবার।'

হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল কল্পনা, 'মাপ করবেন, আমি নীতা নই।'

'মানে ?' অরিন্দমের চোখ স্থির হয়ে গেল।

'এত রাত্রে একা আমাকে আপনার ঘরে যেতে বলছেন। ফিল্মের মেয়েরা আপনার ইচ্ছের সঙ্গে তাল মেলাতে পারে কিন্তু আমার রুচি এবং শিক্ষা যে অন্য-রকম তা আপনার এতদিনে বোঝা উচিত ছিল।'

রাগ করতে পারত অরিন্দম। তেমন হলে তাকে ঠান্ডা করতে বসন্তরা যাদব-পুরে পড়া এই শখের নায়িকাকে আগামীকালই কলকাতায় ফেরত পাঠাতে দ্বিধা করবে না। কিন্তু রাগের বদলে কণ্ঠটা ছিটকে এল। তার সম্পর্কে প্রচারিত গল্প-গুলো দিন দিন এমন শক্তিশালী হয়ে উঠছে, মাঝে মাঝে নিজের কাছেই গোলমেলে হয়ে যায় সব। কয়েকজন সুন্দরী মহিলার সঙ্গ পুরুষ হিসেবে সে গ্রহণ করেছে ঠিক, কিন্তু গল্পগুলো তাকে যে নারী-খাদক করে তুলেছে তা কল্পনার কথার মধ্যে স্পষ্টতর হল।

সে বলল, 'তুমি আমাকে ভুল বুঝলে কল্পনা। ছবিটার স্যুটিং-এর সময় আমার কাছে কি খারাপ ব্যবহার পেয়েছো ?'

'না। কারণ তখন নীতা ছিল। সিংহের খিদে মিটে গেলে আর শিকার করে না।' কল্পনা মুখ ফেরাল।

এবার চোয়াল শক্ত হল অরিন্দমের। সে হঠাৎ গলা তুলে ডাকল, 'বসন্ত !'

'বলুন দাদা !' বসন্ত এগিয়ে এল।

'এই মেয়েটিকে নিয়ে আমার ঘরে তুমি এসো।' কারো কোন প্রতিক্রিয়া দেখার

জন্যে অপেক্ষা না করে অরিন্দম নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। টাকার প্যাকেটটার মধ্যে ও রিভলভার ঢুকিয়ে সেটাকে ভদ্র চেহারা দিতে চলে এল টয়লেটে। শরীরে একটা ক্রোধ, ঘেন্না এবং অসহায়বোধ পাক খাচ্ছিল। হিসেব করলে কল্পনা তার থেকে অন্তত কুড়ি বছরের ছোট। কিন্তু নারী, যে কোন বয়সের নারী যদি তাকে খাদক ভাবে তাহলে— ! বেসিনের আয়নায় নিজের মুখ দেখল অরিন্দম। ক্যামেরা নাকি মিথ্যে কথা বলে না। কিন্তু এ কথাটাও মাঝে মাঝে অসত্য হয়ে যায়। তার চোখের নিচে যে ভাঁজ ইদানিং মাথা তুলছে তা ক্যামেরায় স্পষ্ট হচ্ছে না। হয়তো মেকআপ-ম্যানের কৃতিত্ব থাকছে। কিন্তু বয়স যে হচ্ছেই তা অস্বীকার করবে কে ? তোয়ালে মুখে ঘষল অরিন্দম। এবং এতক্ষণে খেয়াল হল জল কতটা কনকনে। চামড়া ভেদ করে ঠান্ডাটা মুখের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। উত্তেজনাটাকে ধীরে ধীরে প্রশমিত করল সে। কিছু না করতেই তার সম্পর্কে গত দশ বছরে অনেক গল্প পল্লবিত হয়েছে। করার ঘটনাগুলোর সংখ্যা তার তুলনায় কিছুই নয়। তবু তো সে করে খাচ্ছে। মুখের ওপর কেউ এসে বলছে না আপনি এই, আপনি ওই। খামোকা উত্তেজিত হয়ে লাভ কি।

দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই ওদের দেখতে পেল অরিন্দম। কোনরকম ভূমিকা না করেই বলল, 'বসন্ত, আজ একটু আগে আমার ঘরে একজন না জানিয়ে ঢুকেছিল। ওই স্যুটকেস, বিছানা সে খুঁজেছে এলোমেলো করে। জানি না কেন আমার গতিবিধির ওপরও নজর রাখা হচ্ছে।'

বসন্ত চমকে উঠল, 'সেকি ! কেন ?'

'আমার কাছে এমন কিছু আছে যা থাকাটা ওদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়।'

'কি জিনিস ?' বসন্ত কল্পনার দিকে তাকাল একবার, 'আর এই ওরা কারা ?'

'আমি জানি না। কিন্তু আমি পুলিশকে জানাইনি। জানিয়ে এই মুহূর্তে কোন লাভ হবে না।' অরিন্দম কথাগুলো বলতে বলতে লক্ষ্য করল কল্পনার নজর ঘরের বিভিন্ন জিনিসের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে আর একটু যোগ করল, 'আমার কথায় বিশ্বাস না এলে তোমরা স্যুটকেস খুলে দেখতে পার।'

বসন্তর প্রতিক্রিয়া হল তৎক্ষণাৎ, 'এ আপনি কি বলছেন দাদা !'

'আমরা একসঙ্গে এমন জায়গায় চলেছি যেখানে পরস্পরের সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজন। সিংহের পা থেকে কাঁটা বের করে দিয়ে তাকে স্বস্তি দিয়েছিল বলেই লোকটিকে কিন্তু এরিনায় পেয়েও সিংহ বধ করেনি। অর্থাৎ সাপ কিংবা হায়েনার চেয়ে সিংহ অনেক বেশি কৃতজ্ঞ। কল্পনা, তুমি বললে সিংহের খিদে মিটে গেলে

আর শিকার করে না। ঠিক কথা। কিন্তু হাজার খিদে পেলেও সিংহ মেঠো ইঁদুরের পেছনে ধাওয়া করে না। আমি তোমাকে এই ঘরে আসতে বলেছিলাম কারণ তোমার কাছে আমি সাহায্য চাইতাম যা প্রকাশ্যে বলা যেত না।' অরিন্দম মাথা নাড়ল। তারপর খাটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'তোমরা যেতে পার।'

বসন্ত একটু দ্বিধা নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপারটা যদি একটু খুলে বলেন!'

খাটে বসে প্যাকেটটাকে তুলে ধরে অরিন্দম বলল, 'এই বস্তুটিকে আমি আজ রাত্রে নিজের কাছে রাখতে চাই না। তোমার কাছেও নয়।'

'ওটা তো হরিশদা আপনাকে তখন দিলেন।' বসন্ত যেন চিনতে পারল।

অরিন্দম বলল, 'চটপট দরজাটা ঠেলে দ্যাখো তো বাইরে কেউ আছে কিনা।'

বসন্তর প্রথমে বুঝতে সময় লাগল, তারপর দ্রুত দরজা ঠেলে বাইরে তাকিয়ে বলল, 'না তো, কেউ নেই।'

এই সময় কল্পনা শব্দ করে হেসে উঠল। বসন্ত বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'হাসির কি আছে?'

কল্পনা গম্ভীর হবার চেষ্টা করল, 'না, মানে, আমার গান্স অফ নভরনের একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়ল।'

অত্যন্ত বিরক্ত হল অরিন্দম। হাত নেড়ে বলল, 'ওকে নিয়ে যাও বসন্ত।'

মিনিট দশেক খাটে চুপচাপ শুয়ে রইল সে। কল্পনার ব্যাপারটা এখন আর তার মাথায় নেই। যদি কেউ তার ওপর নজর না রাখে তবে মিসেস সেন রিভলভারটা সঙ্গে আছে জানতে পারলেন কি করে। সে ঘরের চারপাশে তাকাল। তাকিয়ে হেসে ফেলল। জেমসবন্ডীয় ছবির তৎপরতা কি করে আশা করছে? হয়তো ঘরে পাওয়া যায়নি বলেই সঙ্গে আছে ভেবে নিয়েছেন উনি। আর তার অর্থ যে এসেছিল সে মিসেস সেনের লোক। কিন্তু তার কাছে একটা রিভলভার থাকলে ওঁর ভয় হবে কেন? অরিন্দম উঠল। প্যাকেটটাকে সঙ্গে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এ-পাশ ও-পাশ তাকাল। রাত হয়েছে। কেউ নেই করিডোরে। পনের নম্বর ঘরের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। তারপর ধীরে ধীরে নক করল। ভেতর থেকে কোন শব্দ ভেসে এল না। অরিন্দম চারপাশে তাকাল। তারপর হাতল ঘোরাল। দরজাটা বন্ধ। আর একবার শব্দ করল সে। এত তাড়াতাড়ি ভদ্রমহিলা ঘুমিয়ে পড়তে পারেন না। অরিন্দম ধীরে ধীরে সিঁড়ির দিকে এগোতেই সিলিন্ডার দুটো দেখতে পেল। হোটেলে আগুন লাগলে ওগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা পাশেই লেখা

রয়েছে। চট করে মতলবটা মাথায় এসে গেল। চারপাশে এই মুহূর্তে কেউ নেই। সে প্যাকেটটাকে সিলিন্ডারের পেছনের খাঁজে ঢুকিয়ে দিয়েই হাঁটা শুরু করল। বাঁক নেওয়ার আগে আড়চোখে দেখে নিল ওটার অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে না। লবিতে কেউ নেই। সে রিসেপশনে এসে দেখল লোকটি তল্পি-তল্পা গোটাচ্ছে। গ্যাংটকের হোটেলের রিসেপশনিস্ট নাইট ডিউটি করে না। লোকটা অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'ইয়েস স্যার?'

'হ্যাঁ। বেয়ারা আমাকে বলেছিল পনের নম্বরের ভদ্রমহিলা আমাকে দেখা করতে বলেছেন। ওঁর ঘরের দরজা বন্ধ। এত তাড়াতাড়ি কি উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন?' অরিন্দম সরল গলায় জিজ্ঞাসা করল।

দ্রুত মাথা নাড়ল রিসেপশনিস্ট, 'না স্যার। উনি খানিক আগে বেরিয়েছেন। ইন ফ্যাক্ট আজ রাত্রে এক বন্ধুর বাড়িতে থাকবেন। উনি কাল ফিরে এলে আপনার কথা বলব।'

রাত্রের খাওয়া অল্পে সেরে নিয়ে বিছানায় গেল অরিন্দম। সিঁড়ি দিয়ে নামা ওঠার সময় বারংবার তার চোখ গেছে সিলিন্ডারের ওপরে। প্যাকেটটা সেখানে ঠিকঠাক আছে কিনা জানতে খুব কৌতূহল হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি দেখে ফেলে সে ওই বিদঘুটে জায়গায় হাত বাড়াচ্ছে তাহলে কেলেঙ্কারি হবে। তবে এত রাত্রে হোটেলে আগুন না লাগলে কেউ ওটাকে আবিষ্কার করতে যাবে না এইটুকু আশা করা যায়। কম্বলের তলায় তার বেশ আরাম লাগছিল। চোখ বন্ধ করতেই মিসেস সেনের মুখ মনে পড়ল। সে এই ভদ্রমহিলাকে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। যে পাহাড়ী শহরে তিনি থাকতেন সেখানে তাঁর প্রচুর চেনাশোনা থাকতে পারে কিন্তু একজন বাঙালী সুন্দরী কি করে যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই দাপটে থাকছেন? গ্যাংটকের মত শহরে এত রাত্রে যখন ঠাণ্ডায় একটা কুকুরও পথে বের হচ্ছে না তখন তিনি আচমকা বন্ধু খুঁজে পেয়ে তার বাড়িতে চলে গেলেন? ব্যাপারটা কিছুতেই বিশ্বাসের আওতায় আসছে না। তাছাড়া সেই লোকটা যাকে তিনি বলেছিলেন ব্রিফকেস না পেলে কোন আশা নেই, তাকেও তো এখন ওঁর ধারেকাছে দেখা যাচ্ছে না।

দরজায় শব্দ হতে ঘুম ভাঙল অরিন্দমের। হালকা নীল আলোয় ঘরটিকে স্বপ্নের মত লাগছিল। শব্দটা আবার কানে আসতেই ধড়মড়িয়ে উঠল। এবং তখনই তার নজর গেল ঘড়ির দিকে। সাড়ে এগার। এত রাত্রে কে আসতে পারে? কম্বলের তলা থেকে বেরুতেই রুম হিটার থাকা সত্ত্বেও যেন অস্বস্তি হল। সে চাদরটা টেনে

নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই অবাক হয়ে গেল।

সেই রিসেপশনিস্ট ছোকরা সামনে দাঁড়িয়ে। তার পাশে যিনি তিনি সম্ভবত এই হোটেলের কর্তৃপক্ষের কেউ একজন। রিসেপশনিস্ট বলল, 'সরি টু ডিস্টার্ব ইউ স্যার। কিন্তু আপনাকে আইডেণ্টিফাই করার জন্যে আমাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে।' তারপর পেছনের লোকগুলোর দিকে ঘুরে জানাল, 'ইয়েস। হি ইজ দ্য ম্যান।'

পেছনের দলটা থেকে একজন ভারী চেহারার অফিসার এগিয়ে এলেন, 'আপনি মিস্টার অরিন্দম?'

শব্দ উচ্চারণ না করে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে।

অফিসার বললেন, 'আমাদের কাছে ডেফিনিট ইনফরমেশন এসেছে যে আপনি আপনার কাছে কিছু বেআইনী জিনিস রেখেছেন। আশা করি বুঝতে পারছেন, আমি কি বলতে চাইছি?' অরিন্দম আবার নীরবে মাথা নাড়ল। অফিসার ঠোঁট কামড়ালেন। তাঁর মুখ খুব অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছিল। এই ঠাণ্ডার মধ্যে এত রাত্রে তাঁর কাজে বেরুতে নিশ্চয়ই ভাল লাগেনি। খুব গম্ভীর গলায় তিনি জানালেন, 'দেন উই আর গোয়িং টু সার্চ—।' বলে নিজের দলকে ইঙ্গিত করলেন অনুসরণ করতে।

মিনিট পনের ধরে ওরা তন্ন তন্ন করে ঘরটাকে যাচাই করল। সোফায় বসে ওদের কাজকর্ম দেখতে দেখতে অরিন্দমের মনে হল যেন কোন খ্যাপা ষাঁড় সাজানো বাগানে ঢুকে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত তাকে উঠিয়ে ওরা সোফাটাকেও ভাল করে দেখল। শেষ পর্যন্ত সিগারেট ধরিয়ে অফিসার তার সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'কোথায় রেখেছেন? শুনেছি আপনি একজন বেঙ্গলের নাম-করা ফিল্ম-স্টার। আপনি কনফেস করুন।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না। ইন ফ্যাক্ট এত রাত্রে আমাকে বিছানা থেকে তুলে আপনারা যে কাণ্ড করলেন তার জন্যে আমি আইনের সাহায্য নেব।' অরিন্দম বলল।

অফিসার স্থির চোখে তাকালেন, 'জঙ্ বাহাদুর বলে কোন লোককে চেনেন?'

'নো, নেভার। আমি নামই শুনিনি।'

'আই সি। আপনি আজ বিকেলে একটা রিভলভার কেনেননি?'

'আমি? রিভলভার? কি যা তা বলছেন?'

'আপনি আজ বিকেলে বাজারের নিচে একটা কিউরিও শপে যাননি?'

'গিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা কিউরিও শপ, রিভলভারের দোকান নয়।'

'না। আপনি কি বেড়াতে এসেছেন গ্যাংটকে?'

'আশ্চর্য! আমার গতিবিধির এত খবর রাখেন অথচ জানেন না আমি কি জন্যে এখানে এসেছি? আমরা সরকারী অনুমতি নিয়ে চুংথাং যাচ্ছি। নিশ্চয়ই শুনেছেন যে, একটা প্লেন ভেঙে পড়েছিল ওর কাছাকাছি। সেই স্পটে যাচ্ছি আমরা।'

ভদ্রলোকের চোখ আবার ছোট হয়ে এল। যেন গল্পটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। হঠাৎই জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই প্যাকেটটা কোথায় যা এই রিসেপশনিস্ট আজ সন্ধ্যায় আপনাকে দিয়েছে। ও বলছে কেউ এসে ওটা আপনার কাছে পৌঁছে দিতে বলেছিল।'

অরিন্দম চট করে লোকটাকে দেখে নিল, 'সেইটে নিয়ে কথা হচ্ছিল। প্যাকেটটা পাওয়ার পর আমি সেটা ভদ্রমহিলাকে প্রেজেণ্ট করি। একটা ফ্লাওয়ার ভাস। ভদ্রমহিলা সেটি গ্রহণ করে আমায় ওঁর ঘরে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু একটু আগে গিয়ে দেখি তিনি নেই। কি মশাই, কথাটা সত্যি কিনা?' রিসেপশনিস্টের দিকে তাকাল সে।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল। অফিসার ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, ভদ্রমহিলা?'

রিসেপশনিস্ট জানাল, 'মিসেস সেন। পনের নম্বর ঘরে আছেন। আজ রাত্রে অবশ্য এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছেন। কাল সকালে ফিরে আসবেন।'

অফিসার বললেন, 'কাল ফিরে এলেই আমাকে খবর দেবেন। শুনুন মিস্টার অরিন্দম, সিকিমে অনেক জিনিস চোরা-পথে আসছে যার মধ্যে সবচেয়ে লোভনীয় এই অস্ত্রগুলো। আমাদের সরকার এই স্মাগলিং বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। জঙ্ বাহাদুরকে আজ আমরা ধরেছি। ও লেটেস্ট বিক্রির গল্প আমাদের শুনিয়েছে। কিন্তু আমরা সেই কিউরিও শপে অথবা এখানে কোন প্রমাণ পেলাম না। আপনি যদি সত্যি কথা বলে থাকেন তো ঠিক আছে, কিন্তু মিথ্যে বললে নিস্তার পাবেন না। গুড নাইট।'

অন্য সময় হলে সারা রাত জ্বলুনি, অপমানবোধ নিয়ে বসে থাকত অরিন্দম। কিন্তু আজ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর তার ঘুম এসেছিল। নিজের ভাগ্যকে সে ধন্যবাদ দিয়েছিল হাজার বার। পুলিশ যদি আর কিছুটা সময় আগে আসত অথবা কল্পনাকে বলতে না পেরে রিভলভারটাকে যদি সে ঘরে রেখে দিত তাহলে আগামীকাল কলকাতার কাগজগুলো ফলাও করে লিখতে পারত। জঙ্ বাহাদুর নামক লোকটিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু সে তার নাম বলতে গেল কেন? এইটেই বিস্ময়ের। কিন্তু এখন আর কেন হল এই নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন মানে হয় না।

সকালে উঠে ঈষৎ মাথার যন্ত্রণা অনুভব করল অরিন্দম। ঘরে বসে চা খেয়ে মনে হল হরিশ মল্লিকের খোঁজ নেওয়া দরকার। কাল তার এখানে পুলিশ এত কান্ড করল অথচ ভদ্রলোক একবারও খোঁজ নিতে এলেন না। হরিশ মল্লিকের ঘর থেকে তার ঘর তো কয়েক পা হাঁটলেই। এবং তখনই টেলিফোন বাজল।

'দাদা, আপনি তৈরি? আমরা ঠিক সাড়ে আটটায় জিপ নিয়ে আপনার কাছে পৌঁছে যাব।' বসন্তের গলায় বেশ উত্তেজনা, 'এদিকে সবাই তৈরি।'

অরিন্দম ঘড়ি দেখল, দেখে বলল, 'ও।'

'আপনার কি শরীর খারাপ?' গলার স্বরে সম্ভবত চিন্তিত বসন্ত।

'একটু মাথা ধরেছে।'

'মাথা! তাহলে? মানে আজই স্টার্ট না করতে পারলে, আপনি তো বুঝতে পারছেন।'

'এত কিন্তু কিন্তু করছ কেন? সাড়ে আটটায় চলে এস।' টেলিফোন রেখে বাথরুমে ঢুকল সে। তৈরি হতে বেশি সময় লাগে না কোন কালেই। আউটডোরে নিয়মিত গিয়ে অভ্যেসগুলো এমন হয়ে গেছে যে মনে হয় মিলিটারিতে কাজ করলেও মানিয়ে যেত। সে যখন পুরো তৈরি তখনও দশ মিনিট সময় হাতে। বেয়ারাদের জিম্মায় মালপত্র রেখে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। হরিশ মল্লিকের

ঘরের দরজা বন্ধ। দু'বার টোকা দিয়েও সাড়া পাওয়া গেল না। অরিন্দম হেঁটে এল পনের নম্বরের সামনে। দরজা খোলা। ঘর পরিষ্কার করছে হোটেলের লোক। অর্থাৎ মহিলা এখনও ফিরে আসেননি। একদিক দিয়ে ভালই হল। সুন্দরী যখন পুলিশ অফিসারের মুখোমুখি হবেন তখন তারা গ্যাংটক থেকে যত দূরে থাকতে পারবে তত ভাল।

সিঁড়িতে পা দিতেই শরীর কেঁপে উঠল। কি করা যায় এখন। প্যাকেটটাকে সিলিন্ডারের পেছনে রেখে যাওয়ার জন্যে সে নিশ্চয়ই অতটা ঝুঁকি নেয়নি। আর এখন ওর মধ্যে টাকাগুলোও রয়েছে। একজন বেয়ারাকে ওপরে উঠতে দেখে সে স্মার্ট হল, 'হামারা কামরা সে সমান লে আও।'

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত ছুঁইয়ে ওপরে উঠে গেল। অরিন্দম সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়াল। তারপর প্যাকেটটা হাতে ঝুলিয়ে ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল। খাওয়ার ঘরে ঢুকে জিনিসটাকে টেবিলের ওপর রেখে আয়েস করে বসে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল।

আশেপাশের অনেক টেবিলেই এখন ছুরি-কাঁচির শব্দ। বেয়ারারা খুব শিষ্ট ভঙ্গিতে খাবার সার্ভ করছে। মাথার দপদপানিটা এখনও কমেনি। বছর তিনেক আগে হলে শুধু তার এই দপদপানির জন্যে একটা গোটা দিনের স্যুটিং ক্যানসেল করে দিতে পারত সে। ব্রেকফাস্ট আসতেই সে সোজা হল।

প্লেটগুলো এবং টি-পট ঠিকমত সাজাবার জায়গা করতেই বেয়ারা প্যাকেটটা তুলে একটু নিচু হয়ে টেবিলের তলায় ঢুকিয়ে রাখল। আড়চোখে দেখে নিল অরিন্দম। প্যাকেটের একটা দিকে যেন চুনের দাগ লেগেছে। হয়তো সিলিন্ডারের পেছনে রাখার সময়ে দেওয়ালের ঘসটানিতেই—, না, এই হোটেলের দেওয়ালে তো কাঁচা চুন থাকার কথা নয়। অরিন্দমের ভাল লাগল না দাগটা।

খাওয়া শেষ করে প্যাকেটটা হাতে ঝুলিয়ে রিসেপশনের দিকে এগিয়ে আসতেই দলটাকে দেখতে পেল সে। হরিশ মল্লিক দুটো হাত বুকের ওপর তুলে যুক্ত করল, 'নটার মধ্যে রওনা হলে ভাল।'

'নটা কেন?' অরিন্দম এমনভাবে প্যাকেটটা দোলাচ্ছিল যেন ওতে চকোলেট রয়েছে।

'সাড়ে আটটা থেকে নটা সবচেয়ে ভাল সময়।'

'আপনার শরীর কেমন আছে?'

'কাল বসন্তরা চলে যাওয়ার পর, মানে উত্তেজনার জন্যে ঘুমের ওষুধ খেয়ে

শুয়েছিলাম। এখন ঠিক আছি। অরিন্দমবাবু, শরীরের জন্যে এখানে পড়ে থাকলাম বটে, কিন্তু আমার মন সব সময় আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছে। আমার কষ্ট আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন।' কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলল হরিশ।

বসন্ত বলল, 'হরিশদা, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব, কথা দিচ্ছি।'

অরিন্দম রিসেপশনিস্টের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'পনের নম্বরের কোন খবর আছে ?'

রিসেপশনিস্ট একটু নড়ে উঠল, 'হ্যাঁ স্যার। ওঁর এক বন্ধু আজ সকালে এসে টাকা পয়সা মিটিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। আমি পুলিশের ব্যাপারটা ওঁকে বলেছি। ভদ্রমহিলা আজ সকালেই অফিসারের সঙ্গে দেখা করবেন।' কথাটা শুনে অরিন্দমের মুখে হাসি ফুটল।

বসন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার দাদা ? কোন ঝামেলা হয়েছিল নাকি ?'

অরিন্দম মাথা নাড়ল। যেহেতু হরিশ মল্লিক হোটেলেই থেকে যাচ্ছে তাই অরিন্দমের বিল মেটানোর দায়িত্ব সে নিল। হোটেলের বাইরে এসে দলের বাকি মানুষদের দেখা পেল অরিন্দম।

ইউনিটের যে-সমস্ত লোকেরা গ্যাংটকেই থেকে যাচ্ছে তারা বিদায় জানাতে এসেছে। অনন্ত সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোন গাড়িতে উঠবেন দাদা ?'

অরিন্দম বলল, 'প্রথমটায়।' সে প্যাকেটটাকে দোলাতে দোলাতে এগিয়ে গেল।

গ্যাংটক শহর ছাড়বার আগেই ঘটনাটা ঘটল। পুলিশের জিপটা আচমকা সামনে এসে দাঁড়াতে অরিন্দমের চোয়াল শক্ত হল। আড়চোখে পাশে রাখা প্যাকেটটাকে দেখে নিল সে। জিপ থেকে নেমে এগিয়ে এলেন অফিসার, 'ডু ইউ নো, আপনার সেই লেডি মিসিং ?'

'আমার লেডি ? আপনি ভুল করছেন।'

'আপনি যাকে প্রেজেন্ট করেছিলেন তিনি গ্যাংটকে নেই। হোটেলের রিসেপশনিস্ট যদি পেমেন্ট নেবার সময় আমাকে জানাতো তাহলে—।' কাঁধ ঝাঁকালেন ভদ্রলোক, 'তাহলে আপনারা ভাঙা প্লেন খুঁজতে যাচ্ছেন!' একটু ঝুঁকে কনভয়টি দেখলেন একবার, তারপর নিচু গলায় বললেন, 'আপনার সম্পর্কে যে রিপোর্ট পেয়েছি তার সঙ্গে এই ঘটনা মিলছে না। তাই আপনাকে একটু সাবধান করে দিচ্ছি, রিভলভারের ব্যবহার করবেন না। ভারতীয় টেরিটরিতে লাইসেন্সবিহীন অস্ত্রের ব্যবহার আপনার দুর্ভাগ্য ডেকে আনবেই। গুড লাক।' অফিসার তাঁর

জিপের দিকে এগিয়ে গেলেন।

শহর ছাড়াতেই দু'পাশে সবুজ ভ্যালি। নরম রোদে পাহাড় ঝকমক করছে। রাস্তা এখন ভাল। বসন্ত লক্ষ্য করল অরিন্দম অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছে অনেকক্ষণ থেকে। এই মানুষটাকে সে এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। কাল কল্পনা যেভাবে কথা বলেছে তাতে আশংকাই হয়েছিল একটা গোলমাল হবে। কিন্তু অরিন্দম বিপরীত ব্যবহার করেছে। একটু আগে পুলিশ অফিসারের আগমন এবং কথাবার্তা থেকে পরিষ্কার হয়েছে এমন কোন ঘটনার সংগে অরিন্দম জড়িয়ে আছে যা দলের কেউ জানে না। আর কিছু নয়, এমন কোন ব্যাপার অভিপ্রেত নয় যা তাদের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত করতে পারে। কিন্তু সে কোন প্রশ্ন করল না। যদি বলার হয় অরিন্দম নিজেই বলবে বলে তার ধারণা।

পাহাড়ে একটা মজা হল, চট করে বোঝা যায় না গাড়ি কতটা উঠে এল। বসন্ত টের পাচ্ছিল ঠাণ্ডা বাড়ছে। প্রত্যেকের বাড়তি জিনিস গ্যাংটকে রেখে আসা হয়েছে। সহদেব সেন আরাম করে টার্নারের লেখা বইটা পড়ছে। ওপাশে কল্পনা মুগ্ধ চোখে পাহাড় দেখছে। এখনও কোন চুড়োয় বরফের চিহ্ন নেই। আশেপাশের ছোট পাহাড়গুলোর শরীরে মেঘ লেগে আছে। পথে মাঝে মাঝে যে ছোট গ্রামগুলো পড়ছে তার মানুষেরা অবাক চোখে তাদের দেখছে।

এগারটা নাগাদ চায়ের জন্যে একটা গ্রামের সামনে থামল ওরা। দলের সবাই দোকানের সামনে জড়ো হয়ে কথাবার্তা বলছিল। দোকানদার সম্ভবত এত খদ্দের একসংগে অনেকদিন পায়নি। পাহাড়ী গ্রামগুলো যেমন হয়, পনের কুড়ি টিপরিবারের মানুষেরা দূরে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে। বসন্ত লক্ষ করল দু'জন জিপ থেকে নামেনি। প্রথম জিপে অরিন্দম একই ভংগিতে বসে আছে। আর শেষ জিপে ঠক্কর পা ছড়িয়ে চোখ বন্ধ করে রয়েছে। বসন্তর মনে হল এই লোকদুটো খুব স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে কল্পনাকে ডাকল। কল্পনা তখন চায়ের দোকানদারের শিশুটির সংগে ভাব জমাতে ব্যস্ত। ডাক শুনে এগিয়ে এল, 'ফ্যান্টাস্টিক জায়গা, না ?'

'হুঁ। তুমি একটা কাজ করো তো, অরিন্দমদাকে জিজ্ঞাসা করে এস চা খাবেন কিনা।'

'আমাকে বলছেন কেন ? প্রোডাকশনের কাউকে পাঠান।' কল্পনা প্রতিবাদ করল।

'প্রোডাকশন ? এটা কি ফিল্মের স্যুটিং পার্টি যে প্রোডাকশনের লোক খুঁজছ।

আমি চাই না যে দলের সদস্যদের মধ্যে কোন তিক্ত সম্পর্ক থাকুক। তাছাড়া শুধু শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে তুমি কাল অনেক রূঢ় ব্যবহার করেছ।' বসন্ত বোঝাতে চাইল।

'মোটেই না। আগের স্যুটিং-এর সময় নীতার সঙ্গে ওর ব্যাপার আমি জানি। নীতার আমার সঙ্গে একই টেন্টে থাকার কথা ছিল। ফিল্মের হিরোদের সম্পর্কে গল্প এমনি এমনি তৈরি হয় না। যা হোক, আপনি বলছেন বলে আমি যাচ্ছি।' কল্পনা অনিচ্ছায় এগিয়ে গেল। অরিন্দম একা দোকানের দিকে পেছন ফিরে বসে-ছিল। কল্পনা সোজা তার পেছনে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'চা খাবেন না? বসন্তদা জিজ্ঞাসা করছে।'

অরিন্দম মাথা নেড়ে না বলল। ফিরেও তাকাল না। খুব অপমানিত বোধ করল কল্পনা। খানিকটা রাগত ভঙ্গিতে সে জিপটাকে ঘুরে এগিয়ে গেল। এবং তখনই তার পা জমে গেল। অরিন্দমের কোলের ওপর প্যাকেটটা খোলা। টাকার খামটার দিকে নজর নেই অরিন্দমের। তার হাতে একটা চকচকে রিভলভার। অরিন্দম মুখ তুলে হাসল, 'গতকাল এটার জন্যে পুলিশ এসেছিল। সেই কারণেই তোমাকে ঘরে ডেকেছিলাম। মনে হয় চুংথাং পর্যন্ত এর দরকার হবে না। ততদিন পর্যন্ত তুমি রাখতে পারবে?'

কল্পনার ঠোঁট কাঁপল। তারপর বলল, 'প্যাকেটে জড়িয়ে দিন।'

আচমকা শব্দ করে হাসল অরিন্দম। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'থ্যাংক ইউ। গত রাত্রে যদি এই কথাটা বলতে তাহলে আমাকে টেনসনের মধ্যে কাটাতে হত না। এখন এটাকে সঙ্গে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।' কথা থামিয়ে টাকার প্যাকেটটা ভাল করে গুছিয়ে অরিন্দম বলল, 'যাও খুকি, ওদের একটু তাড়াতাড়ি করতে বল। বাঙালীর কেন গাড়িতে উঠলেই চায়ের তেষ্টা পায় জানি না।'

কল্পনাকে ফিরে আসতে দেখল বসন্ত। অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে ওর মুখে, হাঁটার ভঙ্গিতে। প্রোডাকশন ম্যানেজার অনন্ত চায়ের গ্লাস কল্পনার দিকে এগিয়ে ধরতে সে মাথা নাড়ল, 'না, ভাল লাগছে না।' বসন্ত সেটাও লক্ষ্য করল। ওর হঠাৎ মনে হল অরিন্দম খামোকা ঝামেলা তৈরি করছে। এইরকম অভি-যানে নিজেদের সম্পর্কগুলো নষ্ট হতে দেওয়া উচিত হবে না।

এই সময় জিপের শব্দ পেতে বসন্ত মুখ ফেরাল। গ্যাংটকের দিক থেকে একটা জিপ এগিয়ে আসছে। বাঁক ঘুরে কনভয়টাকে দেখে থামতে থামতে আরোহীদের তাগাদায় ড্রাইভার আবার গতি বাড়াল। ড্রাইভারের পাশে দুটো লোক যাদের সমস্ত

শরীর শীতবস্ত্রে ঢাকা। মাথায় চ্যাপ্টা টুপি। জিপটা সরকারী নয়। চায়ের দোকান ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে গিয়ে সেটা থামল। ড্রাইভার সেখান থেকেই চিৎকার করে জানতে চাইল, তিনটে চা চটপট হবে কিনা। দোকানদার কিছু বলার আগেই বসন্ত বলল, 'বল দেরি হবে। ওরা চলে গেলে তিনটে চায়ের দাম আমাদের কাছ থেকে বেশি নিয়ে নিও।'

পুলকিত দোকানদার কথাটা জানাতেই ড্রাইভার জিপে উঠে পড়ল। গাড়িটা চোখের আড়ালে চলে যেতেই বসন্ত দ্রুত হেঁটে গেল অরিন্দমের কাছে, 'ওই জিপটা দেখলেন দাদা?'

'জিপ আবার দেখার জিনিস নাকি?'

'না না। সেই মানিকজোড় গোয়েন্দা ওটায় বসেছিল।'

'কে কোথায় কি করছে এ খবরে আমাদের লাভ কি বসন্ত। সহদেবকে বল আকাশটার দিকে তাকাতে। ওই ওদিকে।' অরিন্দম নির্বিকার গলায় বলল।

আর ওদিকটা লক্ষ্য করেই বুকের ভেতর থম ধরল বসন্তর।

সহদেব সেন একটা খবর জানতেন না। টার্নারের বই-তেও লেখা ছিল না। গত কয়েক বছরে সিকিমের রাস্তাঘাট নতুন করে তৈরি এবং যত্নে রাখায় বাসরুট বেড়ে গেছে অনেক। গ্যাংটক থেকে চুঙথাঙ পর্যন্ত বাস যাচ্ছে এখন। অবশ্য সেই সব পাহাড়ী বাসে উঠে জায়গা পাওয়া মুশকিল। বাসের সাইজও ছোট। গ্যাংটক ছেড়ে পেনল্যাঙ্ হয়ে দিকচুতে আসার পথে দুটো বাদুড়ঝোলা বাস দেখতে পেল ওরা। আগে হেঁটে বা খচ্চরের পিঠে গ্যাংটক যেতে হত। এখন চার চাকার দৌলতে এই সব গ্রাম্য অঞ্চলে শহরের গন্ধ এসে গেছে।

দিকচুতে পেঁছাতে প্রায় দুপুর। বসন্ত লাঞ্চ ব্রেক দিল। তিনধারিয়া কিংবা সোনাদার মত ছোট্ট জায়গা। কিন্তু এখানে এসে ওরা আবার তিস্তা নদীর দর্শন পেল। ঠিক নদী না বলে দুরন্ত এবং বৃহৎ ঝরনা বলাই অনেক বেশি সঙ্গত। পাথরের ওপর ফেনা ছড়িয়ে জল নামছে।

ছবির স্যুটিং-এর সময় ইউনিটের কেউ বাইরে খায়নি। অনন্তর ব্যবস্থাপনায়

রান্না কোনরকমে হয়ে যেত। দিকচুর একটি নেপালী দোকানে পরোটা আর তরকারির অর্ডার দিয়ে বিপাকে পড়ল অনন্ত। প্রথমে কল্পনা চিৎকার করে উঠেছিল, 'ও অনন্তদা, এ কি জিনিস ?'

অনন্ত তখনও তদারকি করছিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন, কি হল ?'

'একটু মুখে দিয়ে দেখুন। এরকম জিনিস হোল লাইফে খাইনি।' কল্পনার কথা শেষ হওয়ামাত্র যারা খেতে গিয়েও চুপ করে ছিল তারাও মুখ খুলল। চিবোতে গেলেই দাঁতে বালি কচকচ করছে। তরকারির আলু জাতীয় পদার্থ থেকে খানিকটা জল প্লেটের একপাশে সরে গিয়ে বস্তুটিকে আরও সাদা করে তুলেছে। চুপচাপ থেকে গেলে সবাই যে যার মত পারত খেয়ে নিত। কিন্তু একবার প্রতিবাদ উঠতেই খাবার ফেরত যেতে লাগল। দোকানদার ছাড়ার পাত্র নয়। সে খাবার দিয়েছে তার সঞ্চয় থেকে। সে ইচ্ছে করে বালি মেশায়নি। তরকারি এর চেয়ে কি করে ভালভাবে রান্না করতে হয় তাও তার জানা নেই। অতএব খাও বা না খাও পয়সা দিয়ে যেতে হবে। এবং এই নিয়েই অনন্তর সঙ্গে ঝামেলা বাড়ল। চিৎকার চেঁচামেচি বেড়ে যেতেই তিনচারজন লোক ছুটে এল ভোজালি হাতে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছুটল জিপের দিকে। এমন কি বসন্তর মনে হল সামনাসামনি দাঁড়িয়ে থাকলে এই ক্রুদ্ধ লোকগুলো আক্রমণ করতে পারে। আর তখনই রব উঠল খাবারের দাম না মিটিয়ে টুরিস্টরা পালিয়ে যাচ্ছে। এই টুকুনি জায়গায় এত লোক ছিল তা বোঝা যায়নি। অবশ্য কেউ কেউ এসেছে স্রেফ মজা দেখতে। সামনের রাস্তায় ভিড়টা এমন জমাট বেঁধে গেল যে জিপ চালানোর প্রশ্নই ওঠে না। সহদেব সেন গাড়িতেই বসে চিৎকার করে অনুরোধ করলেন ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে। কিন্তু দোকানদারের ছেলে ফুঁসে উঠল, টুরিস্টদের মধ্যে যে দুজন তার বাবাকে গালাগাল করেছে তাদের শাস্তি না দিয়ে ওরা পথ ছাড়বে না। টাকা পেলেও না।

সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ায় থম ধরল। কেউ কোন কথা বলছে না। লোকগুলো আঙুল তুলে অনন্ত আর বিক্রমকে দেখাচ্ছে। ওদের মুখ এখন শুকিয়ে আমসি। বসন্ত আতঙ্কিত গলায় সহদেবকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি করা যায় ? অবস্থাটা তো ক্রমশ খারাপ হচ্ছে !'

সহদেব বলল, 'ক্ষমা চেয়েও পার পাওয়া যাবে না বলে মনে হচ্ছে। কেন যে স্ল্যাং শব্দ এরা ইউজ করল। অরিন্দমবাবু, কি বলা যায় বলুন তো ?'

অরিন্দম চুপচাপ জিপের পাশে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। যে মানুষ-

গুলোকে প্রথমে শান্ত সরল বলে মনে হয়েছিল তারা যখন এমন প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে তখন তাদের ঠান্ডা করার কোন ওষুধ জানা নেই। ওরা কি শাস্তি দিতে চায় তা যদি জানা যেত তবে না হয় উপায় ভাবা যেত। এই সময় তার নজর পড়ল একটি মানুষের ওপর। পেছনের জিপ থেকে নেমে শিস দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের জনতার দিকে জ্যাকেটে দুটো হাত ঢুকিয়ে। বসন্ত চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ঠক্কর আবার কি করছে?'

ওরা দূরে থেকে দেখলে হিলহিলে লোকটা সোজা দোকানদারের ছেলের সামনে পা ফাঁক করে দাঁড়াল। সে কি বলছে তা এত দূরে থেকে শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার পর দোকানদারের ছেলে প্রতিবাদের গলায় কিছু বলতে শুরু করে থেমে গেল। ঠক্করের হাত এখন জ্যাকেটের ভেতরে ঢোকানো নেই। হঠাৎ ঠক্কর ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল, 'এ অনন্তবাবু!'

নিজের নামটা কানে যাওয়ামাত্র অনন্তর পিলে চমকে উঠল। এতক্ষণ জিপের ভেতর বসে ইষ্টনাম জপ করছিল। ঠক্কর ডাকার পর অসহায় চোখে তাকাল সঙ্গীদের দিকে। ঠক্কর ফিরে আসছিল শিস দিতে দিতে। অনন্তর জিপের পাশে পেঁছে হিন্দীতে বলল, 'খাবারের দাম মিটিয়ে দিন।' বলে হাসল, 'তাহলে আপনাদের জানের ভয় আছে। আছে না?' বলে চলে গেল শেষ গাড়িটার দিকে হালকা পায়ে। এবং তখনই অনন্তর নজর পড়ল ওর জ্যাকেটের পকেটের ওপর। নির্ঘাত মাল আছে ওখানে।

পথে মানগাঁও বা সিঙ্গিক নামে মোটামুটি দুটো গঞ্জ পড়লেও দাঁড়ায়নি ওরা। খিদে প্রত্যেকেরই পাচ্ছে। কিন্তু পেতে পেতে সেটার তীব্রতা কমে এসেছে। ঠক্কর যে হঠাৎ হিরো হয়ে গেল এইটেই কেউ সহ্য করতে পারছে না। সহদেব সেনও না। বারংবার সে বলেছে, 'হু ইজ দিস ম্যান? এসব অঞ্চলে কি লোকটা এর আগে এসেছে? নইলে ওর কথায় এরা এত ভাল রিঅ্যাক্ট করল কি করে?' অনন্ত টাকা মিটিয়ে দেবার পর লোকগুলো আর কিছু বলেনি। ব্যাপারটা অরিন্দমের কাছেও রহস্যজনক মনে হয়েছিল। ঠক্কর লোকটা খুব সাধারণ কেউ নয়। এর সঙ্গে ভবিষ্যতে অনেক শক্ত ঝামেলায় পড়তে হবে।

চুঙ্‌থাঙে যখন ওরা পেঁছাল তখন দিনের আলো মরছে। ধারালো ছুরির মত হাওয়া বইছে। গ্যাংটকের চেয়ে এখানকার ঠান্ডা অনেক বেশি। সারাটা পথে ওরা বৃষ্টি পায়নি। কিন্তু চুঙথাঙের আকাশে এই প্রায়-সন্ধ্যায় মেঘ জমেছে। চুঙ্‌থাঙে ভাল হোটেল পাওয়ার কথা কেউ ভাবেনি। গ্যাংটকে সহদেব সেন তিনটে বাংলোর

খবর নিয়েছিল। চিঠিও করে এনেছিল একটার। চুঙথাঙ বাজারে গাড়ি রেখে খবর নিয়ে জানা গেল দুটো বাংলা ভর্তি হয়ে গেছে। তিন নম্বরে মাত্র দুটো ঘর, চারটে খাট, সেখানে এত লোকের জায়গা হবে না। আপাতত সেটাতেই মালপত্র নিয়ে ওঠার সিদ্ধান্ত হল। বাংলোর পেছনেই তিস্তার জলের শব্দ। সারাদিনের ধকল সত্ত্বেও তিস্তার পাড়ে দাঁড়িয়ে মন ভাল হয়ে গেল অরিন্দমের।

একজন টিবেটিয়ান লামার বাড়িতে বাকি সকলের জায়গা করে অনন্ত যখন দল নিয়ে রওনা হয়ে গেল তখন সন্ধ্যা নেমে গেছে। আর তখনই তরল ঠান্ডাটা যেন বরফের মত জমে গেল। বাংলোর দুটো ঘরের একটায় জিনিসপত্র এবং ক্যামেরা নিয়ে কল্পনা, অন্যটায় সহদেব আর অরিন্দম।

এক ঘরে অন্য লোকের সঙ্গে কাটানোর ব্যাপারে আর আপত্তি করার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া সহদেব সেন লোকটা মন্দ নয়। কম কথা বলে। অরিন্দমের মনে হল সহদেব তার সঙ্গে এক ঘরে থাকছে জানার পর কল্পনার মুখে স্বস্তি ফুটে উঠেছিল। মেয়েরা একবার যাকে খারাপ চোখে দ্যাখে তাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। বাইরে ভদ্র ব্যবহার করে পরিস্থিতি এড়িয়ে যেতে পারে এইমাত্র। আজ পর্যন্ত সেই মহীয়সী মহিলা তার সঙ্গে কথা বলেন না। তখন সবে ফিল্মে কাজ শুরু করেছে অরিন্দম। প্রথম ছবিতে যে তার প্রায় সমান ভূমিকায় ছিল সেই অতীন মুখার্জির সঙ্গে চমৎকার সম্পর্ক তখন। সেটা ছিল দুজনেরই সংগ্রামের সময়। বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প নিয়ে একটা বড় বাজেটের ছবি তৈরি হচ্ছিল টালিগঞ্জে। বাংলা ফিল্মের সর্বকালের সেরা নায়িকা তার মুখ্য চরিত্রে কাজ করছেন। অতীনকে পরিচালক নির্বাচন করেছিলেন নায়িকার প্রথম যৌবনের স্বামীর চরিত্রে। গ্রুপ থিয়েটার করা ছেলে অতীন মনে করত সেটে পরিচালক ছাড়া সে কারো কথা শুনতে বাধ্য নয়। কিন্তু ওই ছবির স্ক্রিপ্ট পরিবর্তন করা থেকে অভিনেতা নির্বাচনে নায়িকার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সক্রিয়। স্যুটিং-এর সময় একটি দৃশ্যে অভিনয় নিয়ে অতীনের ভূমিকা নায়িকার পছন্দ হল না। অতীন তা মেনে নিতে পারছে না দেখে নায়িকা সেট ছেড়ে চলে গেলেন। মেক আপ রুমে গিয়ে তিনি পরিচালককে ডেকে অভিনেতার পরিবর্তন চাইলেন। এত বড় বাজেটের ছবিতে নায়িকার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা পরিচালকের ছিল না। অতীনকে সেটা জানিয়ে দেবার আগে তিনি গোপনে বদলী অভিনেতার খোঁজ করলেন। এবং সেটা যেহেতু সেদিনই করতে হবে যাতে সেট না ভাঙতে হয় এবং প্রযোজকের খরচ না বাড়িয়ে স্যুটিং চালানো যায়। মুভিটোনে পরিচালক বীরেনদার সঙ্গে দেখা করতে

গিয়েছিল। সেখানেই প্রোডাকশন ম্যানেজার এসে তাকে ধরল, এক্ষুনি এন টি ওয়ানে যেতে হবে। কোন খবর না জানা থাকায় উল্লসিত অরিন্দম চলে এসেছিল ফ্লোরে। একটা নতুন ছবির কাজ পাওয়ার আনন্দ তো ছিলই, সেই সঙ্গে অতীনের সহ অভিনেতা হওয়া যাবে এই খুশিটাও কাজ করছিল। তাকে নিয়ে যাওয়া হল নায়িকার মেক আপ রুমে। সেখানে পরিচালকও ছিলেন। সব শুনে সে মাথা নেড়েছিল, 'এ অসম্ভব। আমার পক্ষে ওই রোল নেওয়া অন্যায়।'

নায়িকা চোখ ছোট করেছিলেন, 'অন্যায় কেন ?'

'একজন অভিনেতাকে বিনা দোষে বাদ দিচ্ছেন আপনারা। আমাকেও যে দেবেন না তার নিশ্চয়তা কোথায়। তাছাড়া একজন পরিচালকের যখন ছবির পেছনে ভূমিকা থাকে না তখন কাজ করার কোন যুক্তি নেই। মাফ করবেন।' কথাগুলো বলে চুপচাপ বেরিয়ে এসেছিল সে। ফ্লোরের কারও সঙ্গে দেখা করেনি, এমনকি অতীনের সঙ্গেও নয়। আশ্চর্যের ব্যাপার এন টি ওয়ান স্টুডিও থেকে মুভিটোন স্টুডিওতে ফিরে এসেই সে একজন মহান অভিনেতার মুখোমুখি হয়েছিল, 'সাবাস! এই তো চাই। অভিনেতা হয়ে আর একজন অভিনেতার পাশে যে না দাঁড়ায় তার সংলাপ বলার অধিকার নেই। খুব খুশি হয়েছি।'

অরিন্দম অবাক। এত তাড়াতাড়ি তিনি জানলেন কি করে! নায়ক রহস্য করে বলেছিলেন, 'মুভিটোনে কেউ প্রেম নিবেদন করলে প্রেমিকা তা শোনার আগেই নিউ থিয়েটার্সে বসা ফিল্মের লোকের কানে পৌঁছে যায়। বুঝলে হে, এর নাম টালিগঞ্জ।' কথাটাকে পরেও অবশ্য বার বার সত্যি হতে দেখেছে। তবে উল্টো ক্ষেত্রে। খারাপ কিছু ঘটলে নিজে বোঝার আগেই টালিগঞ্জের মানুষ বুঝে যায়। কথা এখানে শব্দের আগে ছোটে। সেই ছবিটা অবশ্য শেষ হয়েছিল, মুক্তি পেয়েছিল কিন্তু ভাল চলেনি। মজার ব্যাপার হল সেই নায়িকা তার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিলেন। অনেককেই বলেছেন, একটা নতুন ছেলে এইভাবে আমাকে অপমান করল। অনেক পরে, যখন অরিন্দম জনপ্রিয় নায়ক তখনও ভদ্রমহিলার কাছে যদি কোন প্রস্তাব যেত ওর সঙ্গে একই ছবিতে অভিনয় করার জন্যে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন। আজ পর্যন্ত মুখোমুখি দেখা হয়নি কারণ তিনি মাঝ পথে ছবি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু অরিন্দম জানে ওঁর কাছে নিজের ইমেজ কখনই ফিরিয়ে আনা যাবে না। এটি যদি ছবির নায়িকা না হয়ে যে কোন আটপৌরে বাঙালী মেয়ে হত তাহলেও কোন ব্যতিক্রম ঘটত না।

বসন্ত যাওয়ার আগে কল্পনাকে বলে গিয়েছিল, 'সহদেব কিংবা অরিন্দমদার

গলা না পেলে কখনই দরজা খুলবেন না। অচেনা জায়গায় একা থাকছেন, এইটে মনে রাখবেন।' অতএব সন্ধ্যেবেলায় রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে বেচারা সেই যে দরজা বন্ধ করেছিল আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বস্তুত এখানে এত শীত যে একবার কম্বলের তলায় ঢুকে গেলে রাতের পৃথিবীটা অজানা রাখতেই ভাল লাগে। পাশের খাটে সহদেব কাগজপত্র দেখছিল। অরিন্দম নিজের খাটে শুয়ে চোখ বন্ধ করে তিস্তার গর্জন শুনছিল। সেই তিস্তাকে দেখলে কে বলবে জলপাইগুড়িতে অমন ভয়ঙ্করী হয়ে ওঠে! হঠাৎ সহদেব সেন বলল, 'কয়েকটা ব্যাপারে একটু গোলমাল হয়ে গেছে দাদা।'

বসন্তর দেখাদেখি সহদেব তাকে এখন দাদা বলে সম্বোধন করছে। অরিন্দম ওর দিকে পাশ ফিরে শুয়ে তাকাল। সহদেব বলল, 'চুঙ্থাঙ থেকে দুটো রাস্তা দুদিকে চলে গিয়েছে। এই যে তিস্তা দেখছেন, নদীটাও এখান থেকে দুটো ভাগ হয়ে গিয়েছে। রাস্তা ওই দুটো ভাগ ধরে উঠে গেছে ওপরে। একটা শেষ হয়েছে লাচেনে আর একটা লাচুঙ হয়ে জুমথাঙ। জিপ কোনমতে যেতে পারবে। যে পয়েন্টে প্লেনটা ভেঙে পড়েছে সেটা মাঝামাঝি জায়গায়। লাচেন এবং জুমথাঙ্, দুটো জায়গা থেকেই যাওয়া যায়।'

অরিন্দম বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না আপনার কথা। যেখান থেকে দূরত্ব কম হবে সেখান থেকেই যাব।' সহদেব মাথা নাড়ল, 'সেই কথাই তো বলছি। লাচেন এখান থেকে কয়েক ঘণ্টার পথ। কিন্তু সেখান থেকে আমাদের খাড়াই ভাঙতে হবে। জুমথাঙ্-এ যেতে হলে অনেকটা সময় লেগে যাবে। আসলে এই নামগুলো মনে রাখা মুশকিল। সিকিমিজ শব্দ উচ্চারণের সময় উল্টোপাল্টা হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয় যদি আগে না শোনা থাকে। আপনি একটা শব্দ উচ্চারণ করুন তো।' সহদেব কাগজে কয়েকটা অক্ষর লিখে এগিয়ে ধরল। অরিন্দম শব্দটাকে দেখল। কে এইচ এ এন জি সি এইচ ই এন ডি জেড্ ও এন জি এ। অরিন্দম বলল, 'বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না তো।'

'কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা শব্দটা যদি আগে আপনার না শোনা থাকত তাহলে? আজ কুলিগুলো কি বলছে জানেন? ওরা নাকি বলেছিল লাচেনে ওদের বাকি লোকেরা থাকবে বলে গ্যাংটকে জানিয়েছিল। সেই লোকগুলোকে না পেলে চলবে না আবার. লাচেন থেকে হাঁটার কষ্টটার কথাও ভুলতে পারছি না।'

অরিন্দম বলল, 'লাচেনে না গিয়ে উল্টো পথে লাচুঙের ওপর দিয়ে জুমথাঙ্ পৌঁছালে সেখান থেকে কি সুন্দর পায়ে হাঁটা পথ পাওয়া যাবে?'

হঠাৎ ছাদ কাঁপিয়ে হেসে উঠল সহদেব। যেন এমন মজার কথা সে কখনও শোনেনি। কোনরকমে নিজেকে সামলে বলল, 'এত হাজার ফুট ওপরে পাহাড়ে কি করে সমান রাস্তা আশা করেন।'

অরিন্দম বলল, 'তাহলে তো সমাধান হয়ে গেল। তুমি লাচেনে গিয়ে লোকগুলোকে নিয়ে এস। আমরা এখানে দুদিন আরাম করি। তারপর এক সঙ্গে জুমথাঙ্‌-এর দিকে যাওয়া যাবে।'

এবার সহদেবের মুখ শুকিয়ে গেল। সে কখনই পাহাড়ে একা যাওয়া আসা পছন্দ করে না। এখান থেকে জিপ নিয়ে কিছু দূর যাওয়ার পর তিস্তা পার হতে হবে কাঠের সাঁকোয়। এর আগের বার যখন সে ওই পথে দলের সঙ্গে এসেছিল তখন একটা দুর্ঘটনা হতে হতে হয়নি। ম্যাপ বলছে জুমথাঙ্‌ যেতে নদী পার হবার ঝামেলা নেই। চুঙথাঙে ঢোকার সময় সেই ঝামেলা চুকে গেছে। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা না বললেই ভাল হত। সে যাচ্ছে নিজের শখে এবং বসন্তকে সাহায্য করতে। কিন্তু সমস্ত ঝামেলা তাকেই সামলাতে হবে এমন কথা ছিল না।

পাশের ঘরে শুয়ে কল্পনার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। বাংলোর পেছনে তিস্তা ক্রুদ্ধ সাপের মত ফুঁসছে। কিছুক্ষণ কান পাতলেই বুক শির শির করে। বাংলোটা কাঠের। হাওয়ায় বিচিত্র শব্দ উঠছে, সে ঘুমাবায় চেষ্টা করেও পারল না। একবার মনে হল পাশের ঘরে গিয়ে অরিন্দমদের সংগে গল্প করে আসে। কিন্তু তাকে দরজা খুলে বারান্দায় যেতে নিষেধ করা হয়েছে। ফিল্মের নায়কদের চরিত্র নিয়ে নানান গল্প আগেই শোনা ছিল। প্রথম ছবির শুটিং-এ গিয়ে নিজেই সাক্ষী থেকেছে অরিন্দম-নীতার ঘটনার। এবং তার পর থেকে অরিন্দম সম্পর্কে কোন শ্রদ্ধা তার অবশিষ্ট নেই। কিন্তু লোকটা সংগে রিভলভার নিয়ে এসেছে কেন? কথাটা সে কাউকেই, এমন কি বসন্তকেও জানায়নি। জানানো উচিত কিনা তাও বুঝতে পারছে না। অন্যমনস্ক হবার জন্যেই লিফলেট টেনে নিল কল্পনা। এখন ঘড়িতে মাত্র আটটা। হাওয়া আর তিস্তার শব্দ ছাড়া পৃথিবীতে প্রাণের কোন অস্তিত্ব নেই। সিকিম রাজ্যের চার পাশে তিব্বত, নেপাল, ভুটান আর পশ্চিমবাংলা। এই পাহাড়ী রাজ্যের পাহাড়গুলো আটশো ফুট থেকে আঠাশ হাজার পর্যন্ত। সিকিমের সবচেয়ে বড় গর্ব কাঞ্চনজঙ্ঘা এই রাজ্যের পর্বত। সিকিম শব্দের মানে নব রাজপ্রাসাদ। টিবেটিয়ানরা অবশ্য একে ডেনজঙ বলে সম্বোধন করে। লেপচাদের কাছে সিকিম হল 'স্বর্গ'। সিকিমের ভারতভুক্তির পর পূর্ব সিকিমে এবং ফোডাঙের ওপারে উত্তর সিকিমে যাওয়ার ব্যাপারে সরকারী নিষেধাজ্ঞা আছে। অন্তত সিকিম

তিব্বতের বর্ডারের কাছে যেতে দিতে ভারত সরকার স্বাভাবিক কারণেই পারেন না। ছোল লা নাথুলা বা জেলেপ লা থেকে গ্যাংটকের দূরত্ব বেশি নয়। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষ ওই সীমানায় এসে গিয়েছিল। কিন্তু যাই হোক সিকিমিজরা বিশ্বাস করে তাদের তুষারমোড়া পাহাড়ে এখনও ইয়েতিরা বাস করে।

ইয়েতি শব্দটা পড়ামাত্র কল্পনা থমকে দাঁড়াল। শুটিং-এর সময় যে বরফ তারা পেয়েছিল সেখানে কোন বিস্ময় বাস্তবে ছিল না। হয়তো বিক্রমবাবুর ক্যামেরায় বিস্ময় তৈরি হবে। কিন্তু অনুসন্ধানের সময় যদি আচমকা ইয়েতির মুখোমুখি হতে হয় এখানে, ভাবতেই শিহরণ উঠল শরীরে। আর তখনই কাঠের বারান্দায় শব্দ উঠল। লিফলেটটা নামিয়ে কল্পনা কান খাড়া করল, তার চোখ বন্ধ দরজার ছিট-কিনির দিকে। জুতোর শব্দ হচ্ছে খুব সন্তর্পণে। ইউনিটের কেউ যদি হত তাহলে এতক্ষণ গলা তুলে নিশ্চয়ই ডাকাডাকি করত। শব্দটা আবার উঠল, এবং এবার এগিয়ে এসে দরজার সামনে থামল। কম্বলের তলায় শুয়েও হঠাৎ কল্পনার শীত-বোধ বেড়ে গেল। এবং তারপরেই খুব মৃদু টোকা পড়ল দরজায়। ঠোঁট কামড়াল কল্পনা। এই টোকায় যে সংকেত আছে তা বুঝতে অসুবিধে হল না। এইবার মুখোমুখি কথা বলা দরকার। লোকটা যদি ভেবে থাকে আর পাঁচটা নরম মনের মেয়ের মত সে কৃতার্থ বোধ করবে তবে—কল্পনা উঠে দাঁড়াল। একথা ঠিক যখনই তার সংগে কথা বলেছে তখনই লোকটা এমন ভাব করেছে সে নেহাতই ছেলে-মানুষ। শুটিং-এর সময় নীতার সংগে তাকে নিয়ে রসিকতা হয়েছে এ খবর প্রোডাকসন বয়রা গল্প করেছে। এবং এখন এই নির্জন বাংলোয় সহদেব সেন ঘুমিয়ে পড়ার পর লোকটা তার মুখোশ খুলে দরজায় টোকা দিচ্ছে।

এই সময় আবার টোকা পড়ল দরজায়। চিৎকার করে কে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও মত পাল্টালো। তার গলায় বিরক্তি শুনলে আগন্তুক নিজের ঘরে ফিরে যাবে। ফলে মুখোশ খুলে দেবার সুযোগটা হারাবে সে। কল্পনা দরজার কাছে নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াল। ওপাশে কোন শব্দ হচ্ছে না। হঠাৎ সমস্ত জড়তা সরিয়ে নিঃশব্দে ছিটকিনির ওপর হাত নিয়ে গিয়ে দ্রুত দরজাটা খুলে চিৎকার করে উঠল, 'কি চাই আপনার ? কি চান এখানে ?'

সংগে সংগে লোকটা ছিটকে গেল। ঘরের আলো যেটুকু এসেছে বারান্দায় তাতেই লোকটাকে খুব নার্ভাস দেখাল। তারপর পড়ি কি মরি করে বারান্দার অন্য প্রান্তে সিঁড়ির দিকে ছুটল। ততক্ষণে কল্পনা বুঝে গিয়েছে সে ভুল করেছে। লোকটা প্রায় দৌড়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। হু হু ধারালো হাওয়া আর

মেঘলা আকাশের শরীর থেকে চুঁইয়ে পড়া ঠাণ্ডার বাইরে আর এক শীতলতায় কল্পনা কেঁপে উঠল। তার হৃৎপিণ্ড যেন গলায় এসে আটকেছে। কথা বলার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলল সে।

কল্পনার চিৎকার শুনে কয়েক সেকেণ্ড বুঝতে সময় লেগেছিল অরিন্দমের। ঘুম আসছিল না বলে সে এক পেগ ব্রাণ্ডি জল ছাড়াই গ্লাসে নিয়ে শুয়েছিল পাশ ফিরে। ওপাশের খাটে সহদেব ঘুমোচ্ছে নাক ডেকে। পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা লোকটার। চিৎকারটা বোঝার পর উঠে বসেছিল অরিন্দম। এত রাত্রে কাকে বকছে কল্পনা। সে চটপট বিছানা ছেড়ে কম্বলটাকেই শরীরে জড়িয়ে নিল। তারপর দরজা খুলে বাইরে পা দিতেই পাশের ঘরের দরজা খোলা দেখতে পেল। দ্রুত ব্যবধান ঘুচিয়ে সামনে আসতেই কল্পনার রক্তশূন্য মুখ দেখতে পেল। সে চটপট চারপাশে তাকাল। কেউ নেই কোথাও। অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? কার সঙ্গে কথা বলছিলে?' কল্পনা উত্তর দিতে পারল না। অরিন্দম তখনই বুঝতে পারল মেয়েটা স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। ওকে ধরে ধরে খাটের কাছে নিয়ে এল সে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে বলতো? তোমার এই অবস্থা কেন?'

হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে উঠল কল্পনা, 'আমি একা এই ঘরে থাকতে পারব না!'

অরিন্দম মেয়েটার কাঁধে হাত দিল, 'কি হয়েছে?'

ঠাণ্ডা ঢুকছে হু হু করে। দরজাটা খোলা। কল্পনা আরও কুঁকড়ে যাচ্ছিল। সেই অবস্থায় জবাব দিল, 'আমার ঘরের দরজায় কেউ টোকা দিচ্ছিল, আমি ভেবেছিলাম—।'

'দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে শুয়ে পড়ো। রাত্রে হাজার ধাক্কা দিলেও আর খুলবে না।' অরিন্দম ওর হাত ধরে প্রায় টেনে নিয়ে এল দরজার কাছে। তারপর সেটাকে বাইরে থেকে ভেজিয়ে আবার বলল বন্ধ করতে। শব্দটা কানে যাওয়ার পর সে স্বস্তি পেল। এই মেয়েটির সঙ্গে সেই জেদী সন্দেহবাগীশ রুচি আঁকড়ে থাকা মেয়েটির কোন মিল নেই। সে অন্ধকার বারান্দায় হেঁটে এল সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত। কোথাও কেউ জেগে আছে বলে মনে হচ্ছে না। তাহলে কে এসে কল্পনার দরজায় টোকা মারবে? ইউনিটের কেউ নয়তো। সেরকম মুখ দলে আছে বলে মনে হচ্ছে না। অরিন্দম স্থির করল এই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই। এই ঠাণ্ডায় ব্রাণ্ডিটা শেষ করে বিছানায় ঢুকে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

চুঙথাঙে সকাল হয় রোদ না নিয়ে। সূর্যদেবের দর্শন পাওয়া যায়, কপাল ভাল থাকলে, এগারটার পরে। গত বিকেলে মেঘ জমেছিল চুঙথাঙের আকাশে। রাত্রে যে বৃষ্টি নেমেছিল তা অরিন্দম টের পায়নি। ফুলস্লিভ সোয়েটারের ওপর শাল জড়িয়ে বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে চা খেতে খেতে তার মনে হল শেষ স্নানটা সম্ভবত চুঙথাঙেই করে যেতে হবে। টেবিলের অন্য প্রান্তে বসে সহদেব সেন বলল, 'কাল রাত্রের বৃষ্টিটা আমাকে খুব ভাবাচ্ছে দাদা। ওয়েদার ক্রমশ আনপ্রেডিক্টেবল হয়ে যাচ্ছে।' অরিন্দম বলল, 'ভেবে কোন লাভ নেই। এখান থেকে নিশ্চয়ই ফিরে যাব না। লাচেনে কখন যাওয়া হচ্ছে?' একটু হতাশ গলায় সহদেব বলল, 'বসন্ত আসুক। ওর তো সাত সকালেই আসার কথা।'

কল্পনার দরজা এখনও বন্ধ। যদিও চৌকিদার যখন হাঁকাহাঁকি করে ঘরে ঘরে গরম জলের বালতি পেঁছে দিয়েছিল তখন দরজা খোলার আওয়াজ কানে এসেছিল। চায়ের কাপটা রেখে অরিন্দম উঠে দাঁড়াল, 'একটু পায়চারি করে আসি। ওরা এলে বলবেন বেশি দেরি হবে না।'

কাঠের বাড়িতে থাকার আরামই আলাদা। এর আগেও অনেকবার মনে হয়েছে কলকাতায় যদি এরকম একটা বাংলো বানাতে পারত। খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াতে ডানদিকে পর পর তিনটে তুষার-শৃঙ্গ যেন হুস করে উঠে এল। এরা কেউ কাঞ্চন-জঙ্ঘা বা এভারেস্ট নয়। অনেকক্ষণ ভেবে একটা নাম মনে পড়ল, 'তাঙকার লা।' পাহাড়ের চুড়ো হাড়ের মত সাদা।

ঠাণ্ডাটা এক জায়গায় দাঁড়ালে বড্ড বেশি আঁকড়ে ধরে। অরিন্দম হেঁটে এল অনেকটা। খুব সাধারণ পাহাড়ী গঞ্জ। শহর বলা যায়ই না। যদিও হিন্দী সিনেমার পোস্টার গাছের গায়ে টাঙানো। লোকগুলো অরিন্দমকে যে চোখে দেখছে সেই চোখে যে কোন শহুরে মানুষকে দেখত। অরিন্দমের মনে হল সে এতদিন কিছুই করতে পারেনি। ফিল্মের নায়করা সব সময় বলে পাবলিকের জন্যে তাদের ব্যক্তিগত জীবন থাকে না। কিন্তু তারা যদি এই অবস্থায় পড়ে তখন ছটফটিয়ে চেনা মানুষ খোঁজে।

কিন্তু জায়গাটাকে ভাল লাগছে। পাহাড় কেটে এই জায়গাটা যেন বানানো। লোকগুলো রীতিমত পরিশ্রম করে বেঁচে থাকে। অন্তত পাহাড়ের বুক চিরে চাষ-বাস করার চেষ্টা দেখে তাই মনে হল। তবে হ্যাঁ, যেখানেই নজর যাচ্ছে সেখানেই রঙিন ফুলের মেলা। যেন সমস্ত চুঙথাঙ একটা ভরাট ফুলদানি। কলকাতা থেকে পালিয়ে যদি মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকা যেত। অরিন্দম একটা ঝরনার পাশে

দাঁড়াল। জল বেশি নেই কিন্তু স্রোত ফেনা ছড়াচ্ছে। এখানেও রডড্রেনডন আর পাহাড়ী রঙিন প্রজাপতির ভিড়। এই সময় পেছন থেকে একটা গলা ভেসে এল। অরিন্দম ঘুরে দাঁড়িয়ে চমকিত। জোড়া গোয়েন্দা তার দিকে এগিয়ে আসছে হাসতে হাসতে। চুঙথাঙের ঠাণ্ডায় অমন বিকট পোশাক কেউ পরতে যে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস হত না। অন্তত গোটা তিনেক সোয়েটারের ওপর ফিনল্যাণ্ডের ওভারকোট না চাপালে শরীর অমন ভাগলপুরী দেখায় না। শুধু নয়, গামবুটের মত হাঁটু পর্যন্ত জুতো যার ভেতরে প্যাণ্ট ঢোকানো। মাথায় মোটা বাঁদুরে টুপি।

অরিন্দম বলল, 'তাহলে আপনারাও এখানে।'

কালো চশমা পরা দুজন মানুষ একই সঙ্গে হাত তুলে নমস্কারও জানাল। হাত তুলতে গিয়েও সেটা না করে মাথা নাড়ল অরিন্দম। এখন কে কোন্ জন, তার গুলিয়ে যাচ্ছে। একজনের পাকা জুলপি ছিল, যে আগবাড়িয়ে কথা বলত। দ্বিতীয়জন সেটাকেই সমর্থন করত। টিনটিনের সঙ্গী সেই দুটো ডিটেকটিভের মতো। কিন্তু টুপির তলায় জুলপি ঢাকা পড়ে গেছে।

বাঁ দিকের লোকটি বলল, 'দারুণ জায়গা, কি বলেন! নিজেকে কেমন হিরো হিরো লাগে।'

ডান দিকেরটি বলল, 'সিনেমা দেখে বের হলেই আমার ওরকম মনে হয়।'

অরিন্দম মাথা নাড়ল, 'আমার হয় না।'

বাঁ দিকেরটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তা তো বটেই। হিরোদের আবার হিরো হতে ইচ্ছে করবে কেন?'

অরিন্দম বলল, 'তাহলে আপনারা হাল ছাড়ছেন না।'

'বস যদি উইথড্র করত তাহলে এই মুহূর্তেই চলে যেতাম। কাল রাত্রে আমাকে শাসিয়ে গেছে ওরা। কিন্তু আমি ডিউটি ফেলে চলে যেতে পারি না।' বাঁ দিকের লোকটা জানাল।

'মরে গেলেও নয়।' দ্বিতীয় জন দ্রুত মাথা নাড়ল।

'শাসিয়ে গেছে? কে শাসালো আপনাদের?'

অ্যাণ্টি পার্টি। তারাও যাচ্ছে। দলের মেম্বার ছয়জন। একজন মহিলা হল লিডার। কি জাঁহাবাজ মহিলা যে কি বলব। নিজে এসেছিল শাসাতে। এখানে তবু ঠিক আছে কিন্তু লাচেন ছাড়িয়ে গেলে তো আর আইনকানুন নেই। ভীষণ ইনসিকিওরড্ ফিল করছি।'

'খুব।' দ্বিতীয় লোকটি অসহায় চোখে তাকাল।

'আপনাদের সঙ্গে অস্ত্র নেই ?'

'না। পুলিশের চেয়ে বেশি কাজ করি মশাই কিন্তু একটা ভোজালি রাখার রাইট নেই। তাই বসন্তবাবুর কাছে ছুটে গিয়েছিলাম সকাল হতেই। তা উনি আপনার কাছে আসতে বললেন।'

'আপনাদের সঙ্গে স্লিপিং ব্যাগ আছে.?'

'কাল রাত্রে তো তাইতেই শুয়েছি আমরা। দম বন্ধ হয়ে যায়।'

'সেকি ! আপনারা চুঙথাঙে স্লিপিং ব্যাগে শুয়েছেন ?' অরিন্দম হেসে বলল।

'ট্রায়াল দিচ্ছিলাম। আমার নাম স্বদেশ ওর নাম বিদেশ। দুজনেই আপনার খুব ফ্যান।'

'ফ্যান শব্দটা কেমন যেন। ভক্ত, ভক্ত বলাই ভাল।' দ্বিতীয়জন হেসে বলল।

'আমার কোন ছবি আপনারা দেখেছেন ?' অরিন্দম ফেরার জন্যে পা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল।

লোক দুটো পরস্পরের দিকে তাকাল। উত্তর না পেয়ে অরিন্দম ঘুরে দাঁড়াতে প্রথমজন বলল, 'আমি ইতিহাসে খুব কম নম্বর পেতাম স্যার !'

'মানে ?' অরিন্দম হতভম্ব।

'কিছুতেই মনে রাখতে পারতাম না নামগুলো।' প্রথমজন মাথা নিচু করল। দ্বিতীয়জন মাথা নাড়ল।

চুঙথাঙ থেকে লাচেনে যাওয়া হবে না, লাবুঙ থেকে ইয়ামতাঙ, এই নিয়ে কিছুতেই একমতে আসতে পারছিল না বসন্ত এবং সহদেব। ওরা কথা বলছিল বাংলোর বারান্দায় বসে। দুপথেই সুবিধে অসুবিধে দুই আছে। কিন্তু লাচেন হয়ে গেলে সময় কম এবং পরিশ্রম বেশি হবে। দুই গোয়েন্দা খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে এদের কথাবার্তা মন দিয়ে শুনছিল। হঠাৎ পাকা জুলপি বলে উঠল, 'লাচেনই ভাল।'

বসন্ত একটু উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে কে কথা বলতে বলেছে ?'

লোকটা থমমত হয়ে জবাব দিল, 'ওরাও তো ওই পথে গেল, তাই।'

বসন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কারা গেল ?'

অরিন্দম চেয়ারে শরীর এলিয়ে চুপচাপ পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিল। এবার চোখ খুলল। বসন্তদের জানা উচিত কে বা কারা এগিয়ে যাচ্ছে। পাকা জুলপি বলল, 'বাঃ, আর একটা দল যাচ্ছে দুর্ঘটনার স্পটে। ওরা যদি ব্রিফকেস পেয়ে যায়— ।'

দ্বিতীয় গোয়েন্দা বলল, 'খালি হাতে ফিরলে বিল পাশ হবে না। আমার বারোটা।'

পাকা জুলপি বলল, 'অ্যাই চোপ ! শুধু তোর, আমার বারোটা বাজবে না ?'

অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা যে লাচেন হয়ে যাচ্ছে তা জানলেন কি করে ?'

পাকা জুলপি বলল, 'কাল বলতে শুনেছি ওদের কুলিদের। আমরা তো কনস্ট্যান্ট ওয়াচ রেখে যাচ্ছি ওদের ওপর। সেসব কথা ডিসক্লোজ করতে পারব না।'

এই সময় কল্পনা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সকালে তাকে বেশ তাজা দেখাচ্ছে। গরম জামাকাপড়ে নিজেকে চমৎকার মুড়ে নিয়ে সে দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'বসন্তদা, এই ব্যাপারটা নিয়ে এত ভাবছেন কেন ? যে পথে গেলে সময় কম হবে সেই পথে চলুন। কষ্ট হবে জেনেই এসেছি, তাই না ?'

সহদেব বলল, 'ম্যাডাম, আপনি যখন বলছেন তখন আর দ্বিধা করার কিছু নেই। তাছাড়া এতে আর একটা সমস্যার সমাধান হবে। কুলিদের নিয়ে এখানে ফিরতে হবে না। ঠিক আছে বসন্ত, লেটস মুভ।'

বসন্ত ঘড়ি দেখল। বারোটা বাজতে বেশি দেরি নেই। পাহাড়ে সন্ধ্যে নামে চারটের মধ্যে। পাহাড়ী পথে সন্ধের পর কেউ গাড়ি চালায় না। চুঙথাঙ থেকে লাচেনের যে দূরত্ব ম্যাপে পাওয়া যাচ্ছে তাতে জিপে বড়জোর ঘণ্টা চারেকই লাগবে রাস্তা ভাল থাকলে। বসন্ত অরিন্দমের দিকে তাকাল। এই মানুষটি তাকে সব কথা খুলে বলছে না বলে তার ধারণা। সে উঠে দাঁড়াল, 'তাহলে আপনারা আমাদের সঙ্গে যাবেনই ?'

জোড়া গোয়েন্দার একজন মাথা নাড়ল, 'আপনাদের আপত্তি না থাকলে।'

দ্বিতীয়জন সঙ্গে সঙ্গে জুড়ল, 'আমাদের আপত্তি নেই।'

বসন্ত বলল, 'বেশ, আপনারা শুধু আমাদের সঙ্গে যাবেন কিন্তু কোন রকম সুযোগ সুবিধে পাবেন না। খাবার এবং টেন্ট যদি নিজেদের সঙ্গে থাকে তাহলেই যাওয়ার কথা ভাবুন।'

জিপে উঠে কল্পনা আজ অনেক সহজ। হেসে বলল, 'জানেন, আমি কখনও এত ভয় পাইনি কাল রাত্রে যা পেয়েছিলাম।'

অরিন্দম বলল, 'বলছ ?'

'হ্যাঁ।' চোখ ছোট করে চেঁচিয়ে উঠল কল্পনা।

'যাক বাবা, আমার একটা ফাঁড়া কাটল।' অরিন্দম হেসে উঠল।

'মানে ?' কল্পনা অবাক হল।

'দরজা খুলে যদি আমাকে দেখতে তাহলে তো— !'

'যান, একদম বাজে কথা বলবেন না।'

'এখন তাই মনে হচ্ছে তোমার। কিন্তু জানো কল্পনা, আমার কপালে ঈশ্বর কি লিখেছিলেন তিনিই জানেন, কিন্তু দেখেছি ভুল বুঝতে মেয়েরা আমাকেই বেছে নেয়। এই যে এত গল্প আমার সম্পর্কে তৈরি হয়েছে, সেগুলো বিশ্বাস করতে তোমরা ভালও বাসো, কিন্তু তার সঙ্গে আমার কতটা সংযোগ তা নিয়ে কেউ চিন্তা করো না।'

কল্পনা কিছু বলতে গিয়েও মুখ নামিয়ে নিল। সেটা লক্ষ্য করেও অরিন্দম কিছু বলল না। গাড়িগুলো চেষ্টা করছে কিছুটা দ্রুত ওপরে উঠতে। সহদেবের ঘোষণামত লাচেনে বেসক্যাম্প হবে। অনন্তরা ওখানেই থেকে যাবে। গাড়ি যত ওপরে উঠছে তত বোঝা যাচ্ছে ঠান্ডার দাপট কতখানি। তবু এখনও হালকা নাই-লনের মশারির মত রোদ্দুর মাথার ওপর টাঙানো। দুপাশে পাহাড়, ঝিঁঝির ডাক এবং জল পড়ার শব্দ ছাড়া আর কোনো প্রাণের অস্তিত্ব নেই। অবশ্য যখনই দুরন্ত তিস্তার কাছাকাছি রাস্তা চলে যাচ্ছে তখনই ঝড়ের মত জলরাশির আছাড় খাওয়ার শব্দ কানে আসছে। এই পথে পাহাড়ী গ্রামের সংখ্যাও কম।

তিনটে নাগাদ ওরা যেখানে পৌঁছাল সেখানে কোন মানুষ থাকার কথা নয়, পাহাড়ের ছায়া গভীর হয়ে জেঁকে বসেছে পথের ওপর এবং চিৎকার করে জিপের ড্রাইভাররা একে একে ব্রেক কষে গাড়ি থামাল। নদীর ওপর কাঠের একটা সাঁকো। এমনিতেই সেটা খুব মজবুত ছিল না। কারণ এই পথে জিপ আসে কালেভদ্রে। বাস আজ পর্যন্ত আসার চেষ্টা করেনি। প্রথম জিপের ড্রাইভার ঠিকই লক্ষ্য করে-ছিল, সাঁকোর মাঝখানে কয়েকটা তক্তা খুলে রাখা হয়েছে। ঠিক গাড়ির চাকা যেখান দিয়ে যাবে সেখানেই শূন্যতা। অর্থাৎ কোন অবস্থায় একটা গাড়ি পার হতে পারবে না।

অরিন্দম চারপাশে তাকাল। ঝিঁঝি ডাকছে। ছায়া ঘন হচ্ছে। সাঁকোর নীচে

তীব্র স্রোতে জল নেমে যাচ্ছে। আর সাঁকোর ওপাশে পথটা বেঁকে উধাও হয়ে গেছে পাহাড়ের আড়ালে। সে এগিয়ে সাঁকোর ওপর পা রাখল। আজ এই পথে জিপ গেছে।

আর তখনই চিৎকার করে উঠল পাকা জুলপি, 'স্যাবোটাজ, এ স্যাবোটাজ!'

বসন্ত গলা তুলল, 'কি আজেবাজে বকছেন?'

'ওই দেখুন, ও পাশে, নদীর ওপারে পাথরের আড়ালে দুটো তক্তা দেখা যাচ্ছে।'

এই সময় ঠক্করকে দেখা গেল সাঁকোর ওপর উঠে যেতে। একটি মানুষ যেতে পারবে এমন পথ সাঁকোর ওপর রয়েছে। সাঁকো পেরিয়ে ওপারে গিয়ে ঠক্কর চার-পাশে তাকাল। তারপর পাথরটার দিকে এগিয়ে গেল। যারা ওখানে তক্তাগুলো রেখেছে তারা জানে খুব সহজে সেখানে পেঁছানো যাবে না। খানিকটা চেষ্টা করে ঠক্কর পেরিয়ে এল সাঁকো। অরিন্দমের সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় হিন্দীতে বলল, 'দড়ি থাকলে তবেই ওখানে নামা যাবে। বুঝতেই পারছেন ওগুলো না তুলতে পারলে আমাদের এখানেই আটকে থাকতে হবে।' বলে কয়েক পা হেঁটে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল, 'আর একটা কথা, ওই দুটো ক্লাউনকে আমার জিপ থেকে নেমে যেতে বলবেন এবার।' তারপর শিস দিতে দিতে চলে গেল পেছনে নিজের জিপের দিকে।

বসন্ত চাপা গলায় বলল, 'ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে।'

আর পাকা জুলপি প্রতিবাদ করে উঠল, 'একি। উনি একথা বললেন কেন? আমরা ক্লাউন? দুজন ভদ্রলোকের সম্পর্কে কেউ ও ভাষায় কথা বলে! আফটার অল আমরা সহযাত্রী। অরিন্দমবাবু, আপনি প্রটেস্ট করুন।'

অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কি ওকে বিরক্ত করেছিলেন?'

দ্বিতীয়জন জবাব দিল, 'না। আমরা ওর সঙ্গে গল্প করার চেষ্টা করছিলাম।'

'আর করবেন না।' অরিন্দম ঘুরে দাঁড়াল অনন্তর দিকে। প্রোডাকসনস ম্যানে-জার অনন্ত শীতের দাপটে বেশ কুঁকড়ে গেছে যদিও তার নাক চোখ ছাড়া শরীরের অংশ দেখা যাচ্ছে না। অরিন্দম বলল, 'অনন্ত এবার তুমি ভরসা।'

'আমি।' অনন্ত হতভম্ব।

'টালিগঞ্জের প্রোডাক্সনের মানুষ চিরদিন অসম্ভবকে সম্ভব করে।'

'তা করে। কিন্তু সেটা তো সমতলে। বুড়ো বয়সে ওখানে নামতে গিয়ে মাথা ভাঙবো নাকি? কারা খুলেছে বলুন তো?' অনন্ত কোমরে হাত রেখে ঝুঁকে

নদীর দিকে তাকাল।

বসন্ত ভেবে পাচ্ছিল না কি করবে। তাদের সঙ্গে বড় দড়ি নেই। যা আছে তা টুকরো টুকরো এবং জিনিসপত্র বাঁধার কাজে লেগে গেছে। কাঠের পাটাতন তুলে নিয়ে এসে লাগাতে গেলে তো পেরেক দরকার। আর এসব করতে রাত নেমে যাবে এখানে।

পাকা জুলপি যে কথাটা চেঁচিয়ে বলেছে সেটাই সত্যি বলে মনে হচ্ছে। কেউ তাদের ক্ষতি করতে চাইছে। কিন্তু তাতে তার কি লাভ?

সবাই মিলে আলোচনা করছে, যে যার নিজের মন্তব্য সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করছে কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। গ্যাংটক থেকে যে পোর্টাররা এসেছিল তারা হঠাৎ সক্রিয় হল। দেখা গেল ভোজালি নিয়ে তারা উঠে গেছে পাশের গাছে। সমস্ত পাহাড়ে পাহাড়ে গাছ কাটার শব্দ ছড়িয়ে পড়ল। শ্যাওলায় ভরা গাছে লোকগুলো বেশ ঝুঁকি নিয়ে উঠে ডাল কাটতে লাগল। আর ওদের চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছিল ঠক্কর। সমস্ত দলটা চুপ করে এদের কাজ দেখতে লাগল। পর্যাপ্ত গাছের ডাল কেটে ওরা সেগুলোকে নিয়ে এল সাঁকোর ওপর। তখন সূর্য পাহাড়ের ওপাশে, ছায়া আরও ঘন। ঠক্করের নির্দেশে ডালগুলো পর পর ফাঁকা সাঁকোর ওপর সাজিয়ে রাখছিল। প্রায় আধঘণ্টা পরিশ্রমের পর সাঁকোর ওপরে ডালগুলো তিন স্তরের পথ তৈরি করল। ঠক্কর অরিন্দমের সামনে এসে বলল, 'জিপ থেকে মালপত্র নামাতে বলুন। হালকা করে চালালে মনে হয় ওপাশে পৌঁছে যেতে পারবে।'

জিপের ড্রাইভাররা প্রথমে কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। তারা ভয় পাচ্ছিল যদি মাঝপথে যাওয়ার পরে ডালগুলো ভেঙে পড়ে তাহলে জিপ খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রথম জিপটার মালপত্র বেশি ছিল না। হঠাৎ ঠক্কর সেটায় উঠে বসল। ড্রাইভার ছুটে গিয়ে তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতেই ঠক্কর ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'দূরে দাঁড়িয়ে থাক। আমাকে আটকাতে চেষ্টা করলে তোমার লাশ নদীতে ভাসবে।' ড্রাইভার এমন থতমত হয়ে গেল যে আর এগোল না। মালপত্র নামিয়ে ঠক্কর জিপটাকে রাস্তার মাঝখানে নিয়ে এল। তারপর বেশ দ্রুত জিপ চালিয়ে সাঁকোর ওপর উঠে গেল। ডালগুলো মচমচ করছে, কোন কোনটা লাফিয়ে উঠল। কিন্তু ততক্ষণে ঠক্কর ওপাশে পৌঁছে গিয়েছে।

পোর্টাররা ভাঙা ডালগুলো সরিয়ে আবার নতুন শক্ত ডাল পেতে দিল। আর ঠক্কর একে একে সবকটা জিপ পার করে নিয়ে এল এপাশে। মালপাত্র এপারে এনে জিপে তুলতে সন্ধ্যা। কাজ শেষ করে ঠক্কর পৌঁছে গিয়েছে নিজের জায়গায়। ওর:

যাওয়ার দিকে তাকিয়ে অরিন্দম বসন্তকে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি এখনও ওকে অসহ্য বলে ভাবছ ?'

বসন্ত কাঁধ ঝাঁকাল। কিন্তু সহদেবের ইচ্ছে ছিল না এই অন্ধকারে গাড়ি চলুক। এখানেই ক্যাম্প খাটিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হচ্ছে তার।

কিন্তু ঠক্করের সাহসিকতায় সম্ভবত ড্রাইভারদের মানে লেগেছিল। তারা বলতে লাগল লাচেনে পেঁছাতে তাদের কোন অসুবিধে হবে না। বসন্ত এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

ঘন অন্ধকারে পাহাড়ী পথে যাওয়ার অভিজ্ঞতা কারোরই নেই। শুধু জিপের হেডলাইটের আলো সম্বল করে এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা। দুপাশের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এমন কি এক গাড়ির মানুষেরা নিজেদের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। যত সাবধানেই চালানো হোক যে কোন বাঁক নেওয়ার সময় দুর্ঘটনা ঘটা এখন অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা।

কাঁটা হয়ে বসেছিল কল্পনা। তার দুটো হাত জিপের শরীর আঁকড়ে ধরেছিল। ঠান্ডায় তার সমস্ত শরীরে কাঁপুনি আসছিল বারে বারে। পাশে বসা নির্লিপ্ত অরিন্দমের দিকে সে তাকাল। এই মানুষটি সম্পর্কে সে কি ভুল বুঝেছিল ? মাঝে মাঝে ধন্দ লাগছে তার। এতক্ষণ পাশে বসে থেকেও লোকটা একটুও ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেনি। সামনেই একটা বাঁক। হঠাৎ কল্পনার মনে হল জিপটা অনন্ত খাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে। সে অস্ফুট চিৎকার করে উঠতেই রাস্তাটা সোজা হল। অরিন্দম মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল ?'

'ভয় করছে খুব।' কল্পনা না বলে পারল না।

'চোখ বন্ধ করে থাক।' আন্তরিক গলায় বলল অরিন্দম। তারপর পায়ের কাছে রাখা ব্যাগ খুলে শাল বের করল। ঠান্ডা থেকে বাঁচবার জন্যে মাথায় স্কার্ফ বেঁধেছিল কল্পনা। শালটা ওর মাথা এবং কাঁধে ভাল করে মুড়ে দিয়ে অরিন্দম আবার বলল, 'চোখ খুলবে না।'

মিনিট দুয়েক কাঁটা হয়ে বসেছিল কল্পনা। অন্ধকারের আড়াল সুযোগসন্ধানীরা চিরকালই গ্রহণ করে। কিন্তু কিছুই হল না। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল অরিন্দম পাথরের মত বসে রয়েছে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বুক থেকে বেরিয়ে আসতে আসতেও আটকে গেল কল্পনার। অরিন্দম কি তাকে মেয়ে বলেই মনে করে না ? নইলে এই ঔদাসীন্য কোন পুরুষকে মানায় ? একমাত্র সন্ন্যাসী ছাড়া ?

ঘড়িতে রাত বেশি নয়, কিন্তু শেষদিকে রাস্তা সত্যিকারের খারাপ ছিল। গাড়ি লাফিয়েছে খুব, তার প্রতিক্রিয়া শরীরে ছড়িয়েছে। লাচেনে পৌঁছে মনে হল, এই অন্ধকারে কারো জেগে ওঠার সম্ভাবনা নেই। যে কয়েকটা ঘরবাড়ি এখানে দেখা যাচ্ছে তাতে কোন প্রাণী রয়েছে কিনা বোঝা মুশকিল। আলো জ্বলছে না কোথাও। অথচ সহদেবের খবর অনুযায়ী এখানেও একটা ডাকবাংলো থাকার কথা।

সমুদ্র থেকে প্রায় আট হাজার ফুট উচ্চতায় এই ছোট্ট গ্রামে রাত কাটাবার জন্যে তাঁবু খাটাতে হল। কথা ছিল এই লাচেন থেকেই বাকি পোর্টারদের পাওয়া যাবে। কিন্তু তারা আসবে সকাল হলে। সবাই যে সামনের ঘরগুলোতে থাকে এমন নয়। আশেপাশে দশ কিলোমিটার পথের মধ্যে পাহাড়ের খাঁজে যার ঘর সে-ও নিজেকে লাচেনের মানুষ বলে পরিচয় দেয়। মোটামুটি একটু পরিষ্কার জায়গা দেখে তাঁবু খাটানো হচ্ছিল। ছোট জেনারেটার এনেছে অনন্ত। সম্ভবত তার কল্যাণে এই প্রথম লাচেনে বিজলিবাতি জ্বলল। অবশ্য জায়গায় জায়গায় এর মধ্যেই আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে শরীর গরম করার ব্যবস্থা হয়েছে। অরিন্দমের মনে হল কোন বিদেশী ছবির দৃশ্য বলা যেতে পারত যদি জেনারেটারের শব্দ না হত। আর এই শব্দটাই স্থানীয় মানুষদের ঘুম থেকে তুলে এনেছে।

অনন্ত ছুটে এল তার কাছে। এখন তার নাকও দেখা যাচ্ছে না, 'দাদা, চা না কফি?'

অরিন্দম বলল, 'কেন এসব ঝামেলা করছ, রাতের খাবার করে ফেল।'

অনন্ত বলল, 'রাত তো বেশি হয়নি। রাতের খাবার চুঙথাঙ থেকে নিয়ে এসেছি। গরম করিয়ে দেব। আর আপনার তাঁবুটা ওই ওপাশে টাঙাতে বলেছি। কি খাবেন?'

অরিন্দম মাথা নাড়ল, 'আমার জন্যে ভেব না। তুমি ফিট আছ তো অনন্ত। তুমি না থাকলে টালিগঞ্জের হেভি লস হয়ে যাবে হে।'

অনন্ত খুব খুশি হল, 'গাড়ি থেকে নামবার পর মনে হচ্ছে এযাত্রায় বেঁচে গেলাম।'

অনন্ত চলে যাওয়ার পর অরিন্দম ঠক্করকে খুঁজছিল। আলো জ্বলে ওঠায় অন্ধকার যদিও খুব পাতলা হয়ে গেছে কিন্তু কোন মানুষকে শীতবস্ত্রের কল্যাণে চট করে ঠাওর করা যাচ্ছিল না। কিছু লোক তাঁবু খাটাচ্ছে। সহদেব তাদের নির্দেশ দিচ্ছে। কিছু লোক চায়ের আয়োজন করছে। বাকিরা বিভিন্ন অগ্নি-কুণ্ডের সামনে। এর মধ্যে ঠক্কর কোথায় তা বোঝা যাচ্ছে না। লোকটার কাছ থেকে

নকল স্যুটকেসটা সরিয়ে ফেললে কেমন হয় ! অন্ধকারে কোন খাদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেললে খুঁজে পাওয়া যাবে না। জিপের কাছে দাঁড়িয়ে অরিন্দম বেশ শীতার্ত বোধ করল। সে তার হাতব্যাগ থেকে ব্র্যান্ডির বোতলটা বের করল। যদিও পাহাড়ে মদ্যপান নিষেধ তবু ব্র্যান্ডিকে মদ বলতে এই মুহূর্তে তার বাধল।

তরল পদার্থটি শরীরে যেতেই শীত কমে গেল আচমকা। অরিন্দম বোতলটা বন্ধ করে পায়চারি করতে করতে পেছনদিকে চলে এল। বিক্রম ক্যামেরা নিয়ে এসেছে অথচ কখনও ওকে লেন্স ওপেন করতে দেখা গেল না। লোকটা এল কি জন্যে? একটা বড় পাথরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে অরিন্দম কল্পনার কথা ভাবল। তিরিশ না পেরিয়ে গিলে মেয়েদের শরীরে বসন্ত আসে না। ঝরনা মানে কখনই নদী নয়। যাদবপুরে যে মেয়ে পড়ছে তার মন এবং শরীরের নির্মাণ তো সবে শুরু। এই রকম মেয়েকে দেখলে এক ধরনের অপত্য স্নেহ ছাড়া তার মনে অন্য কিছুর উদয় হয় না। বেচারা কথাটা জানে না বলে সারাক্ষণ তার ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল। এখন যদি সহজ হয়!

স্যুটকেসটা পেতেই হবে। সকাল থেকে তার মনে হচ্ছে ওটা পাওয়া যাবে। যদি পাওয়া যায় তাহলে কিছু সমস্যা দেখা দেবে বটে কিন্তু হরিশ মল্লিক কোটি টাকা রোজগার করবে। এর মধ্যে ছবিটা নিয়ে এত প্রচার হয়ে গেছে যে সুপারহিট না হয়ে উপায় নেই। আর এক ঢোঁক গলায় ঢালল সে। শরীর এখন বেশ চাঙ্গা। কিন্তু সাঁকোটা ভাঙল কে? পাহাড়ে সাধারণত এই কান্ড কেউ করে না। যেভাবে পাটাতন সরানো হয়েছে তাতে স্পষ্ট, গাড়ি আসুক তা কাম্য ছিল না। এবং তারা জানত গাড়ি নিয়ে তারাই আসছে। মিসেস সেন এতটা প্রতিহিংসাপরায়ণ হচ্ছেন কেন? দুদলের আকাঙ্ক্ষিত জিনিস তো এক নয়। এইটেই তার বোধগম্য হচ্ছে না।

হঠাৎ একটা আর্তনাদ কানে আসতে অরিন্দম চমকে মুখ তুলল। সে বসে আছে দলটা থেকে বেশ কিছুটা দূরে। চিৎকারটা যেখানে চলছে সেখানে সবাই ছুটে গেল। একটু পরে দেখা গেল পাকা জুলপির সঙ্গীটিকে নিয়ে ওরা ফিরে এল। পাকা জুলপি এবার খুব চেঁচাচ্ছে। তার চেঁচানিতে বোঝা গেল ভুল করে তারা ঠক্করের স্যুটকেসে হাত দিয়ে ফেলেছিল বলে লোকটা ওইভাবে মোচড়াবে? আর একটু হলেই তো শরীর থেকে হাত খসে পড়ত। বসন্ত ওদের ঠান্ডা করতে চেষ্টা করছিল। দলের অনেকেই অবশ্য পাকা জুলপিকে সমর্থন করছিল। কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাজ তার গলা পাওয়া যাচ্ছে না, দেখাও।

আর এই সময় অরিন্দমের মনে হল তার ডানদিকে কিছু নড়েচড়ে উঠল। এই অঞ্চলে বন্যপশু আসে নাকি? সে চট করে নিজেকে সামলে নিল। পশু নয়, দুটো লোক এত সন্তর্পণে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন? লোক দুটো পায়ে পায়ে এগিয়ে এল সামনে। বোঝাই যাচ্ছে—অন্ধকারে পাথরের গায়ে অরিন্দম যে হেলান দিয়ে বসে থাকতে পারে তা ওদের কল্পনাতে নেই। এই লোক দুটো পাহাড়ী নয়। পাহাড়ী শহুরে শীতবস্ত্র পরে না।

মিনিট তিনেক পরে লোক দুটো ফিরল। যেন তাদের যেটা দেখার দরকার ছিল সেটা ফুরিয়েছে। হঠাৎ অরিন্দম উঠে দাঁড়াল। বোতলটাকে সঙ্গে নিয়ে সে নিঃশব্দে পা বাড়াল। লোক দুটো নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সে যে ওদের পেছনে রয়েছে তা খেয়ালই করছে না। অন্য হাতে রিভলভারটা দেখে নিল সে। কেন যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে সেই বোধ এই মুহূর্তে তার কাজ করছিল না। লোকদুটো একটা কুঁড়ে-ঘরের সামনে দাঁড়াল। তারপর ভেতরে ঢুকে গেল।

অরিন্দম সতর্ক পায়ে কুঁড়ে-ঘরের পেছনে চলে এল। দুটো মানুষ কথা বলছে। একজন বলল, 'আর দরকার নেই। তুমি ভোরবেলায় গিয়ে কাজটা সেরে এস।'

দ্বিতীয় গলা প্রশ্ন করল, 'ওই চিংড়িদের নিয়ে এত ভাবছেন কেন?'

প্রথম গলা জবাব দিল, 'প্রমাণ রাখতে চাই না। বড় সাহস বেড়ে যাচ্ছে। ভুল আমারই। বাকি দলটাকে নিয়ে আমি চিন্তা করি না।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'কিন্তু।'

'ওদের স্বাভাবিক মৃত্যু হবে।'

'আপনি এত নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে?'

'নিশ্চিত না হলে আমি এখানে আসতাম না। তুমি শুধু সিনেমার নায়কটিকে লক্ষ্য করে যেও। সেক্সপিয়ার বলেছেন মেয়েদের বিশ্বাস করো না।'

'আপনি—আপনি—এ কি বলছেন?'

'যা বললাম তা গিলে ফেল।'

কথা থেমে যাওয়ামাত্র অরিন্দম সরে এল। অনুসরণের সময় অন্ধকার প্রতিবন্ধক হয় না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছিল টর্চ সঙ্গে থাকলে ভাল হত। খানিকটা হেঁটে এসে অরিন্দম আর এক ঢোঁক ব্র্যাণ্ডি গলায় ঢালল। জল ছাড়া খেতে এখন কোন অসুবিধা হচ্ছে না। এই লোক দুটোর পরিচয় স্পষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু যে কাজটা ভোরবেলায় সেরে ফেলার হুকুম হল সেটা কি? কাউকে খতম করা? সেই খতম তালিকায় সে নেই এটা বোঝা যাচ্ছে। তাহলে ওই চিংড়িরা কারা? চিংড়ি?

হঠাৎ জোড়া গোয়েন্দাদের চেহারা মনে পড়ল ওর। জোড়া গোয়েন্দা এসেছে মিস্টার সেনের হয়ে ব্রিফকেস খুঁজতে। সেইটে পছন্দ হবে না একমাত্র মিসেস সেনের। কিন্তু এই লোকটি তো মিসেস সেনকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। কিন্তু সেটা জানান দিতে চায় না। সমস্ত হিসেব গুলিয়ে যাচ্ছিল তার। হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট্ট কাঠের বাংলোকে যেন অন্ধকার ফুঁড়ে তার সামনে উঠে আসতে দেখল সে। নিজের চোখ কচলালো। তার কি নেশা হয়েছে ?

কিন্তু কাঠের বাংলোটা তো সামনেই। আবছা মনে পড়ল এইটের কথাই সহদেব সেন শুনেছিল। অরিন্দমের মনে হল জায়গাটা নিরাপদ নয়। কারণ বাংলোর পেছনে মৃদু আলো জ্বলছে। ওটা যে ছোট্ট তাঁবু সেটা বুঝতে সময় লাগল। তাঁবুর ভেতর থেকে কথা ভেসে এল। তারপর একটা লোক বেরিয়ে এল সেখান থেকে। বেশ হেলে দুলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে বারান্দা পেরিয়ে দরজায় আঘাত করল। ভেতর থেকে মেয়েলি গলা ভেসে এল, 'কৌন ?'

'কফি মেমসাহেব।'

কয়েক সেকেন্ড পরে দরজা খুলে গেল। একটা মরা আলো বেরিয়ে এল বারান্দায়। দরজা থেকেই কফির পেয়ালা হাতবদল হল, 'ঠিক হ্যায়। তুম লোক শো যাও।'

'সাবনে নাইট গার্ড রাখনে বোলা থা।'

'ঠিক হ্যায়। বাট ডোণ্ট ডিস্টার্ব মি।' দরজা বন্ধ হয়ে গেলে লোকটা বাধ্য ছেলের মত নিচে নেমে চারপাশে তাকাল। তারপর এগিয়ে গিয়ে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে গেল। যেন কোন সিনেমার একটি দৃশ্য সামনে প্রদর্শিত হল। হয়তো ব্র্যান্ডির প্রতিক্রিয়াই অরিন্দমকে সাহসী করে তুলল। ব্র্যান্ডির বোতলটা মাটিতে ফেলে দিল সে। শব্দ হল আর সেই শব্দটাই তার সচেতনতাবোধ ফিরিয়ে আনল। তাঁবুর দিকে তাকাল অরিন্দম। বোতল পড়ার শব্দ কাউকে বাইরে টেনে আনেনি। সে বারান্দার দিকে তাকাল। তারার আলোয় কাঠামোটা আবছা দেখা যাচ্ছে। অরিন্দম রিভলভার বের করে সেটাকে তৈরি রাখল।

মিনিট পাঁচেক খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে তার মনে হচ্ছিল পেটে ব্র্যান্ডি থাকা সত্ত্বেও হাত-পা ঠান্ডায় অসাড় হয়ে আসছে। কিন্তু সময়টা নিতে হচ্ছিল, কারণ পরিস্থিতি না বুঝে এগিয়ে যেতে চাইছিল না সে।

যেন অন্ধকারের সঙ্গে মিশে মিশেই সে সিঁড়ির কাছে চলে এল। তারপর বারান্দায় উঠে এসে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়াল। কোথাও কোন শব্দ নেই।

সমস্ত বিশ্বচরাচর যেন এই মুহূর্তে অস্তিত্ব লুপ্ত করে রয়েছে।

পা ফেলা মাত্র বারান্দার কাঠে শব্দ হল। অরিন্দম নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর ধীরে ধীরে দরজায় টোকা দিল। প্রথমবার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। আশেপাশে তাকাল সে। দ্বিতীয়বারে ভেতর থেকে চাপা বিরক্তি ছিটকে এল, 'কোন?'

অরিন্দম জবাব দিল না। দরজাটা এবার একটু একটু করে খুলছে। পেছনে মরা আলো শীতবস্ত্রে জড়ানো শরীরটার প্রান্তরেখাগুলোকেই ধরেছে মাত্র। সামনে যে দাঁড়িয়ে তার মুখ ছায়াবৃতা। কিন্তু চকিতে হাত উঠে গেল মুখে, 'আপনি?'

'এলাম।'

যেন বিস্ময় এবং দ্বিধায় কিছুটা হতচকিত, অরিন্দম সুযোগটা নিল। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা শরীরটার পাশ ঘেঁষে ভেতরে ঢুকে বলল, 'একটু বসতে দিন, ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি।'

মিসেস সেনের মুখ চোখ ফ্যাকাশে। অরিন্দম এগিয়ে আসায় সামান্য সরে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন কোনমতে বলতে পারলেন, 'আপনার সাহস তো কম নয়!'

'সাহস? একটা বেড়ালও সিংহ হয়ে উঠবে আপনার সংস্পর্শে এলে। দরজাটা বন্ধ করুন মেমসাহেব, আমার একটু উত্তাপ চাই।' অরিন্দম নিভে আসা ফায়ার প্লেসের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। এবং তখনই মিসেস সেন বললেন, 'আপনাকে আমি এক মিনিট সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে বেরিয়ে না গেলে আপনার প্রাণের জন্যে আমি দায়ী থাকব না।'

দুটো হাত ফায়ারপ্লেসের আগুনের ওপর রেখে মুখ না ফিরিয়ে বলল অরিন্দম, 'দূর! হচ্ছে না।'

মিসেস সেন এবার অবাক হলেন, 'মানে?'

'উত্তাপ নেই। আচ্ছা বলুন, যার কিনা আগুন বুকে নিয়ে বসে থাকার কথা সে এমন মিইয়ে যদি যায় তাহলে চলে?' অরিন্দম পাশেই টুকরো কাঠ দেখতে পেল। সেগুলো গুঁজে দিতে দিতে বলল, 'ধোঁয়া হবে। তা হোক। যেখানে ধোঁয়া সেখানেই তো আগুন!'

'আপনি নিজেকে বড্ড বেশি বুদ্ধিমান ভাবছেন অরিন্দমবাবু!'

'তাই? অনেকদিন কেউ আমাকে উপদেশ দেয়নি, জানেন? দরজা বন্ধ করুন। বড্ড ঠাণ্ডা।'

'বেশ। আপনার সঙ্গে কথা বলা যাক।' মিসেস সেন দরজাটা ভেজিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আপনি আমার পেছনে কেন লেগেছেন? আমি আপনার এক্সপ্লানেশন

চাইছি।'

'দেখুন আমার মুকুটে এত পালক গোঁজা হয়েছে যে তার ভার সইতে পারছি না। আপনি আর যোগ করবেন না।' ফায়ারপ্লেসে ধোঁয়ার পর আগুন দেখে হাসি-মুখে মুখ ফেরাল অরিন্দম, 'আপনার পেছনে লাগছি শুনলে লোকে আর একটা গল্প তৈরি করবে। এতক্ষণে বেশ জমেছে আগুনটা। আপনার শীত লাগছে না?'

মিসেস সেন নিজের বিছানায় এসে বসলেন। ওঁর চোখ অরিন্দমের ওপর থেকে সরছিল না। তাই দেখে অরিন্দম বলল, 'আমার ওপর এত রেগে আছেন কেন বলুন তো?'

মিসেস সেনের ঠোঁট নড়ল, 'এই ঘরটাকে স্টুডিওর সেট বলে মনে করছেন নাকি?'

অরিন্দম সোজা হল, 'আপনার মত নায়িকা পেলে টালিগঞ্জ আর একটা রোমান্টিক জুটি পেত।'

এবার হতাশায় মাথা নাড়লেন মিসেস সেন। তাঁর রেশম-রেশম চুল ঝাঁকুনি খেয়ে মুখ ঢাকল। বাঁ হাতে অলস ভঙ্গিতে সেগুলোকে কপালের ওপর থেকে সরিয়ে তিনি বললেন, 'ইনফ্যাক্ট অ্যাকসিডেন্ট যেদিন হয়েছিল সেই দিন থেকেই আপনি আমাকে অনুসরণ করছেন। কেন?'

একটা সিগারেটের প্রয়োজন অনুভব করছিল অরিন্দম। মিসেস সেন যে ভঙ্গিতে বসে রয়েছেন তা তাকে আর একজনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। বাংলা ছবির সেই স্মরণীয়া নায়িকা কোনদিন তাকে ক্ষমা করবেন না। কিন্তু এঁর তাকানো, ঘাড় ঘোরানো, বসার ভঙ্গির মধ্যে তিনি কি করে মিশে আছেন? কোনরকম রক্তের সম্পর্ক আছে কিনা জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার। মিসেস সেনের প্রশ্ন কানে যাওয়ার পর সে চোখ বন্ধ করল। তারপর বলল, 'পুলিশকে খবর দিলেন কেন?'

'পুলিশ?' চমকে উঠলেন মিসেস সেন, 'কে খবর দিয়েছে?'

এবং তখনই খাটের পাশে ছোট টেবিলের ওপর রাখা বিদেশী সিগারেটের প্যাকেট তার চোখে পড়ল। এগিয়ে গিয়ে প্যাকেটটা তুলে নিয়ে সে সিগারেট বের করল। অলস হাতে লাইটার টিপে আগুন জ্বালাল। তারপর জবাব দিল, 'আপনি।'

'আমি? কি যা তা বলছেন?' চাপা গলায় চিৎকার করে উঠলেন মিসেস সেন।

'আপনি হোটেলে আমার কাছে রিভলভার চেয়েছিলেন। আপনি কি করে জানলেন ওটা আমার কাছে আছে, যদি আমার গতিবিধির ওপর আপনার নজর না

থাকতো ?' একেবারে সামনে চলে এল অরিন্দম।

'আপনি আমাদের একটু আগে পেঁছে গিয়েছিলেন কিউরিও শপে। যে আপনাকে খবর দিয়েছিল ওখানে পাওয়া যেতে পারে তার কাছে আমরাও খবর পেয়েছিলাম। রিভলভারের দরকারও ছিল। কিন্তু তখন ওদের কাছে ওই একটি অবশিষ্ট ছিল। এবং সেটা আপনার কাছে পেঁছে গেছে তা জানতে অসুবিধে হয়নি।'

'রিভলভারের দরকার পড়ল কেন ?'

'যে কারণে আপনার দরকার পড়েছে। থাকলে অন্তত এই ঘরে ঢোকার সাহস পেতেন না।'

'বুঝলাম। কিন্তু নিজে হোটেল থেকে উধাও হয়ে পুলিশকে খবর দিয়ে আপনার কি লাভ হল ?'

'আমি খবর দিইনি পুলিশকে।'

'তাই নাকি ? আপনি জানতেন না পুলিশ আমার ঘর সার্চ করেছে ?'

'হ্যাঁ। পরে। অনেক পরে। আমি রহস্য বুঝতে পারিনি।'

'আপনি সত্যি কথা বলছেন ?'

'হ্যাঁ। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ভার আপনার।'

অন্যমনস্ক হল অরিন্দম। মহিলা সত্যি কথা বলছেনই তা ধরে নেওয়ার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু ওঁর কথাগুলো যদি সত্যি হয় তাহলে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি নিশ্চয়ই আছে। অথবা এমনও হতে পারে যারা তাকে বিক্রি করেছিল তারাই পুলিশকে খবর দিয়েছে। হয়তো তাদের সঙ্গে পুলিশের যোগাযোগ আছে। অন্তত এই মুহূর্তে সত্যি ঘটনা জানার কোন প্রয়োজন নেই। হঠাৎ সে প্রসঙ্গ পালটাল। ধীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'এত কষ্ট করে আপনি আপনার স্বামীর হারানো ব্রিফকেস খুঁজতে কেন এলেন মিসেস সেন ?'

চমকে উঠলেন মহিলা। সোজা হয়ে বসলেন, 'এটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত বিষয়।'

'আমরা কি এতক্ষণ অনেক ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলিনি ?'

'বলেছি। কিন্তু—। বেশ। কিন্তু আমি ডিভোর্স চেয়েছিলাম।'

'আচ্ছা।'

'অতএব নিজেকে ওর স্ত্রী বলে ভাবতে পারছি না।'

'তা হতে পারে। এয়ারপোর্টে আপনি যখন আপনার সঙ্গীকে বলেছিলেন ব্রিফকেস না পাওয়া গেলে তার কোন আশা নেই তখন দ্বিতীয় পছন্দের অস্তিত্ব বুঝতে পারা যাচ্ছিল।'

'আপনি কিছুই বোঝেননি।'

'মানে? সেই ভদ্রলোক তো আপনার সঙ্গে এখানেও এসেছেন। আপনার দলবলের দেখাশোনার দায়িত্ব তো ওঁর ওপরে। কথাটা মিথ্যে?'

'না। এটুকু সত্যি। কিন্তু চ্যাটার্জীকে আমার দ্বিতীয় পছন্দ হিসেবে কখনও ভাবিনি।'

'কিন্তু তিনি সেই রকম আশা করছেন।'

'অনেকে তো অনেক কিছুই আশা করে।'

অরিন্দম মহিলার দিকে হতাশ ভঙ্গিতে তাকাল। এত নির্লিপ্ত হয়ে কথা বলছেন কিন্তু বরফের ছোঁয়া তো অস্বীকার করা যাচ্ছে না। সে পরিষ্কার বলল, 'আমি আপনাকে বুঝতে পারছি না।'

'সেটা আমার সমস্যা নয়।' মিসেস সেন উঠে দাঁড়ালেন, 'এবার আপনি আসতে পারেন। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'ব্রিফকেসে কি আছে মিসেস সেন?'

'সেটা আমার জানার বিষয়।'

'খুব দামী?'

'আপনি সীমা অতিক্রম করছেন।' হাত তুলে এবার দরজাটা দেখালেন মিসেস সেন। কয়েক পা সেদিকে এগিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল অরিন্দম, 'এখানে আসার পথে ব্রিজটাকে ভেঙে দিয়ে এসেছিলেন কেন? আপনি কি চাইছিলেন না আমরা আসি।'

'খুব সরল উত্তর। চ্যাটার্জী আমাকে বলেছিল আপনার অনাবশ্যক কৌতূহল আমাদের ঝামেলায় ফেলছে। তাছাড়া দুটো দল একসঙ্গে পাহাড়ে যাওয়ার অসুবিধে অনেক। আপনাদের দলে কিছু সন্দেহজনক মানুষ আছে।'

'যেমন?' কৌতূহলী হল অরিন্দম।

'এই ব্যাপারে খবরাখবর চ্যাটার্জী ভাল রাখে। ইচ্ছে করলে ওর সঙ্গে কথা বলতে পারেন।'

'সেই সন্দেহজনক মানুষদের দুজনকে কি আজ সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে?'

'সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে?'

'দল আপনার আর আপনি জানেন না?'

'আপনি কি করে জানলেন?'

'জেনেছি। তালিকায় কি আমার নাম আছে?'

'বিশ্বাস করুন অরিন্দমবাবু, আই নো নাথিং অ্যাবাউট দিস।' এগিয়ে এলেন মিসেস সেন। এবং তখনই বাইরে কারো গলা শোনা গেল। কেউ কাউকে ডাকছে। অরিন্দম ঠোঁট কামড়াল। তার চোখ মিসেস সেনের ওপর। ভদ্রমহিলা একটু চঞ্চল। এগিয়ে আসছে কণ্ঠস্বর, 'জামিল কোথায় ? ওকে বলেছিলাম আমার ওখানে আট-টার মধ্যে দেখা করতে। মদ খেয়ে পড়ে আছে নাকি ?'

'শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে।'

'ওকে তোল। আমি এখানে নেশা করার জন্যে ওকে নিয়ে আসিনি। ও আমার সঙ্গে যাবে।' নির্দেশ দিয়ে সম্ভবত বাংলোর দিকে এগিয়ে এল লোকটা। কারণ তারপরেই কাঠের সিঁড়িতে শব্দ হল। পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে দরজার দিকে। অরিন্দমের হাত চলে গেল রিভলভারের ওপর। তার আত্মরক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। পায়ের শব্দ কানে আসছে এবং নজর মহিলার মুখ থেকে সরাচ্ছে না। মিসেস সেন দাঁড়িয়ে আছেন পাথরের মূর্তির মত। এই সময় দরজায় নরম শব্দ বাজল। মিসেস সেন জবাব দিতে গিয়েও স্থির হলেন। তাঁর নজর এবার অরিন্দমের হাতের ওপর। চকিতে হাসি ফুটে উঠল সেখানে। দ্বিতীয়বার শব্দের সঙ্গে প্রশ্ন ভেসে এল, 'আপনি কি ঘুমিয়ে পড়েছেন ?' এবং তখনই অরিন্দমের খেয়াল হল দরজাটা শুধুই ভেজানো। জোরে ঠেললেই খুলে যাবে। সে নিঃশব্দে দেওয়ালের দিকে সরে যেতেই মিসেস সেন দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। সেই মুহূর্তে চাপ পড়তে দরজা খুলে গেল এবং বিস্মিত গলা শোনা গেল, 'এ কি দরজা খোলা।'

'কি ব্যাপার ?' মিসেস সেন দরজায় দাঁড়ালেন।

'তোমার খবর নিতে এসেছি। ঠিক আছ ?'

'বেঠিক থাকার কোন ঘটনা ঘটেছে ?'

'হ্যাঁ। ওরা ব্রিজ সারিয়ে এখানে চলে আসতে পেরেছে।'

'ও।'

'কি ব্যাপার ? এভাবে কথা বলছ কেন ?'

'আমি খুব টায়ার্ড চ্যাটার্জী। আমাকে এবার শুতে হবে।'

'আমাকে একটু ভেতরে ঢুকতে দেবে না ?'

'কেন ?'

'ওঃ, তোমাকে ঠিক বুঝতে পারি না। আমি যা করছি সব তোমার জন্যে, তবু।'

'না। যা করছ তা নিজের জন্যে। ওয়েল, চ্যাটার্জী, আমাকে ঘুমাতে দাও।'

'বেশ। যা চাও তাই হবে। আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস।' কথা-গুলো বলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল লোকটা, হঠাৎ মিসেস সেন প্রশ্ন করলেন, 'কোন দুজন লোককে আজ সরিয়ে ফেলার পরিকল্পনা করেছ?'

'ওঃ গড।' লোকটা যেন চমকে উঠল, 'তুমি জানলে কি করে?'

'এটা আমার প্রশ্নের উত্তর হল না।'

'না, মানে, যদি দরকার হয়, কিন্তু তোমাকে কে বলল?'

'জামিলকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন?'

'সামওয়ান মাস্ট হ্যাভ টোল্ড ইউ। তুমি কি আমার ওপর স্পাইং করছ?'

'এখনও উত্তরটা পাইনি।'

'বেশ। ওই দুটো গোয়েন্দাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই।'

'কেন? তুমি তো আমাকে বলেছ ওরা নির্বোধ।'

'নির্বোধদের বেঁচে থাকার অধিকার থাকে না।'

'ওদের অপরাধ? এতদিন তুমি বলে এসেছ ওরা টিনটিনের কমিকের টমসন অ্যান্ড থমসনের মত নির্বিষ। আমি এখনও ওদের চোখে দেখিনি। হঠাৎ কি দর-কার পড়ল?'

'উত্তরটা আমি তোমাকে পরে দেব।'

'কিন্তু ওটা আমার এখনই দরকার।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ সমস্ত ব্যাপারের একটা নিয়ম আছে। ফিল্মের প্রোডিউসার টাকা ঢালেন কিন্তু সেটে পরিচালকের কথাই তো শেষ কথা।'

'আমি খুন জখম এই মুহূর্তে চাইছি না।'

'বড় দেরি হয়ে গেছে। আমি আর ঝুঁকি নিতে পারি না।' জুতোর শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার আগে শেষবার থামল, 'দরজাটা বন্ধ করে শোও। সিদ্ধান্তটা শুধু একা আমি নিয়েছি ভাবলে ভুল করবে।' লোকটা নিচে নেমে আবার চিৎকার করল, 'জামিল।'

দ্বিতীয় লোকটা চাপা গলায় সাড়া দিতেই প্রশ্ন শোনা গেল, 'এখন ঠিক আছ?'

'জী হুজোর।'

তারপর সব চুপচাপ। বোঝা গেল ওরা চলে গেছে। মিসেস সেন ঘুরে দাঁড়ানো মাত্র অরিন্দম রিভলভারটাকে সরিয়ে ফেলল, 'এইভাবেই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তৈরি হয়

মিসেস সেন। প্রথম যেদিন এয়ারপোর্টে ওই ভদ্রলোককে দেখি সেদিন খুব নার্ভাস ছিলেন। আপনি ওকে ফেলে রেখে ফিরে যেতে পেরেছিলেন। এখন পরিস্থিতি উল্টো হয়ে গেছে।'

'তার মানে?'

'এখন প্রয়োজন বোধ করলে উনি আপনাকে ফেলে এগিয়ে যাবেন।'

চাপা স্বরে যে হাসিটা উঠল তার কোন তুলনা অরিন্দম জানে না। অবাধ্য চুল সরিয়ে দিতে দিতে দরজা ভেজিয়ে বিছানার কাছে চলে এলেন মিসেস সেন। অরিন্দম লক্ষ্য করল ভদ্রমহিলা ইচ্ছে করেই দরজা বন্ধ করছেন না। সিগারেট ধরিয়ে মিসেস সেন স্বাভাবিক ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'অরিন্দমবাবু, আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর সমস্ত কড়া ড্রাগের চেয়ে বেশি কার্যকর হল আকাঙ্ক্ষিত সুন্দরী মহিলা। হি ইজ আফটার মি। আমি যতক্ষণ ওকে করুণার দান না দেব ততক্ষণ ও ফোঁস-ফোঁস করতে পারে, বাট মাথা নিচু করবেই। আমি জানি একবার পেয়ে গেলেই ও আমাকে ছুঁড়ে ফেলতে পারে। আমি পুরুষদের স্বভাব জানি। দেখা হবে অরিন্দম-বাবু, আপনার সঙ্গে দেখা হবে। এখন আপনি যদি চান তাহলে লোক দুটোকে সতর্ক করে দিন।'

অরিন্দম মাথা ঝাঁকাল। তারপর ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজাটা নিঃশব্দে খুলে চারপাশে তাকাল। ফগ্-এ ঢেকে যাচ্ছে লাচেন। আকাশের তারাগুলো বিবর্ণ। সে মুখ ফেরাল। মিসেস সেন একদৃষ্টে চেয়েছিলেন। হঠাৎ বললেন, 'আপনি তো প্রতিবাদ করলেন না?'

ঠাণ্ডা আবার শরীরে ব্লেড ঘষছে, 'কোন বিষয়ে?'

'সুন্দরী মহিলাদের সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিলাম তা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা।'

চোখে চোখ রাখল অরিন্দম। এক মুহূর্ত, তারপর বলল 'আমি অন্ধ নই।'

ধীরে ধীরে মাথা দোলালেন মিসেস সেন। তারপর বললেন, 'আপনার মুখে এই স্তুতিটুকু শুনব বলে তখন ধরিয়ে দিলাম না! গুডনাইট।'

ক্যাম্পে হৈচৈ পড়ে গেল অরিন্দম ফেরার পর। সবাই ছুটে এসেছে ওকে দেখতে। এমন কি ঠক্কর পর্যন্ত শীতল ভঙ্গিতে এক নজর দেখে গেল। বসন্ত বলল, 'কোথায় গিয়েছিলেন বুঝতে পারছি না। চারধারে খুঁজেছি। অন্ধকারে কোথায় যাব তাও বুঝতে পারছি না। বিদেশ বিভুঁই, এইভাবে না বলে হুট করে চলে যেতে হয়?'

অরিন্দম অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসেছিল। পারলে সে আগুনের ভেতরে ঢুকে যেত। ম্যানেজার অনন্ত এক গ্লাস গরম চা নিয়ে এল সেই সময়, 'খেয়ে নিন। গরম হয়ে যাবেন।'

আগুনের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অরিন্দম বলল, 'চা চলবে না অনন্ত।'

'সে-ব্যবস্থাও আছে, তবে আপনার স্ট্যান্ডার্ড—।' অনন্ত দ্বিধায় পড়ল যেন।

বসন্ত এবার মৃদু প্রতিবাদ করল, 'না না অনন্তদা, এত হাই অল্টিচুডে ওসব একদম করবেন না। সহদেব তো নিষেধ করেছে, শোনেন নি?'

অনন্ত বলল, 'একটু আধটু খেলে যদি শরীর গরম হয় তাহলে কোন দোষ নেই।'

ক্যামেরাম্যান বিক্রম সেন জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় গিয়েছিলেন দাদা?'

অরিন্দম মুখ ফিরিয়ে ছেলেটাকে দেখল। তারপর বলল, 'চরতে।'

একথার পর সবাই বুঝে গেল অরিন্দম চাইছে না ও বিষয়ে কথা বলতে। যে যার টেণ্টে ফিরে যাচ্ছিল তখন। কল্পনা দাঁড়িয়েছিল। আগুনের ওপাশে। পোশাকের কারণে ওকে ছেলে না মেয়ে ঠাওর করা যাচ্ছে না। শুধু নাক ঠোঁট খোলা বেচারার। বাঙলা ছবির নায়িকাদের অবস্থা এখন এই রকম। বসন্ত ছাড়া কেউ পাশে নেই। কল্পনা এগিয়ে এল, 'কি হয়েছে?'

'ওঃ, তাই বল। গলা না শুনলে তোমাকে মেয়ে বলে বুঝতেই পারতাম না।'

'রসিকতা রাখুন। এইভাবে না বলে যেতে হয়? যদি অ্যাকসিডেণ্ট হত? ঠাণ্ডাটা কি রকম বুঝতে পারছেন না? ঠাণ্ডা যদি লেগে যায় একবার।' কল্পনা শাসন করছিল।

অরিন্দম চকিতে বসন্তর দিকে তাকিয়ে কল্পনাকে এড়িয়ে চোখ টিপল। তারপর বলল, 'ঠিক ধরেছ। সেই কারণেই তো একটু উত্তাপের সন্ধানে বেরিয়েছিলাম।' কথাটা কানে যাওয়ামাত্র সোজা হয়ে গেল কল্পনা। কোন কথা না বলে হনহনিয়ে চলে গেল নিজের তাঁবুর দিকে।

বসন্ত বলল, 'চটেছে। কিন্তু কোন ইনফর্মেশন পেলেন?'

'নাঃ।' শরীরটা এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে।

'আসার পথে ব্রিজটা যারা ভেঙে এসেছে তারা নিশ্চয়ই আমাদের পছন্দ করছে না। আমার ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। আমরা এসেছি নিজেদের প্রয়োজনে, কারোর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। গায়ে পড়ে কেন ঝামেলা পাকাচ্ছে কে জানে।' বসন্ত বলল।

অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'প্রত্যেকের শোওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে ?'

'হ্যাঁ। খেয়েও নিয়েছে সবাই। এই ঠান্ডায় তো কিছু করার নেই।'

এই সময় অনন্ত খাবার নিয়ে এল, 'এখানেই বসে খেয়ে নিন দাদা। এখনও গরম আছে।'

খিদে পেয়েছিল। অরিন্দম আর আপত্তি করল না। খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার টেন্ট ?'

'ওই ওপাশে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে। জিনিসপত্র সব ঢুকিয়ে দিয়েছি।' অনন্ত জানাল।

'বসন্ত, তুমি খেয়েছ ?'

'না দাদা। পেটটা ভাল নেই। আজ মিল স্কিপ করব।'

'পাহারাদারির কি ব্যবস্থা করেছ ?'

'পাহারাদারি ?'

'মানুষের ভয় না পাও পাহাড়ী জন্তুরা তো নেমে আসতে পারে।'

'লোকাল লোক বলল সেরকম কোন ভয় নেই। আমরা খোঁজ নিয়েছি দাদা।'

খাওয়া শেষ হলে আবার চা নিয়ে এল অনন্ত। এবার তাকে ধন্যবাদ দিল অরিন্দম। জলের বদলে এখন চা অমৃতের মত। ফিল্মের প্রোডাকশনস ম্যানেজার না হলে এইভাবে চা আসতো না। অনন্ত চলে গেলে বসন্তকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'গোয়েন্দা দুজন কোথায় ?'

বসন্ত অন্যমনস্ক ছিল। প্রশ্নটা বুঝে বলল, 'ওরা একটা টেণ্টেই দুজন আছে। আপনার টেন্টের পাশেই। কেন, কিছু হয়েছে ?'

'হয়নি। হতে কতক্ষণ। তুমি রাত্রে একটু সজাগ হয়ে শুয়ো। আর আগুনগুলো যাতে না নেভে তার ব্যবস্থা করো।' অরিন্দম আর দাঁড়াল না। সোজা এগিয়ে গেল অনন্তর দেখিয়ে দেওয়া তাঁবুর দিকে। পাশেরটা থেকে এখনই নাক ডাকার আওয়াজ ভেসে আসছে। নিজের তাঁবুর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে অবাক হল সে। একটা ছোট্ট হ্যারিকেন জ্বলছে। ওরা যে হ্যামকের ব্যবস্থা করেছে তা সে জানতো না। হ্যামকে তার স্লিপিং ব্যাগ পাতা। জিনিসপত্র একপাশে। কিন্তু বসার জায়গা নেই। না থাক। অরিন্দম সিঙ্গল তাঁবুটা দেখে খুশিই হল। হ্যামকে কোনদিন শোয়নি। স্লিপিং ব্যাগে শোওয়ার অভিজ্ঞতা শ্যুটিং-এর সময় হয়েছে। বড্ড ক্লান্তি লাগছে এই মুহূর্তে। অরিন্দমের ইচ্ছে করছিল ব্যাগের ভেতর ঢুকে যেতে। কিন্তু লোক দুটোকে সতর্ক করে দেওয়া দরকার। কোনভাবেই দুটো

মানুষকে খুন হতে দেওয়া চলতে পারে না।

সে দরজার দিকে তাকিয়ে নিয়ে রিভলভারটাকে তৈরি করল। এবং তখনই দরজায় শব্দ হল। কেউ যেন খোলার চেষ্টা করছে। এখনও তো ক্যাম্পের অনেকে জেগে রয়েছে। মেমসাহেবের সঙ্গী নিশ্চয়ই এত সাহসী হবে না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কে ওখানে ?'

একটু নীরবতা, তারপরে কল্পনার গলা শোনা গেল, 'ভেতরে আসতে পারি ?'

এই প্রথম মেয়েটা ওকে অবাক করল। সে এগিয়ে গিয়ে ফাঁস খুলে পর্দাটা সরিয়ে দিতেই কল্পনা ঢুকে পড়ল। মেয়েটা খুব স্বাভাবিক নয়। ভীত বলেই সতর্ক ভাব চোখে। অরিন্দম হেসে বলল, 'বসার কোন ব্যবস্থা আমার টেন্টে নেই।'

'বসতে আসিনি আমি। তখন ওভাবে অপমান করলেন কেন আমাকে ?'

'অপমান ?'

'নিশ্চয়ই ? আপনি সত্যি উত্তপ্ত হতে গিয়েছিলেন ?'

'তুমি ভুল শোননি।'

'ছিঃ। আপনি তাহলে সত্যি এত নীচ। একটা দিন মেয়েদের সঙ্গ না পেলে আপনার চলে না। আপনার সম্পর্কে যা শুনেছি তার সব সত্যি ? নীতার ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখেছি। এখানেও আপনি লোক্যাল পাহাড়ী মেয়ের খোঁজ পেয়ে গেলেন ?' ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলাল কল্পনা। শেষের দিকে ওর গলায় বাষ্প মিশল যদিও তা শুরু হয়েছিল ঘেন্না দিয়ে। অরিন্দম হাসল, 'তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন ?'

'কেন ? এটা যে ভুল তা ভাবতে আমার ভাল লাগছিল, তাই।' ফিরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল কল্পনা। অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'এইটুকু বলার জন্যে লুকিয়ে এলে ?'

'আমি লুকিয়ে এসে দেখছি ভালই করেছি।'

'দাঁড়াও। আমি কাউকে সচরাচর কৈফিয়ত দিই না। অবিশ্বাস নিয়ে কাউকে যাচাই করো না কোনদিন, তাহলে নিজেই ঠকবে। রুচি যাদের সর্বদাই নিম্নগামী আমি তাদের দলে নই।'

কথাটা শুনে যেন ফাঁপরে পড়ল মেয়েটা। বলল, 'কিন্তু আপনি, আপনি নিজেই তো বললেন।'

অরিন্দম এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত রাখল, 'তুমি সত্যি ছেলেমানুষ কল্পনা। যাও, শুয়ে পড়। একা যেতে পারবে, না এগিয়ে দেব ?'

কল্পনা কোন কথা বলল না। সে পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল। অরিন্দম বলল, 'এবার আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করি। এত ঘৃণ্য নীচ লোক জেনেও তুমি একা আমার টেন্টে এলে কেন ?'

এবার নড়ে উঠল কল্পনা। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'জানি না।' বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শাসন করল অরিন্দম, দিস ইজ নট ডান। এখন মেয়েটা তার কাছে স্পষ্ট। আর নয়। এখনই ব্যাপারটাকে থামিয়ে দেওয়া দরকার। হৃদয়ের গতি বড় বিচিত্র। তার আজও বোঝা হল না। কিন্তু তার জন্যে মেয়েটি ক্ষতিগ্রস্ত হোক এটা সে চায় না। হৃদয় যাদের সমস্ত সত্তা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের সে এড়িয়ে চলবেই।

বাইরে বেরিয়ে এল অরিন্দম। আগুনের শিখাগুলো এর মধ্যে কমে এসেছে। কল্পনাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। চারধার চুপচাপ। ঠান্ডা এবার আরও মারাত্মক। সে কয়েক পা ফেলে পাশের তাঁবুর সামনে দাঁড়াল। ওরা কি করে জানবে ঠিক কোন তাঁবুতে গোয়েন্দা দুটো শুয়ে আছে। লোক দুটো কি ইতিমধ্যে ওদের সম্পর্কে কোন গোপন তথ্য জেনে ফেলেছে। না মিস্টার সেনের প্রতিনিধি বলেই খতম তালিকায় ওদের নাম উঠেছে ? অরিন্দম তাঁবুর কোন দরজা দেখতে পেল না। নিচের দিকে গুটিয়ে রাখা অংশ তুলে তবে ভেতরে ঢুকতে হয়। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম দামী এবং হত্যাকারীর পক্ষে বেশ সুবিধেজনক। ভেতরে ঢুকল অরিন্দম। ডাকাডাকি করে অন্যদের ঘুম ভাঙানোর কোন কারণ খুঁজে পায়নি সে।

ভেতরে একটা কুপি জ্বলছে একপাশে। এটা ঠিক নয়। গ্যাস জমতে পারে। সে স্লিপিং ব্যাগ দুটোর দিকে এগিয়ে গেল। এবং হালকা অন্ধকারে সে একটা ব্যাগের মাথার পাশে কালচে বস্তু দেখতে পেল। লোক দুটো ঘুমোচ্ছে নাক ডাকিয়ে। বস্তুটি কি তা দেখার জন্যে ঝুঁকে দাঁড়াতেই সে উইগটাকে চিনতে পারল। আঙুলের ডগায় সেটাকে মুখের কাছে আনতে পাকা জুলপি দেখতে পেল। লোকটা উইগ পরে কেন ?

গায়ে হাত দিয়ে কয়েকবার ঝাঁকুনি দেবার পর লোকটার ঘুম ভাঙল। সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড়িয়ে উঠে বসতেই অরিন্দম চমকে উঠল। লোকটার মাথার তিন-চতুর্থ ভাগে একটিও চুল নেই। পিটপিট করে তাকাচ্ছে এখন। বোঝাই যাচ্ছে খুব হত-ভম্ব হয়ে পড়েছে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাল। সে এখনও ঘুমাচ্ছে। বেচারা বেচারা মুখে বলল, 'টাক ঢাকতে পারি। দিয়ে দিন।'

অরিন্দম সেটা দিয়ে দিতে প্রথমে উল্টো করে তারপর সঠিকভাবে পরল লোকটা। পরে বলল, 'বলুন, কী দরকার।' তারপর অরিন্দমের দৃষ্টি দেখে সঙ্গীর দিকে তাকাল, 'ওয়ার্থলেস। ঘুমালে মরা হয়ে যায়। কিন্তু জেগে থাকলে খুব এফেক্টিভ। আমরা অনেক দিনের বন্ধু।'

'এত রাত্রে না জানিয়ে আমি আপনাদের টেণ্টে এসেছি বলে কিছু ভাবছেন না ?'

'না। নিশ্চয়ই এমন কিছু দরকার পড়েছে যে আসতে বাধ্য হয়েছেন।'

লোকটা কতখানি বুদ্ধিমান ঠাওর করতে পারল না অরিন্দম। মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক ধরেছেন। আপনি চ্যাটার্জী বলে কাউকে জানেন ?'

কুপির আলোয় লোকটির মুখ স্পষ্ট না দেখা গেলেও মনে হল একটা ছায়া সরে গেল। তারপর হেসে বলল, 'এটা একটা উদ্ভট রসিকতা হয়ে যাচ্ছে না ? রাত দুপুরে ঘুম ভাঙিয়ে প্রশ্ন করছেন চ্যাটার্জী বলে কাউকে চিনি কিনা! আরে মশাই, পশ্চিমবাংলায় দেড় কোটি চ্যাটার্জী থাকতে পারেন।'

এই সময় অরিন্দমের মনে হল বাইরে কেউ চিৎকার করে কাউকে কিছু বলল। আততায়ী জানান দিয়ে আসে না। কিন্তু এই লোকটির সঙ্গে এরকম ধোঁয়াটে কথা-বার্তা বলে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। সে বলল, 'দেখুন মশাই, আমার প্রস্তাবে বসন্ত আপনাকে দলে নিয়েছে। যদিও আপনি আপনার ক্লায়েণ্টের যে গল্প শুনিয়েছেন তা আমি একটুও বিশ্বাস করিনি। আমার শুধু মনে হয়েছিল অ্যাকসিডেণ্টের স্পটে যাওয়ার ব্যাপারে আপনি সিরিয়াস এবং এভাবে গেলে মারা পড়বেন তাই আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন। কিন্তু আমি এখন স্থির নিশ্চিত যে আপনি আপনার পরিচয় গোপন করেছেন। এ ব্যাপারে আপনার কিছু বলার আছে ?'

লোকটি মুখ ঘুরিয়ে তার ঘুমন্ত সঙ্গীর দিকে তাকাল। শীত এবং স্লিপিং ব্যাগ ওকে ঘুমের জগৎ থেকে সহজে ফিরিয়ে আনবে বলে মনে হচ্ছে না। লোকটি নিচু স্বরে বলল, 'হঠাৎ আপনার মনে এই রকম ভাবনা কি করে এল বুঝতে পারছি না।'

কথাটা বলেই ফেলল অরিন্দম, 'আপনারা আজ রাত্রে খুন হতে যাচ্ছেন।'

'মানে ?' লোকটার চোখ বড় হয়ে উঠল। যেন সামনেই সে যম দেখছে।

'খুব সহজ কথা। আপনাদের দু'জনকে আজ রাত্রেই খুন করে ফেলার ব্যবস্থা হয়েছে। এবং এই রকম জায়গায় যদি খুন হন তাহলে অপরাধীর ধরা পড়ার কোন

সম্ভাবনা নেই। কারণ পুলিশ এ তল্লাটে আসে বলে মনে হয় না।' লোকটির বিস্ময় যেন বেড়ে যাচ্ছিল। একবার ঠোঁট চাটল সে। তারপর জিজ্ঞাসা করল 'আপনি কি করে জানলেন?' ওর গলার স্বর পাল্টে গিয়েছে। অরিন্দম বলল, 'সেটা আপনার না জানলেও চলবে। যদি আপনি নিজের পরিচয়ে এখানে এসে থাকেন তাহলে এখানেই থাকতে পারেন। খুনীরা অত বড় ভুল নাও করতে পারে। কিন্তু যদি আপনি এজেন্সির লোক না হন, তাহলে এই মুহূর্তেই গোপনে তাঁবু বদল করা দরকার। যা ভাল মনে করবেন তাই করুন। আমি আপনাকে শুধু সতর্ক করে দিয়ে গেলাম।'

অরিন্দম সোজা হয়ে দাঁড়াল। তাঁবুর ভেতরেও ঠাণ্ডা সহ্য করা যাচ্ছে না। যদিও তার শরীরে এখন যে পোশাক তা কলকাতায় বসে কখনই চিন্তা করতে পারত না। তাকে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে লোকটি সরু গলায় বলে উঠল, 'জাস্ট এ মিনিট স্যার।'

অরিন্দম ঘুরে তাকাতে লোকটি আবার ঠোঁট চাটল, 'আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন না।'

'বেঁচে থাকার ইচ্ছে না থাকলে সেইটেই ভাবতে পারেন।' অরিন্দম আর দাঁড়াল না। তাঁবুর প্রান্তভাগ তুলে বাইরে বেরিয়ে এল। আকাশে মেঘ থাকলে নাকি ঠাণ্ডা কম হয়। এখন একটি তারাও দেখা যাচ্ছে না। এমন আলকাতরার মত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতেও ভয় করে। আগুনের কুণ্ডগুলো প্রায় নিভে গেছে। মাঝে মাঝে বাতাসের স্পর্শে কাঠগুলোর শরীর ঢুকে যাওয়া আগুন চোখ মেলছে মাত্র। কোন তাঁবু থেকেই এখন শব্দ আসছে না। অরিন্দম পেছনে পায়ের শব্দ পেতেই দেখল জোড়া গোয়েন্দা আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে স্লিপিং ব্যাগ বগলে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসছে। অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত না থাকায় ওরা অরিন্দমকেও লক্ষ করল না। এপাশ ওপাশ তাকিয়ে লোক দুটো এগিয়ে গেল অরিন্দমের তাঁবুর দিকে। কিন্তু সঙ্গীটিকে দেখে এখন কিছুতেই সবে-জেগে-ওঠা মানুষ বলে মনে হল না। ওকে ডাকাডাকি করতেও তো সে শোনেনি। তার মানে সঙ্গীটি এতক্ষণ ঘাপটি মেরে পড়েছিল। শয়তান আর কাকে বলে।

লোক দুটো অরিন্দমের তাঁবুর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। তারপর নিজের নামটাকে উচ্চারিত হতে শুনল সে। দুবার। তৃতীয়বারের জন্যে অপেক্ষা না করে ওরা ভেতরে ঢুকে পড়ল। অরিন্দম কিছুতেই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছিল না। এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে গেছে ওরা নাম ভাঁড়িয়ে এখানে এসেছে। এবং পরিচয় গোপন

করার জন্যেই লোকটা মাথার টাক উইগ দিয়ে ঢেকেছে। কিন্তু এখন যদি ওদের নিয়ে ব্যস্ত হতে হয় তাহলে পরের নাটকটা চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু খোলা আকাশের নিচে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকলে আর দেখতে হবে না। অরিন্দম ঘাড় ঘুরিয়ে ওপাশের তাঁবুটার দিকে তাকাল। ওই তাঁবু থেকে ইচ্ছে করলে এই তাঁবু দুটো পরিষ্কার লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু সেটা করতে হলেও তাঁবুর দরজা খুলে বসে থাকতে হয়। নাঃ, আজ রাত্রে যখন ঘুমের কোন সম্ভাবনা নেই তখন নিজের তাঁবুতে ফিরে যাওয়াই ভাল।

লোক দুটো বসে আছে স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে পা ঢুকিয়ে। ব্যাগ দুটো পাতা হয়েছে মাটির ওপরেই। স্লিপিং ব্যাগ কি নিমোনিয়া থেকে বাঁচাবে ? কে জানে। অরিন্দম ঢোকামাত্র টাকমাথা বলল, 'ইয়ে মানে, এখানেই চলে এলাম। আপনার কি খুব অসুবিধে হবে ?'

অরিন্দম বলল, 'না। তবে আপনাদের জেগে থাকতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিল লোকটা, 'অবশ্যই। ওই কথা শোনার পর কি আর কারো ঘুম আসে ? আপনি শুয়ে পড়ুন, আমরা পাহারা দিচ্ছি।'

'থ্যাংকস। ঘুম এলেও দয়া করে জেগে থাকবেন কারণ আমি নাক ডাকা সহ্য করতে পারি না।' ঠাণ্ডা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যেবেলায় ব্রাণ্ডি খেয়েছিল বলে যে উত্তাপ জমেছিল তার চিহ্ন কোথাও নেই। মদের জন্যে আকর্ষণ বোধ করল সে। এই সময় দ্বিতীয় লোকটা উঠে এল সামনে। তার হাতে একটা কার্ড। সেটা সামনে এগিয়ে ধরে বলল, 'এই দেখুন আমার আই ডি। আপনি আমাকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন।'

অরিন্দম কার্ডটা নিয়ে আলোর কাছে গেল। প্রাইভেট ডিটেকটিভ সংস্থার নাম, লোকটার নাম, ছবি এবং স্বীকৃতিচিহ্ন রয়েছে। অর্থাৎ এই কার্ডটি যদি জাল না হয়, তাহলে ভদ্রলোক গোয়েন্দা।

অরিন্দম চটপট জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি একটু অদ্ভুত আচরণ করছেন না না কি ?'

'হ্যাঁ। ঠিকই।' লোকটা যেন আচম্বিতে পাল্টে গেল, 'আমাকে এইরকম আচরণ করতে বলা হয়েছে।'

'মানে ?' বিস্মিত হল অরিন্দম।

'একটু ক্যাবলা, হাবাগোবা নয় যদিও, এখন একটা চরিত্র হয়ে আছি আমি।'

'হঠাৎ নিজেকে প্রকাশ করলেন কেন ?'

'আপনি যখন খবরটা জানালেন যে আজ রাত্রে আমাদের হত্যা করা হতে পারে তখন মনে হল ইটস্ এনাফ। ক'দিন থেকে আমারও সন্দেহ হচ্ছিল এই রকম একটা কান্ড হতে পারে।'

'সন্দেহটা কেন হল ?'

'আই অ্যাম সরি। সেটা বলা আমার পক্ষে রীতিবিরুদ্ধ হয়ে যাবে।' দ্বিতীয় লোকটি মাথা নাড়তে অরিন্দম আর প্রসঙ্গ বাড়াতে চাইল না। সে টাকমাথার দিকে তাকাল একবার। খুব নার্ভাস দেখাচ্ছে ভদ্রলোককে। হঠাৎ টাকমাথা বলল, 'ওদের সঙ্গে পেশাদার খুনী আছে। আমরা কি এই টেণ্টে নিরাপদ ?'

অরিন্দম উত্তর দিল, 'যদি এখানে খোঁজ নিতে না আসে তাহলেই নিরাপদ। কিন্তু আপনি তো আপনার কার্ড দেখালেন না ?'

'আমার কোন কার্ড নেই।' সরল গলায় বলার চেষ্টা করল লোকটা।

'তার মানে আপনি কোন গোয়েন্দা সংস্থায় চাকরি করেন না ?'

প্রশ্নটির জবাব পাওয়া গেল না। ভদ্রলোক অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রইলেন। অরিন্দম আচমকা জিজ্ঞাসা করল, 'ওদের সঙ্গে যে পেশাদার খুনী আছে বলে জানেন, এই ওরা কারা ?'

লোকটি হাসল এবার। খুব ম্লান হাসি। তারপর বলল, 'সেটা আপনিও জানেন।'

'মানে ?' আমি জানি কি না জানি তা আপনি জানলেন কি করে ?'

'আপনি যদি আগে রিভলভারটা না কিনতেন তাহলে—।'

'রিভলভার ? সেটাও আপনি জানেন ?'

'গ্যাংটক শহরটা খুব ছোট। ওখানে কথা চাপা থাকে কম।'

'গুড। কিন্তু আমার আগের প্রশ্নের উত্তর পেলাম না।'

'ওই একই ভাবে জেনে গেছি। আপনার সঙ্গে ওর, মানে মিসেস সেনের ঘনিষ্ঠতা তো অনেকেরই নজরে পড়েছে। আপনি ওর ঘরে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে এসেছেন। অতএব ওদের যে জানেন না তা কি বলা চলে। এর মধ্যে কোন জটিলতা নেই।'

'আমার হোটেলের ঘরে পুলিশ কে পাঠাল ?'

'বিশ্বাস করুন, আমি নই।'

'আমি মহিলার ঘরে গিয়েছিলাম, এ খবর আপনি জানলেন কি করে ?'

'চোখ খোলা রাখলেই জানা যায়।'

'আপনি কে ?'

টাকমাথা লোকটা অদ্ভুত চোখে তাকাল প্রশ্ন শুনে। জবাবটা দেবে কিনা হয়ত ভাবছিল।

এই সময় একটা শিস কানে এল অরিন্দমের। শব্দটা শিস না বলে সাপের গর্জন বলাই ঢের মানানসই। সে হাত তুলে দুজনকে চুপ করতে বলল। সঙ্গে সঙ্গে দুটো লোক উঠে দাঁড়াল। ওরা কি করবে বুঝতে পারছিল না। অরিন্দম এগিয়ে গিয়ে লণ্ঠনের আলো প্রায় নিভু নিভু অবস্থায় নিয়ে এল। শিস কিংবা সাপের গর্জন আর শোনা যাচ্ছে না। এবং এখন তাঁবুর ভেতরটায় অন্ধকার আড়াল তৈরি করেছে। সে ধীরে ধীরে আন্দাজেই দরজার কাছে পেঁাছে গেল। এবং তখনই টপ টপ শব্দ বাজল। তাঁবুর ওপরে জলের ফোঁটা পড়ায় একটা অদ্ভুত আওয়াজ হচ্ছে। ব্যাপারটা যে বৃষ্টি তা বুঝেই কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেল অরিন্দম। পাহাড়ী বৃষ্টির চরিত্র নাকি মন্ত্রীদের দালালদের মতন। সে আবার হ্যামকের কাছে ফিরে এসে স্যুটকেস খুলল। ওপরেই ওয়াটারপ্রুফটা ভাঁজ করা ছিল। সেটাকে পোশাকের ওপর চাপাতে মনে হল নড়াচড়া করলেই ফেটে যাবে। মাথাটা ঢেকে নিয়ে রিভলভার হাতে সে আবার দরজায় পেঁাছল। বৃষ্টি পড়ছে বেশ জোরে। কিন্তু তাঁবুর ভেতর আরও যে দুটো মানুষ আছে তা বোঝা যাচ্ছিল না। ওরা যেন অন্ধকারে মিশে গিয়েছে।

অরিন্দম দরজাটা সামান্য সরাতেই মনে হল বরফের ছুরি ছুটে আসছে। বৃষ্টির সঙ্গে এখন বাতাস বইছে। অগ্নিকুণ্ডগুলো কখন নিভে গেছে। পৃথিবী আলকাতরায় মোড়া। কোথাও জল পড়ার আওয়াজ ছাড়া কোন শব্দ নেই। হাড়ের ভেতরে ঠাণ্ডা তিরতিরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপুনি গড়াচ্ছে। অরিন্দম তবু দাঁতে দাঁত চেপে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল। চোখ এখন কিছুটা সয়ে নিয়েছে অন্ধকার। সে জোড়া গোয়েন্দার তাঁবুটাকে লক্ষ্য করল। কোথাও কোন অস্বস্তিকর ব্যাপার নেই। অথচ শিসটা এখনও কানে লেগে রয়েছে। বৃষ্টি মেখে সে কয়েক পা এগিয়ে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। এতগুলো লোক খোলা আকাশের নিচে তাঁবু পেতে শুয়ে রয়েছে অথচ কাউকেই জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে না। পাহাড়, মেঘ, আকাশ আর হাওয়া মিলে নিজস্ব একটি রাজত্ব তৈরি করে নিয়েছে এখন। হঠাৎ আবার শিসটা বাজল। অরিন্দম মুখ ফেরাল। বৃষ্টির জল মিশে অন্ধকার আরও ঘোলা হয়েছে। যেন সারি সারি দেওয়াল সামনে। শিসটা এসেছে ঠিক ডান কোণ থেকে। যেদিকটা এখান থেকে ভাল দেখা যাচ্ছে না।

অরিন্দম নড়ল না। প্রতিপক্ষের চোখের নজর তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি-শালী হতে পারে। এই সময় সে দুটো অবয়ব দেখতে পেল। বেশ সাহসী ভঙ্গিতে দুটো মানুষ একেবারে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। ওখানেই একটু আগে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছিল। তারপর লোক দুটো ধীরে এদিকে এগিয়ে আসতে লাগল। অরিন্দমের শরীরে কাঁপুনি বাড়ল। তার হাতে রিভলভার, কিন্তু আঙুলগুলো অবশ হয়ে যাচ্ছে। লোক দুটো আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রায় ভূতের মত দেখাচ্ছে ওদের। দুজনের শরীরে ওয়াটারপ্রুফ থাকায় মুখ দেখতে পাওয়ার কোন সুযোগই নেই। তারপরেই ওরা চোখের আড়ালে চলে গেল। ব্যাপারটা কি? ওরা কি ঠিকঠাক বুঝতে পারছে না কোন তাঁবুতে গোয়েন্দারা থাকতে পারে! ওরা কি প্রতিটি তাঁবু পরীক্ষা করছে?

এবং তখনই একটা প্রচণ্ড আর্তনাদে চমকে উঠল অরিন্দম। আচমকা কোন মানুষ আহত না হলে এই চিৎকার করতে পারে না। তারপরেই একটি লোককে প্রায় প্রাণ নিয়ে ছুটে যেতে দেখলে সে। দ্বিতীয় লোকটি আসছে না কেন? চিৎকারটা যতটা তীব্র ছিল এখনকার নীরবতা তার থেকে কিছুমাত্র কম নয়। যেন শব্দটা করেই মানুষটির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে। অরিন্দম ধীরে ধীরে নিজের তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়াল। ওরকম শিউরে ওঠা চিৎকারের পরও কোন তাঁবুতে মানুষের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে না। যে যতই ঘুমিয়ে পড়ুক ওই রকম বীভৎস চিৎকারে তার উঠে পড়ার কথা। কিন্তু এখন তাঁবুগুলোর দিকে তাকালে মনে হচ্ছে কেউ কোন চিৎকার শুনতে পায়নি। নাকি ঠাণ্ডা বৃষ্টি এবং ভয় স্লিপিং ব্যাগের উত্তাপ আঁকড়ে ধরতে সাহায্য করে? অরিন্দম নিঃশব্দে আর একটু এগোল। এবং তখনই দৃশ্যটা দেখতে পেল। আবছা সিলুয়েটের মত, যতটা না চোখের কৃতিত্ব তার চেয়ে বহুগুণ মনের অনুমানে। একটা লোক পড়ে আছে মাটিতে। অন্যজন তাকে উল্টেপাল্টে দেখছে। শেষ পর্যন্ত একটা টর্চের আলো জ্বলল। আলোটা পড়ল পড়ে থাকা মানুষের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে নিভল আলো। সন্ধানরত লোকটা এবার একটা ছুরি টেনে বের করল পড়ে থাকা মানুষটার শরীর থেকে। যেখানে ওর হাত পেঁৗছেছিল সেখানটায় গলা কিংবা বুক থাকাই সম্ভব। ছুরিটাকে পড়ে থাকা লোকটির পোশাকে ভাল করে মুছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা চলে গেল লম্বা লম্বা পা ফেলে ওপাশের একটা তাঁবুর দিকে।

যে লোকটা পালাল আর যে ছুরিটা বের করল তারা যে একদলের নয় এটুকু পার্থক্য বুঝতে অসুবিধে হল না। কিন্তু অরিন্দম ধরতে পারছিল না যে পড়ে

আছে সে নিহত কিনা। এই সময় সেই লোকটা আবার ফিরে এল। এবার ওর হাতে কিছু একটা ছিল যা সে জড়িয়ে নিল পড়ে থাকা মানুষটির শরীরে। তারপর স্বচ্ছন্দে সেইটে টেনে নিতেই পড়ে থাকা মানুষটা উঠে এল ওর পিঠে। কিন্তু যেভাবে লোকটার হাত পা ঝুলছে তাতে এখন বুঝতে অসুবিধে হল না প্রাণের চিহ্ন শরীরে নেই। লোকটা এবার এগিয়ে যাচ্ছে উল্টোদিকে শরীরটাকে বহন করে। অরিন্দম সতর্কপায়ে অনুসরণ করল। যদিও বৃষ্টি তার পায়ের শব্দ ঢেকে দিচ্ছিল। অতবড় একটা শরীর বহন করার সময় লোকটা একবারও থামল না। ক্রমশ ওদের এলাকা ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় চলে গেল ওরা। অরিন্দম আর ঝুঁকি নিল না। লোক দুটো ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে। কিন্তু ওখানে পা বাড়ালে লোকটার চোখে পড়ার সম্ভাবনা সত্তর ভাগ।

জায়গাটা বেশ ঢালু হয়ে গেছে। আর এই সময় বিদ্যুৎ চমকাল। তাতেই দেখা গেল লোকটা ঝুঁকে মানুষটার শরীর থেকে বাঁধন খুলছে। তারপরেই অন্ধকার দ্বিগুণ হল। অরিন্দম ধীরে ধীরে পিছিয়ে এসে পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। মিনিটখানেক বাদে সে লোকটাকে ফিরে আসতে দেখল। বেশ হেলতে দুলতে আসছে যেন কোন দুশ্চিন্তা নেই। খোলা-জায়গাটা পেরিয়ে এসে চারপাশে তাকিয়ে নিল লোকটা। এবং তখনই আবার বিদ্যুৎ ঝলসে উঠতেই হতভম্ব হয়ে গেল অরিন্দম।

মাথার ওপরে মেঘ, চোখের সামনে মেঘ আর পৃথিবীর কোথাও সূর্যদেবের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ নিয়ে লাচেনের দিনটা শুরু হয়েছিল। বেলা দশটাতেও তার কিছু পরিবর্তন ঘটল না। কিন্তু দুটো জিনিস এর মধ্যেই ঘটে গেছে। সঙ্গী কুলিদের পরিচিত মালবাহক এবং গাইড পৌঁছে গেছে। দ্বিতীয়ত অনন্ত কাবু হয়ে গেছে ঠাণ্ডায়, যদিও তার কণ্ঠস্বর ঠিক আছে। নিজেদের তাঁবুতে আগুন জেবলে সেখান থেকে সে নড়ছে না। যদিও প্রতিটি তাঁবুতে এক প্রস্থ চা পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছে খেতে হলে সবাইকে রান্নাঘরে আসতে হবে। ঠাণ্ডা যতই বাড়ুক, বসন্ত নিজেকে

খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করছে। আপাদমস্তক ঢেকে সে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে অরিন্দমের কাছে পেঁাছে গেল।

ক্লান্তি এবং শীত অরিন্দমকে' অলস করে রেখেছিল। অনন্তর পাঠানো চা প্রায় ঠান্ডা অবস্থায় পেটে চালান করেও স্লিপিং ব্যাগ ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। বসন্তকে দেখে বলল, 'গুড মর্নিং।'

'মর্নিং। কি হবে বুঝতে পারছি না দাদা।'

'ধৈর্য ধরো। প্রকৃতি হল মেয়েদের মত। বেশিক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকতে পারেন না।'

'আপনার কথা সত্যি হলেই বাঁচি।' বসন্ত চারপাশে তাকিয়ে বসার জায়গা পেল না। তারপরে একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করল, 'কাল রাত্রে কোন অস্বাভাবিক চিৎকার শুনেছেন?'

অরিন্দম হ্যামকে শুয়েই বসন্তকে দেখল। ঘটনাগুলো বলা ঠিক হবে কিনা এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ। কাল রাত্রে একজন খুন হয়েছে।'

'খুন?' প্রায় চিৎকার করে উঠল বসন্ত, 'কে? কোথায়?'

'চিৎকার করো না। আমাদের কেউ নয়। একজন আততায়ীকে মরতে হয়েছে।'

'আপনি জানলেন কি করে?' বসন্তর গলার স্বর পাল্টে গেল।

'তাঁবুর ভেতর শুয়ে না থাকলে তুমিও জানতে বসন্ত।'

'কিন্তু আততায়ী, মানে কাকে খুন করতে এসেছিল?'

'স্বদেশ এবং বিদেশবাবুকে।'

'ও গড! তার মানে সেই ভদ্রমহিলা পাঠিয়েছিলেন। এরা তো ওর স্বামীর হয়ে ব্রিফকেস খুঁজতে এসেছে। এখন কি করা যায়। পুলিশকে ইনফর্ম করার কোন উপায় নেই।'

'কিছু করতে হবে না আমাদের।'

'কিন্তু ওই দুটো মানুষকে তো সরিয়ে ফেলার জন্যে ওরা আবার চেষ্টা করতে পারে।'

'তা পারে।'

'বেশ। অরিন্দমদা, আমরা কেন মিছিমিছি ঝামেলায় জড়াবো। ওরা যদি যেতে চায় নিজেদের মত যাক অথবা নিচে নেমে আমাদের মুক্তি দিক।'

'প্রথমটা সম্ভব হবে না। দ্বিতীয়টাই সহজ। কিন্তু আমি যে মিস্টার সেনকে রিফিউজ করিনি।'

'মানে ?' হকচকিয়ে গেল বসন্ত, 'মিস্টার সেন আবার কে ?'

'উনি কাল রাত্রে আমার কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন। ভদ্রলোক ওই ভদ্রমহিলার তথাকথিত স্বামী।'

'অ্যাঁ।' হতভম্ব হয়ে গেল বসন্ত, 'এ কি বলছেন আপনি ? এরা গোয়েন্দা নয় ? আমাদের এতদিন ব্লাফ দিয়েছে ? ডেঞ্জারাস লোক তো !'

অরিন্দম বসন্তকে শান্ত করার চেষ্টা করল, 'উত্তেজনা পরিহার করো হে।'

'কি বলছেন দাদা !' বসন্ত বলল, 'নিজের স্ত্রীর পেছনে স্পাইং করছেন ভদ্রলোক !'

'ঠিকই বলছি। চিরকাল মেয়েরাই স্বামীর ওপর গোয়েন্দাগিরি করবে এ কেমন কথা।'

'আপনি বিষয়টাকে খুব হাল্কাভাবে নিচ্ছেন।'

'না ভাই। তবে ওরা যদি ওদের মত আমাদের সঙ্গে থাকে তো থাক না।'

'কিন্তু আপনি বললেন ওদের জন্যে একটা খুন হয়েছে।'

'সেটা আমি বললাম বলে তুমি জানলে। মৃতদেহ বা খুনী কাউকে তুমি এ মুহূর্তে খুঁজে পাবে না। গতরাত্রে চিৎকারটা শোনার পনের মিনিটের মধ্যে তুমি তাঁবু থেকে বের হওনি। আর যখন হয়েছিলে তখন ঢেউ মিলিয়ে গেছে জলে। তাই না ?'

'আমি বেরিয়েছিলাম আপনি জানতেন ?'

'ছেড়ে দাও ওসব কথা। সহদেব কি বলছে ? আমরা কবে রওনা হতে পারব ?'

'ও এই ওয়েদারে যেতে রাজি নয়। এদিকে লোকাল হেল্প এসে গেছে।'

'তাহলে আমাকে একটু ঘুমাতে দাও।' অরিন্দম চোখ বন্ধ করল।

কাল রাতেও কে একই কথা বলেছিল মিস্টার সেনকে। ঘটনাগুলো ঘটে গিয়েছিল ছবির মতন।

ছুরিটা হাতে নিয়ে পা বাড়াচ্ছে ঠক্কর। এই লোকটা যে ঠক্কর হতে পারে, তা তার অনুমানেও আসেনি। ঠক্কর বোধহয় নিশ্চিন্ত হয়ে তার তাঁবুর মধ্যে ঢুকে গেল। তবু অরিন্দম দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। এত ঠাণ্ডা মাথায় ঠক্কর লোকটাকে খুন করল ? ওরা যে এসেছে তা ঠক্কর টের পেল কী করে ? কেনই বা সে হত্যা করল ? ওই মানুষটাকে ইউনিটের সবাই ভয় পায়। এখন মনে হল ভয় পাওয়ার সঠিক কারণ আছে। ওই লোক দুটো কি ঠক্করের তাঁবুতে উঁকি মেরেছিল ? তা হলে মৃত লোকটি বাইরে পড়ে থাকবে কেন ? রহস্যটা চাপ হয়ে যাচ্ছিল অরিন্দমের কাছে।

তারপর সে সাহসী হল। একটু দ্রুত পায়ে আড়াল ছেড়ে এগিয়ে চলল ঢালু পাহাড় বেয়ে যেখানে ঠক্কর লোকটাকে নিয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাকে থমকে দাঁড়াতে হল। সামনে অতলান্ত খাদ। পৃথিবীটা যেন আচমকা পাতালে পেঁছে গিয়েছে। তার মনে পড়ল না এখানে পেঁছবার সময় এরকম জায়গা চোখে পড়েছিল কিনা। অবশ্য তখনই সন্ধ্যা ঘনিয়ে গিয়েছিল, বাইরের পৃথিবী দেখার সুযোগ ছিল না। ঠক্কর এখানে দাঁড়িয়ে লোকটাকে ওই খাদে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। হয়তো এই জীবনে লোকটাকে কেউ খুঁজে পাবে না।

অরিন্দম পেছন ফিরে তাকাল। কতটা ঠাণ্ডা রক্তের খুনী হলে এই রকম একটা কাজ করা সম্ভব? হয়তো ঠক্কর জানত কেউ তার তাঁবুতে উঁকি মারতে আসবে। কিংবা সে ওই শিসগুলো শুনতে পেয়ে সতর্ক হয়েছিল। লোক দুটো তাঁবুতে উঁকি মারতে গিয়ে ওর আক্রমণের সামনে পড়ে। বোঝাই যাচ্ছে ঠক্কর নিপুণ হাতে ছুরি ছুঁড়ে মেরেছিল এবং যে লোকটির শরীরে সেটা বিঁধেছিল তার গলা থেকে শুধু একটা আর্তনাদই বেরুতে পেরেছে! অর্থাৎ দূর থেকে ছুঁড়ে মারার নৈপুণ্য ঠক্করের আছে। আর তারপর যখন মানুষটাকে মৃত দেখল তখন সাবলীলভাবে ওই খাদে ছুঁড়ে ফেলে প্রমাণ লোপ করে তাঁবুতে ফিরে গেল। এসব করার সময় লোকটাকে একটুও বিচলিত দেখাচ্ছিল না।

অরিন্দম ফিরে আসছিল। হঠাৎ আসা এই উত্তেজনা ওর জলে ভেজা শীত-বোধটাকেও নুইয়ে দিয়েছিল। তাঁবুর কাছাকাছি পেঁছে সে আবার দাঁড়াল। ঠক্কর কি আর একটা আক্রমণের আশঙ্কা করে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় যদি আর একটা ছুরি অন্ধকার দিয়ে তার বুক লক্ষ্য করে উড়ে আসে? অরিন্দম কেঁপে উঠল। তারপর দিক পাল্টালো। তাঁবুগলোর পিছন দিকে হেঁটে সে ঘুরে এল সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। যে লোকটা পালাতে পেরেছে সে নিশ্চয়ই তার মালিকের কাছে খবর পেঁছে দিয়েছে এতক্ষণে। ওরা কি পরিকল্পনা করছে জানার উপায় নেই। তবে তার বিশ্বাস করতে ভাল লাগছে যে মালিকান এই ঘটনার কথা জানবেন না। তাঁকে কখনই বলা হবে না। অবশ্য মেমসাহেব যদি তাঁর সঙ্গে চমৎকার অভিনয় না করে থাকেন।

না। কোন জীবিত মানুষের চিহ্ন নেই কোথাও। অরিন্দম সতর্কপায়ে হেঁটে আসছিল সোজা পথ দিয়ে। এবং তখনই তার কল্পনার তাঁবু নজরে এল। যদি ঘুমিয়ে কাদা না হয়ে থাকে তাহলে কল্পনাও ওই চিৎকারটা শুনতে পেয়েছে। মেয়েটা নিশ্চয়ই ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। অরিন্দমের খুব ইচ্ছে করছিল কল্পনার

সঙ্গে দেখা করে সাহস দিয়ে আসে। তার পরেই মনে হল বসন্তকে ডেকে তুলে এ ব্যাপারে জানানো দরকার। সেই সময়ে ওপাশের তাঁবুতে আলো জ্বলে উঠতেই অরিন্দম দ্রুত পা চালিয়ে আড়ালে চলে এল। একটা টর্চ-এর আলো পড়ল বাইরে। একটা গলায় কিছু কথা শোনা গেল। তারপর একটি অবয়ব টর্চের আলোয় পথ দেখে ছুটে গেল কল্পনার তাঁবুর দিকে। বসন্তর গলা শুনতে পেল অরিন্দম, 'কল্পনা, কল্পনা।'

'কে ?' যেন একটা কাঁপুনি মেশানো চিৎকার ছিটকে এল তাঁবুর ভেতর থেকে।

'আমি বসন্ত। তুমি ঠিক আছ তো ?'

'না। আমার একা থাকতে ভয় করছে।'

'সেই জন্যই এলাম। ভয় কি। আমি আছি।'

'তুমি তুমি, আমি আর একা থাকতে পারছি না।'

'ঠিক আছে আমি দেখছি। আপসেট হয়ো না, প্লিজ।'

অরিন্দম আর দাঁড়াল না। হঠাৎ বুকের ভেতরে বাতাসটা যেন আটকে গেল। সে দ্রুত নিজের তাঁবুর সামনে এসে ডাকল চাপা গলায়। 'স্বদেশবাবু বিদেশবাবু।'

ভেতর থেকে সাড়া এল, 'আজ্ঞে।'

অরিন্দম ভেতরে ঢুকে প্রথমে হ্যারিকেনটাকে উজ্জ্বল করল। তারপর স্লিপিং ব্যাগের ভেতর ঢুকে থাকা লোক দুটোকে বলল, 'এবার নিজেদের তাঁবুতে ফিরে যান।'

'কিন্তু।'

'না। আর কোন সম্ভাবনা নেই। অন্তত আজ রাত্রে।' লোক দুটোকে বেশ তৃপ্ত দেখাল। স্লিপিং ব্যাগ গুটিয়ে নিয়ে সুড়ুত করে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে। ওয়াটারপ্রুফ মাটিতে ফেলে দিয়ে হ্যামকের ওপর বসে পড়ল অরিন্দম। ওর মাথায় চট করে একটা দৃশ্য চলে এল। কল্পনা আসতে চায় দলের সঙ্গে জানিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল তার কাছে বসন্ত। সে হেঁকে বলেছিল, নিয়ে নাও হে। সঙ্গে মহিলা থাকলে মন্দ কি। কিন্তু আজ ব্যগ্র বসন্ত বলল, 'ভয় কি, আমি আছি।' তাহলে কি সে তার সম্মতি আদায় করার জন্যে সেদিন অভিনয় করেছিল ? যে সম্পর্ক থাকলে মানুষ এই আবহাওয়ায় কারো খবর নিতে ছুটে যেতে পারে সেই সম্পর্ক কি এতকাল বসন্ত চেপে রেখেছিল ? একজন তরুণী নায়িকার সঙ্গে একটি তরুণ পরিচালকের সম্পর্ক হতেই পারে। কিন্তু তার কেন এত অস্বস্তি হচ্ছে। সে কি মনে মনে কল্পনাকে কামনা করছিল ? নাকি কল্পনা তার মনে অজান্তেই

একটা গোপন উৎসাহ বেড়ে ওঠার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল বলেই এখন এক ধরনের ঈর্ষার মুখোমুখি হচ্ছে সে? নিজেকে খুব বোকা বলে মনে হচ্ছিল তার। তার মনে হল বসন্ত যে এতদিন নিজেকে আড়ালে রেখেছিল তার নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল, কিন্তু সেই কারণটাই তাকে আরও বিষণ্ণ করে তুলছিল। একটা খুন হয়ে গেল, দুটো খুনের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু সেসব ছাপিয়ে ওই বিষণ্ণতা অরিন্দমকে ক্রমশ গ্রাস করছিল।

শোয়ার আয়োজন করে অরিন্দম যখন হ্যামকে ওঠার জন্যে তৈরী, ঠিক সেই সময় দরজায় শব্দ হল। রিভলভারটাকে টেনে নিল অরিন্দম। লণ্ঠন কমানো হয়নি তাই তাঁবুর ভেতরটা স্পষ্ট। ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে যেতেই অরিন্দম ডাকল, 'আসুন।'

তাঁবুর ভেতরে এসে দাঁড়াল টাকমাথা। লোকটা যেন অরিন্দমকে জেগে থাকতে দেখে বেশ অপ্রস্তুত। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও বন্ধ করল। তারপর রিভলভারটার দিকে তাকাল।

অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, আমাকে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে?'

'অ্যাঁ! না না। এ কী কথা বলছেন?'

'আপনি কি জানেন একটু আগে এখানে একটা খুন হয়েছে।'

'অ্যাঁ? খুন!'

'এইভাবে ঘুরে বেড়ালে আপনিও খুন হতে পারেন।'

লোকটি ঢোঁক গিলল, 'না মানে, একটা কথা আপনাকে না বলে পারছিলাম না। ঠিক আছে, আমি যাই।' দরজার দিকে ফিরল টাকমাথা।

'দাঁড়ান।' অরিন্দম হুকুম করতেই লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কেন এসেছিলেন?'

'আপনাকে বলতে যেন আমাকে না ভুল বোঝেন।'

'সত্যি কথাটা বলুন।'

'কোন কথাটা।'

'কেন এই রকম ভাঁড় গোয়েন্দার ছদ্মবেশ নিয়েছেন?'

'অন্য কিছু মাথায় আসেনি। তবে আমার সঙ্গী কিন্তু সত্যি এজেন্সির লোক।'

'কিন্তু কেন নিতে হল?'

'প্রাণের ভয়ে।'

'আপনি ভেবেছিলেন কেউ আপনাকে চিনতে পারবে না ?'

'হ্যাঁ, পাকা জুলপির উইগ পরলে—, মানে এজেন্সি থেকেই বলে দিয়েছে।'

'এখানে আসতে হল কেন ?'

'ব্রিফকেসটার জন্যে।'

'কী আছে ওতে ?'

'হীরে।'

'হীরে ?'

'হ্যাঁ। আমাদের বংশের সম্পত্তি। ওইটে হাতাবার জন্যে ও ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।'

'এত দামী জিনিস বায়ুদুতে এক পরিচিতের হাতে তুলে দিলেন ?'

'সঙ্গে রাখতে সাহস পাচ্ছিলাম না। আমাকে খুন করে ফেলত। ভদ্রলোককে বলেছিলাম বিকেল বেলায় হোটেল থেকে ওটা নিয়ে যাবে আমার এক বন্ধু। আসলে আমিই নিতাম। গোহাটি থেকে প্লেন ধরতাম। চাবি না থাকলে ওই ব্রিফ-কেস কেউ খুলতে পারবে না।'

'আপনি কি বুঝতে পারছিলেন না যে আপনাকে গ্যাংটকে কেউ চিনে ফেলতে পারে ?'

'আমার মনে হয়নি। কারণ আমি কখনও ওদের সামনে যেতাম না। কিন্তু যেদিন আপনি শিলিগুড়ি থেকে কালীঝোরা বাংলোয় ওদের খোঁজে গিয়েছিলেন সেদিনই ধরা পড়ে যাচ্ছিলাম চ্যাটার্জীর কাছে। ও আপনাদের পেছন ধাওয়া করে সেবক ব্রিজ পর্যন্ত এসেছিল। পুলিশ আমাদের আটকে রেখেছিল সেখানে। তখন ভেবেছিলাম বুঝতে পারেনি। কিন্তু এখন— ।'

'তাহলে কেউ আপনাদের শাসায়নি। আমাকে মিথ্যে বলেছেন ?'

'আমার সঙ্গীকে শাসিয়েছিল।'

'আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন না মিস্টার সেন ?'

'না। আমি শুধু ওর আগে স্পটে পৌঁছে ব্রিফকেসটাকে খুঁজে পেতে চাই। আপনি দয়া করে এখান থেকে আমাদের ফিরিয়ে দেবেন না। শী ইজ ডেড টু মি।'

অরিন্দম ঠোঁট কামড়াল, 'যান। নিজের তাঁবুতে যান। আমি একটু ঘুমাতে চাই মিস্টার সেন।'

বসন্ত বাইরে বেরিয়ে এসে পাশের তাঁবুটার দিকে তাকাল। ওটার ভেতরে কেউ জেগে আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। জোড়া গোয়েন্দা অথবা ভাঁড় সেজে লোক দুটো ওকে কিরকম ভাঁওতা দিল। ওদের একজন যদি মিস্টার সেন হয় আর একজন কে! নায়ক কথা দিলে পরিচালককে মেনে নিতেই হয়।

'এই যে ডিরেক্টর সাহেব। আমরা কি আজ রওনা হচ্ছি?'

বসন্ত দেখল ঠক্কর প্রশ্নটা করতে করতে এগিয়ে আসছে। লোকটার দিকে তাকিয়ে আজ হঠাৎ বসন্তর মনে হল ও দলে থেকে ভালই হয়েছে। এরকম একটা টাফ্ লোক অনেক সাহায্যে আসবে। সে হেসে উত্তর দিল, 'এই ওয়েদারে আপনি হাঁটতে পারবেন?'

'আই ডোণ্ট মাইণ্ড। কিন্তু দেরি করলে বিপদে পড়বেন। একবার বরফ পড়তে শুরু করলে আর কিছুই খুঁজে পাবেন না।' ঠক্কর হাসল, 'অবশ্য তাতে আমারই সুবিধে। ছবিটা তুলতে হবে শুধু।'

ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়েও বসন্তর কান গরম হল, 'আপনি সে-সুযোগ পাবেন না। স্যুটকেসটা আমাদের প্রাণ। আমরা ওটাকে খুঁজে বের করবই। আমার মন বলছে ওটা পাবই।'

ঠক্করকে নির্লিপ্ত দেখাল, 'আমাদের হিরো সাহেবের কি খবর? উনি কি বলছেন?'

'ওঁর ধারণা অন্যরকম হলে সঙ্গে আসতেন না।'

'আমাদের হিরো সাহেবের ঠাণ্ডা কম, সাহস বেশি।'

'একথা কেন বলছেন?'

'কাল রাত্রে একটা চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে বেরিয়ে দেখি হিরো সাহেব একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ভাবলাম ওঁকে জিজ্ঞাসা করি চিৎকারটা কার? কিন্তু সেই সময় ডিরেক্টর সাহেব হিরোইনের সঙ্গে কথা বলছিলেন আর হিরো সাহেব সেটা লক্ষ্য করছেন। আমি আর কাউকে ডিস্টার্ব করিনি। চিৎকারটা কার খুঁজে পেয়েছেন?' ঠক্কর হাসল প্রশ্নটা করে।

খুনের কথাটা বলতে গিয়েও চেপে গেল বসন্ত। অরিন্দম নিজেই তার কাছে খোলসা করেনি ব্যাপারটা।

সে কোন কথা না বলে মাথা নেড়ে না বলল। ঠক্কর বলল, 'আচ্ছা! রিয়েলি মিস্টিরিয়াস!' তারপর শিস দিতে দিতে নিজের তাঁবুর দিকে ফিরে গেল লোকটা। বসন্তর মনে হল এই ঠাণ্ডায় ওর বিন্দুমাত্র অসুবিধে হচ্ছে না।

কিচেনের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢ়ুকতেই বসন্ত দৃশ্যটা দেখল। ওপাশে জল-খাবার হচ্ছে। মাঝখানে আগুন জেৱলে সবাই গোল হয়ে বসেছে। এবং এই দলে কল্পনাও রয়েছে। কথা বলছিল অনন্ত। বসন্তকে দেখেও তার কথা থামল না। আগুনের সামনে বসেও অনন্ত শুধু নাক আর চোখ মুক্ত রেখেছে। অনন্ত বলছিল, 'বুঝলে হে, অনেক ভেবে দেখলাম, এইটেই একমাত্র পথ। ফিরে গিয়ে আমরা জ্যোতিবাবুকে প্রস্তাবটা দিতে পারি।'

বিক্রম বলল, 'জ্যোতিবাবু না হয় তর্কের খাতিরে ধরলাম মেনে নিলেন, কিন্তু সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী রাজি হবেন কেন? কেউ নিজের রাজ্যে জনসংখ্যা বাড়াতে চায়?'

বসন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কেসটা কি?'

বিক্রম বলল, 'আমাদের অনন্তদার মাথায় একটি পরিকল্পনা এসেছে। কলকাতার বস্তি এবং মধ্যনিম্নবিত্ত এলাকায় যে রেটে হুলিগান আর মাস্তান বেড়ে যাচ্ছে তাতে উনি চিন্তিত। ওঁর ধারণা যদি কলকাতার সব পাড়া থেকে বেকার মাস্তানদের কালেক্ট করে এখানে তুলে এনে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে প্রব্লেমটা সলভ হতে পারে।'

'কি রকম?' বসন্তর বেশ মজা লাগল।

এবার অনন্ত কথা বলল, 'কলকাতায় আপনি লক্ষ করেছেন ওদের? পেটে ভাত নেই কিন্তু অমিতাভ বচ্চনের মত চুল আর পোশাকের মাঞ্জা ঠিক আছে। সব সময় পৃথিবীটাকে নস্যি করে দিচ্ছে। কেউ কোন প্রতিবাদ করলেই তার বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেবার হুমকি দেয়। মদ খাওয়া আর মাস্তানি করা ছাড়া কোন কাজ নেই। বেলঘরিয়া থেকে গড়িয়া, পাড়ায় পাড়ায় একই স্যাম্পেল। এদের যদি এখানে এনে ছেড়ে দেওয়া যায় আর বলা হয় নিজের খাবার নিজে তৈরি করে নাও তবে উচিত শিক্ষা হবে।'

'ঠান্ডায় তো অর্ধেক মরে যাবে।' কল্পনা মন্তব্য করল।

'মরলে খারাপ লাগবে তবে জিভগুলো যদি খসে যায় তাহলে মঙ্গল।'

'আপনি আর একটা সাইবেরিয়া তৈরি করে এখানে পাঠাতে চাইছেন অনন্তদা। আপনি তো জার-এর চেয়ে বুর্জোয়া। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় মাস্তানদের মেনে নিতে হবে।' বিক্রম বলল। কিন্তু অনন্ত অন্য প্রসঙ্গে চলে এল আচমকা, 'এখানে ভূত আছে বসন্তদা।'

'কি করে বুঝলেন?'

'কাল রাত্রে একজন কিরকম ক'কিয়ে চিৎকার করল শোনেননি ? অথচ আমাদের কেউ নয়। রাত দুপুরে এই ঠান্ডায় কে আসবে চিৎকার করতে।'

বসন্ত আর কথাটাকে বাড়তে দিল না। সে ঘুরে দাঁড়াবার আগে বলল, 'সবাই তৈরি থাকুন। যদি দুপুরের মধ্যে ওয়েদার ভাল হয়ে যায় তাহলে আজই আমরা রওনা হয়ে যাব।'

অনন্ত বলল, 'আমি তো এখানেই থেকে যাব।'

বসন্ত কোন মন্তব্য না করে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এল। শুধু শেষ মুহূর্তে কল্পনার সংগে তার চোখাচোখি হল। হঠাৎ তার মনে হল একটু আগে অরিন্দম তাকে খোঁচা দিয়েছে। কল্পনার সংগে তাকে জড়িয়ে একটা ভাবনা ওর মধ্যে এসেছে। বসন্তর খুব মেজাজ খারাপ হল। নায়করা সবসময় কি ভাবে ? সেটে এবং সেটের বাইরে প্রেম করার একচেটিয়া অধিকার শুধু তাদেরই। কিন্তু কল্পনা ওভাবে তাকাল কেন ?

কথাটা যে এত সত্যি হবে ভাবেনি বসন্ত। সাড়ে এগারটা নাগাদ আবহাওয়া দ্রুত পাল্টে গেল। আর বারোটার সময় মনে হল যে কোন মুহূর্তে রোদ উঠলেও উঠতে পারে। সহদেব সেন তবু মন স্থির করতে পারছিল না। একবার এগিয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত দাঁতে দাঁত কামড়ে থাকতে হবে। কিন্তু নতুন আসা মালবাহকদের নেতা শেরিঙ্ বলল ঘন্টা চারেকের মধ্যে বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা নেই। তবু সহদেব আর একটা দিন অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল। লাচেন থেকে হাঁটতে হবে। প্লেন যেখানে ভেঙে পড়েছে সেই জায়গাটি চিহ্নিত নেই। অনেকটা এলাকা নিয়ে খুঁজতে হবে। তাছাড়া এই পথে মাইল আটেক গেলেই বরফ শুরু হবে। সেক্ষেত্রে সকাল সকাল বের হলেই ভাল। শেরিঙ হেসে বলেছিল, 'এখন আকাশ নিয়ে এত চিন্তা করছেন সাহেব কিন্তু হাঁটতে শুরু করলে এসব ভাবনা মাথায় আনতে পারবেন না।' সহদেব নিজেও সেটা জানে। এর আগে বৃষ্টিতে হাঁটার অভিজ্ঞতা তার আছে। কিন্তু এবার যে দল নিয়ে যেতে হবে তাদের নভিস বললেও কম বলা হয়। ঝুঁকিটা এখানেই।

অরিন্দম আজ সারাটা সকাল তাঁবুর থেকে বের হয়নি। প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটিয়ে নেয়ার জন্যে অনন্ত গোটা চারেক বারোয়ারি ছাউনির ব্যবস্থা করেছিল। দুপুরে একবার বেরিয়ে প্রয়োজন সেরে নিয়ে আবার ব্যাগের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু শীত এবং আলস্য যে ঘুমটাকে টেনে আনে তারও একটা নির্দিষ্ট আয়ু আছে। সকালে বসন্ত চলে যাওয়ার পর অনন্ত একবার এসেছিল। দুপুরের খাবার দিতে সে যখন আবার এসেছিল তখন জ্ঞান দিয়েছিল, 'দাদা, যত শুয়ে থাকবেন তত ঠান্ডা আপনাকে কাবু করবে। আপনি যে কি করে বরফের মধ্যে যাবেন বুঝতে পারছি না। অথচ আমি স্বপ্ন দেখেছি একমাত্র আপনিই স্যুটকেসটা খুঁজে পাবেন।'

মাঝে মাঝে এরকম কথাবার্তা মন্দ লাগে না। টালিগঞ্জের কিছু বয়স্ক প্রোডাকশন ম্যানেজার উত্তমকুমারের সঙ্গে যেসব কথা বলতেন তা অনেক প্রোডিউসার ডিরেক্টর বলতে সাহস পেতেন না। দীর্ঘকালের পরিচয়ে ওঁদের খবরদারি উত্তমবাবু উপভোগ করতেন।

অরিন্দম চোখ বন্ধ করেছিল, 'কিন্তু মুস্কিল হল কি জানো, এত ঠান্ডায় আর পারা যাচ্ছে না। হাজার হোক ঘামের দেশের লোক আমরা, কি বল ? তা শরীর গরম করার কোন ব্যবস্থা করেছ ?'

অনন্তর যে চোখ দুটো দেখা যাচ্ছিল সে-দুটো ছোট হয়ে এল, 'তাঁবুর ভেতরে আগুন জেবলে দেব ? একটু ভয় থাকে, তবে চোখে চোখে রাখলে বেশ গরম হয়।'

কথাটা বুঝেও যে অনন্ত না বোঝার ভান করছে তা বুঝতে অসুবিধে হল না। অরিন্দম সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে এসে লোকাল কিছু খুঁজে পেয়েছ ?'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল অনন্ত, 'তা পেয়েছি। ওই যেসব পোর্টার আজ দলে এল তারা সঙ্গে এনেছে। আমি ওদের বলেছিলাম পাহাড়ে ওঠার সময় ওসব খাওয়া সহদেবদা বারণ করে দিয়েছেন। ওরা বলেছে তাহলে ওদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে এক্কেবারে দিশি জিনিস। আপনি খেতে পারবেন না। বড্ড গন্ধ।'

'লাচেনে একটু ঘুরে দ্যাখো। এত লোক এখানে থাকে সন্ন্যাসীর মত তা কখনও হয়। নিশ্চয়ই বেটারা কিছু খুঁজে পাবে।' ইচ্ছে করেই পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে দিয়েছিল অরিন্দম।

আর দুপুরের পরেই তার তাঁবুতে দুটো বোতল পেঁাছে গেল। গায়ে কিছু লেখা নেই। এমন কি মুখে কর্ক পর্যন্ত নেই। অনন্ত হলফ করে বলে গেল এমন সুপানীয় সে কখনও খায়নি। ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় স্যুটিং-এ গিয়ে নানান

পানীয় খাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে, কিন্তু এ বস্তুর সঙ্গে কেউ পাল্লা দিতে পারবে না।

লাচেনে এক বুড়ির কাছ থেকে কিনেছে সে। তবে বোতল ফেরত দিলে দাম কমবে। এখানে বোতল পাওয়া যায় না বললেই হয়। ফলে বিক্রি হয় খদ্দেরের পাত্রে দ্রব্য ঢেলে।

বিকেল চলে এল জিনিস দুটোর দিকে তাকিয়ে। দিশি বস্তু খেয়ে যে পরিমাণে মানুষ মারা যায় প্রতিদিন, তার সংখ্যা বাড়াবার ঝুঁকি সে নিতে চাইছিল না। বাংলা ফিল্মের বিখ্যাত নায়ক দিশি খাচ্ছেন, খবরটা জানতে পারলে সিনেমা পত্রিকার বিক্রি আরও বাড়ত। অতএব বোতল দুটোয় দ্বিতীয়বার হাত দিল না অরিন্দম।

রোদ ওঠেনি কিন্তু সারাদিন পরিষ্কার ছিল পাহাড়। অতএব রাত্রে যদি আবার আকাশের চেহারা খারাপ না হয় তাহলে আগামী সকালে যাওয়া হবে। যে দল যাবে তা আগেই ঠিক ছিল। বসন্ত এবং সহদেব বিকেলে অরিন্দমের সঙ্গে কথা বলতে এল।

বসন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার ? সারাদিন ওভাবে শুয়ে আছেন ?'

অরিন্দম বলল, 'বড় আরাম হে !'

এবং তখনই বসন্তর নজর পড়ল বোতল দুটোর ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু বোতলের গায়ে কোন লেবেল না থাকায় সে ঠিক বুঝতে পারছিল না ও দুটোয় মদ আছে কিনা। কিন্তু সহদেব জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি লোকাল মদ পেলেন কি করে ?'

'পেয়ে গেলাম। জিনিসটা কি রকম জানেন ?'

'আমি খাইনি কখনও। তবে শুনেছি এখানে যে জিনিস বোতলে বিক্রি হয় তার স্ট্যান্ডার্ড ভাল। একথা টার্নারের বইতেও পড়েছি। তবু আমি বলব, না খাওয়াই ভাল। খুব ঠান্ডা লাগলে একটু ব্রান্ডি খেতে পারেন। যাহোক কাল সকালে আমরা বের হতে পারব আশা করছি। সাড়ে ছটায় রওনা হবো। তার আগে তৈরী হয়ে নিতে হবে।' সহদেব প্রসঙ্গ পাল্টালো।

'অনন্তকে বলো পাঁচটা নাগাদ সবাইকে ঘুম থেকে তুলতে।' অরিন্দম বলল। এই সময় দরজায় শব্দ হল। অরিন্দম গলা তুলল, 'আসুন।'

তাঁবুতে ঢুকে ইতস্তত করতে লাগলেন বিদেশবাবু। বসন্ত দেখল জোড়া গোয়েন্দাদের দুনম্বরটা। আজ সারাদিন সে ওদের দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। এরা শিলিগুড়ির হোটেলেই তাকে

ভাঁওতা দিয়েছিল। বিদেশ আরও কয়েক পা এগিয়ে শায়িত অরিন্দমকে জিজ্ঞাসা করল, 'অসুস্থ ?' অরিন্দম মাথা নাড়ল, 'রিল্যাক্সিং। মিস্টার সেন কোথায় ?'

'উনি সারাদিন তাঁবুতেই আছেন।' কথাগুলো বলে আবার চুপ করে গেলেন ভদ্রলোক।

'কিছু বলবেন ?' অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল।

লোকটি আবার সহদেব এবং বসন্তর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'কথা ছিল।'

'বলুন।'

বিদেশ বললেন, 'ওরা নেই।'

'কারা নেই ?' সহদেব প্রশ্নটা করল। প্রশ্নটা যেন বসন্তেরও।

বিদেশ ঠোঁট চাটলেন। এর মধ্যেই সে-দুটো ঠান্ডায় ফাটতে শুরু করেছে, 'আমি এইমাত্র নিজে ঘুরে এসেছি। ওরা দশটা নাগাদ খারাপ ওয়েদারেই বেরিয়ে পড়েছে। কালকের ঘটনাটার পর সকালে ওয়াচ রাখতে পারিনি। সেন সাহেব খবরটা শুনে খুব ভেঙে পড়েছেন। পাহাড়ী পথ, ওরা একদিন এগিয়ে রইল।'

অরিন্দম এবার হ্যামক থেকে নেমে দাঁড়াল, 'আপনি কোথায় খোঁজ নিয়ে-ছিলেন ?'

বিদেশ আবার বসন্তদের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'যে বাংলোটায় মিসেস সেন ছিলেন সেটাও খালি।'

হঠাৎ বসন্ত উষ্ণ গলায় বলল, 'কে কখন যাচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমা-দের কি লাভ। আমরা যাব আমাদের মত। দাদা আপনাদের কথা দিয়েছেন যখন, তখন আপনারা দুজন আমাদের সঙ্গে থাকছেন। কিন্তু ওসব কথা বলে আর টেনশন বাড়াবেন না। আমরা কারো সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাচ্ছি না।'

বিদেশের মুখ আরও শুকিয়ে গেল। তারপর মাথা নেড়ে আসছি বলে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। সহদেব এবার বসন্তকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার ? লোক-টার কথাবার্তা একদম পাল্টে গিয়েছে মনে হচ্ছে।'

বসন্তের বিরক্তিটা তখন ছিল। বলল, 'হ্যাঁ। স্বামীস্ত্রীর ঝগড়ায় আমরা থাকব না, এটাই শেষ কথা।'

অরিন্দম অন্যমনস্ক ছিল। হঠাৎ বলল, 'অদ্ভুত লাগছে। ওরা খোঁজখবর না নিয়ে চলে গেল।'

বসন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কি ব্যাপার ?'

'তোমার দলের একটি মানুষ যদি আচমকা কমে যায় তবে তার সম্পর্কে খোঁজ না নিয়ে তুমি জায়গা ছাড়তে যদি পার তাহলে বুঝব পৃথিবীর যে কোন অপরাধ করতে তোমার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হবে না। অবশ্য এটা ঠিক, ইতিহাস বলে যে কোন দাগী ক্রিমিন্যালের চেয়ে একজন সাধারণ মানুষ অনেক নৃশংস ক্রাইম করতে পারে। ঠিক আছে, তোমরা তৈরী হও। এ বিষয়ে আর আলোচনা না করাই ভাল।' অরিন্দম বোতল দুটোর একটায় হাত দিচ্ছে দেখে বসন্তরা আর কথা বাড়াল না। তাঁবুতে একা হবার পর অরিন্দম আবার বোতলটাকে রেখে দিল। বিদেশ ঠিকই বলেছেন, পাহাড়ে একদিনের পথ এগিয়ে থাকার সুবিধে অনেক। এত করেও যদি মিস্টার সেনের আগে ওরা স্পটে পেঁাছে যায় এবং ব্রিফকেসটা খুঁজে পায় তাহলে ওঁর ভেঙে পড়ার কথাই। কিন্তু সেটা হলে, অরিন্দমের বিশ্বাস, আর একটা খুন হবে। হীরে পাওয়ার পর মিসেস সেনকে পৃথিবীতে রাখা হবে না। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় চিন্তাটা মাথায় উঁকি দিল। সে এ কথা ভাবতে পারছে না কেন ওগুলো পাওয়ার পর চ্যাটার্জীর পরমায়ু শেষ হয়ে যাবে। এত তড়পানি এখন মিসেস সেন সহ্য করছেন ব্রিফকেস পেতে হবে বলে।

রাতটা চমৎকার কাটল অরিন্দমের। সারাদিন শুয়েও অত বড় রাত চমৎকার ঘুমাতে পারল। ছটার মধ্যে সে তৈরী, কিছু তাঁবু গুছিয়ে নেওয়া হয়েছে। জিনিসপত্রের সংখ্যা কমছে। সবচেয়ে আনন্দের কথা পূব আকাশ লাল হয়েছে। আকাশে মেঘ নেই। এবং সূর্যদেবের দর্শন পাওয়ার সম্ভাবনা নিরানব্বই ভাগ।

সঙ্গে আনা অল্পশক্তির জেনারেটারগুলো এক ঘন্টা চালানো হয়েছিল প্রথম রাতে। ওগুলো সহজেই বহন করা যায়। দলটা সম্পূর্ণ তৈরী হতে না হতে নরম তুলতুলে রোদ নেমে এল আকাশ থেকে। আর তখনই সক্রিয় হল বিক্রম। তার ক্যামেরা কখনও সে খুলেছে কিনা অরিন্দম জানে না কিন্তু এখন স্ট্যান্ড লাগিয়ে এই যাত্রারম্ভ ধরে রাখতে চাইছে। অভ্যেসবশত সে মিটারে আলো মাপতে চাই-ছিল। বসন্ত তাকে চিৎকার করে বলল, 'আলো মেপে শুটিং করছ নাকি? তোমার

অ্যাকশন বলার জন্যে সারাদিন তাহলে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। যা পাচ্ছ তাই তুলে নাও।'

আধ ঘণ্টা দেরি হল রওনা হতে। ক্যামেরা এখন বিক্রমের হাতে। প্রবল উৎসাহে সে চেষ্টা করছে হাঁটতে হাঁটতে দলটাকে ধরে রাখতে যদিও প্রতি মুহূর্তে তার মুখ থেকে নির্দেশ ছুটে আসছিল কিন্তু সেদিকে কেউ কান দিচ্ছিল না। প্রত্যেকেই এখন এমন উত্তেজিত যে শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করছে। প্রোডাকসন ম্যানেজার অনন্ত খানিকটা দূর দলের সঙ্গে এসে দাঁড়িয়ে গেল, 'আমি আপনাদের জন্যে রোজ এখানে অপেক্ষা করব। যেমন করেই হোক স্যুটকেসটা খুঁজে বের করবেন।'

অরিন্দম একবার মুখ ফিরিয়ে লোকটাকে দেখল। অনন্ত আবার চেঁচাল, 'সবাই ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুন। ভগবান, তুমি দেখো। মা কালী তুমি দেখো।' তার দুটো হাত যুক্ত হয়ে আকাশের দিকে উঁচোনো। যেসব চলচ্চিত্র কর্মী কলকাতায় বসে স্পটে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিল এবং সহদেবের লিস্ট দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছিল তাদের দু-একজন লাচেন পর্যন্ত এসে মত পাল্টে ফেলেছিল। এখন অনন্তর পাশে দাঁড়িয়ে বিদায় জানাতে জানাতে তারা লাচেনে থেকে যেতে পারছে বলে নিশ্চয়ই খুশি হয়েছে।

রোদ বাড়ছে না কিন্তু পৃথিবী পরিষ্কার। দলটা চলেছে লম্বা লাইন দিয়ে। একদম শুরুতে আছে মালবাহকদের নেতা শেরিঙ্ আর সহদেব সেন। তাদের পেছনে বসন্ত আর কল্পনা। ওদের ঠিক পরেই ক্যামেরা কাঁধে বিক্রম। বিক্রমের পেছনে মিস্টার সেন এবং বিদেশবাবু। ওদের পেছনে অরিন্দম। এর পরে মালবাহকদের বিরাট দঙ্গল। এবং সবশেষে ঠক্কর। ঠক্করের হাতে সেই স্যুটকেসটা, যা সে ধরে আছে সাবলীল ভঙ্গিতে।

মোটামুটি এইভাবেই দলটা চলছিল। লাচেন থেকে এখন ওরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছিল। বিক্রম জানত তাদের খাড়া ওপরে উঠতে হবে। নেমে যাওয়ার ধরন দেখে সে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, 'আরে আমরা যে শুধুই নেমে যাচ্ছি।' সহদেব সেন উত্তর দিল হাঁটতে হাঁটতে, 'পাহাড়ের নিয়মই এই। মাথায় তোলার আগে পায়ের তলায় যেতে বাধ্য করে।'

অরিন্দম বলল, 'তোমার যে কাজ তাই করে যাও হে।'

বিক্রম ক্যামেরার লেন্স অরিন্দমের দিকে ফিরিয়ে সাটার টিপল। খানিকটা এক্সপোজ করে বলল, 'দূর। এ ভাবে ছবি তোলা যায়। লাইটের কণ্ডিশন খারাপ, হাঁটতে হাঁটতে তুলতে হচ্ছে। আগে বুঝতে পারলে প্রস্তাবটা কোন শালা দিত।'

অরিন্দম বলল, 'কিন্তু তুমি তো আমার সর্বনাশ করে দিলে হে।'

বিক্রম ক্যামেরা অফ করে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'কেন ? কি করলাম ?'

'এর পরে আর কোন প্রোডিউসার আসবে আমার কাছে ? তুমি জানো না বাংলা ফিল্মে আমরা যারা এখন অভিনয় করছি তাদের ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবার আগে কতটা মেরামত করতে হয়।' অরিন্দম কপট রাগ দেখাতেই বিক্রম হো হো করে হেসে উঠল, 'যা বলেছেন দাদা। সেদিন অন্য একটা ছবির পরিচালক এসেছিলেন আমাকে দিয়ে কাজ করাতে। ভদ্রলোক সরাসরি বললেন নায়িকাকে সামনে থেকে কোমরের ওপর থেকে ধরতে হবে। পেছনে থেকে ফুল ফিগার নিতে পারি। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন ? উনি সোজাসুজি বললেন, নায়িকার পেটের এক্সপোজার হলেই দর্শক রি-অ্যাক্ট করবে। টায়ার হার মেনে যাচ্ছে।'

ওরা দাঁড়িয়ে কথা বলছিল বলে পেছনের মানুষগুলোকেও থেমে যেতে হয়েছিল। ফলে দলটা এখন দ্বি-বিভক্ত। সেটা বুঝতে পেরে অরিন্দম আবার পা চালালো। এখন হাঁটতে মন্দ লাগছে না। ঠাণ্ডাও কমে গেছে বেশ। সে দু-পাশের পাহাড়গুলোর চুড়ো দেখল। সাদা কুয়াশা নীল আকাশের সঙ্গে চুড়োগুলোকে জড়িয়ে রেখেছে। যেন পৃথিবীর কোথাও এর চেয়ে শান্ত জায়গা নেই। অরিন্দম সামনের দিকে তাকাল। মিস্টার সেন চুপচাপ চলেছেন। একটু যেন জবুথবু দেখাচ্ছে ভদ্রলোককে। সেদিনের পর ওঁর সংগে আর কথা হয়নি তার। তবে এ কথা ঠিক, দুজনেই চমৎকার অভিনয় করেছেন। সে পেছনের দিকে তাকাল। মালবাহকদের পেছনে ঠক্কর আসছে শিস দিতে দিতে। লোকটা এই রোদেও চোখে রঙিন চশমা তুলেছে। ছুরিটা নিশ্চয়ই ওর কোমরে রয়েছে যা সে স্বচ্ছন্দে ঠাণ্ডা মাথায় ছুঁড়ে যে কোন মানুষকে খুন করতে পারে। বস্তুত একজন খুনী তাদের সংগে চলেছে জানতে পারলে এই দলের অনেকেই যাত্রাভংগ করবে। দুটো জিনিস কিছুতেই ওর মাথায় পরিষ্কার হচ্ছিল না। ঠক্কর কেন লোকটাকে খুন করল ? তাঁবুতে উঁকি মারার শাস্তি কি এত ভয়ানক হতে পারে ? যাকে খুন করেছিল সে কি ঠক্করের পূর্ব পরিচিত ? কোন অতীত ঝামেলার বদলা নিল ? এসব প্রশ্ন নিয়ে লোকটার সংগে কথা বলার কোন সুযোগ নেই। আততায়ীর মুখ ভাল করে দেখতে পায়নি সে। সেই জামাল না জামিল নামের লোকটা যে মদ খেয়েছিল বলে চ্যাটার্জী খেপে গিয়েছিল সে যদি খুন হয়ে থাকে তবে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু সেই সংগে মনে হচ্ছে ঠক্কর তার তাঁবুতে সারাক্ষণ ছিল না। অর্থাৎ ওই আততায়ী যুগলের গতিবিধি সে আগে থেকেই লক্ষ্য করে থাকবে। কিন্তু কেন ?

যে আবহাওয়ায় বাইরে পা বাড়ানো মুশকিল সেখানে ঠক্কর কেন ঘুরে বেড়াবে ? দু নম্বর ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। লাস খুঁজতে চ্যাটার্জীরা যেমন এল না তেমন সে বলা সত্ত্বেও বসন্তরা সামান্য উত্তেজিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন প্রতিক্রিয়া দেখায় নি। কে খুনী এবং লাশ কোথায় তা নিয়েও বেশি আগ্রহ দেখায়নি। যেন ব্যাপারটা ঘটেনি অথবা ঘটলেও ও এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল।

কলকাতা শহরে যে আচরণ স্বাভাবিক পাহাড়ে এসে কি তা পাল্টে যায় ? হয়তো তাই। পাহাড় মানুষকে কি অনেক বেশি নির্মম এবং স্বার্থপর করে তোলে ? পাহাড়ে এলে কি মানুষ অনেক বেশি আদিম হয়ে যায় ?

ওরা হাঁটছিল স্বাভাবিক পায়ে। পথ বলতে পায়ে চলার চিহ্ন ধরে। বিক্রম মাঝে মাঝে লাইন থেকে সরে গিয়ে দলটার ছবি তুলছিল। পথ এখনও ভয়ঙ্কর নয়। একটা নাগাদ ওরা যখন থামল তখন দেখা গেল অনেকের পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে। একটা ঝরনার ধারে মধ্যাহ্নভোজনের জন্যে আধ ঘণ্টা জিরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এখান থেকেই তাদের খাওয়াদাওয়ার সম্পূর্ণ দায়িত্ব শেরিঙের। পুরোদলটা ঝরনার পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিল। জুতো খুলে ফেলেছিল কেউ কেউ। সহদেব ঘুরে ঘুরে বলে এল, 'হাঁটু মুড়ে বসবেন না কেউ। পা ভারী হয়ে গেলে হাঁটা মুশকিল হয়ে যাবে পরে। ফোস্কা পড়লে ব্যাণ্ডেড লাগিয়ে নিন। ঝরনার জল কেউ খাবেন না।'

অরিন্দম খানিকটা দূরে একা বসেছিল। সে মাঝে মাঝে নজর রাখছিল ঠক্করের ওপর। লোকটা বসেছে ঠিক উল্টো দিকে। জায়গাটা ছায়ায় ঘেরা। জলের শব্দ এবং সেই সঙ্গে একটা হিম উঠে আসছে সমানে। অরিন্দমের মনে হল তার মত ঠক্করও তাকে সমানে লক্ষ্য করে যাচ্ছে। বিক্রম ছবি তুলতে তুলতে এর মধ্যেই কাহিল হয়ে একটা পাথরের ওপর শুয়ে পড়েছে। অরিন্দম দেখল একটা খাবারের প্যাকেট হাতে নিয়ে কল্পনা তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে হাত বাড়িয়ে সেটাকে নিয়ে থ্যাংকস বলতেই কল্পনা বলল, 'রাগ করেছেন ?'

'কেন ? হঠাৎ এই প্রশ্ন ?' অরিন্দম অবাক না হয়ে পারল না।

'ও।' কল্পনা যেন একটু থিতিয়ে গেল।

অরিন্দম বলল, 'তোমার প্রশ্নটা কেন মনে এল খুলে বল।'

'কাল থেকে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন না।'

'সুযোগ পাইনি। তাছাড়া তুমিই তো আমার তাঁবুতে আর আসনি।'

'ওমা। শুধু আমাকেই বারে বারে যেতে হবে। অন্তত ওরকম আর্তনাদটা হবার

পর খোঁজ নিতে পারতেন।'

'পারতাম। কিন্তু তোমার খোঁজ নেবার লোকের অভাব নেই।'

'তাই নাকি! যা ভাল বোঝেন! আপনার পকেট থেকে রুমালটা পড়ে গেছে।'

অরিন্দম মুখ ফিরিয়ে দেখল সে যেখানে বসে আছে তার ঠিক পাশেই একটা ছোট্ট সাদা রুমাল। এ ধরনের রুমাল সে ব্যবহার করে না। এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় ওটা এল কি করে! অন্যের রুমাল, কিন্তু নোংরা নয়। সে দুটো আঙুলে সেটাকে তুলতেই নাকে গন্ধ লাগল। এই গন্ধ সে কালীঝোরা ডাকবাংলোয় পেয়েছিল। এই গন্ধের ব্যবহারকারিণীকে সে জানে। রুমালটা মহিলার বুঝতে পেরে কল্পনার ঠোঁটে বিরক্তি ফুটল। ও যে চলে যাচ্ছে না সেটা লক্ষ্য করল না অরিন্দম। তার মাথায় একটাই চিন্তা, এখানে রুমাল কেন ?

হু হু হাওয়া বইছে। তাঁবুগুলো টাঙানো হয়েছে পাহাড়কে দেওয়াল করে, যাতে হাওয়ার দাপট সহ্য করতে পারে। লাচেন ছাড়াবার পরও যে গাছপালা সঙ্গী ছিল তা এখন উধাও। কোথাও কিছু ঝোপ আছে, এই মাত্র। টানা বিকেল পর্যন্ত হাঁটার পর মালবাহক আর সহদেব সেন ছাড়া সবাই কাহিল হয়ে পড়েছে। মালবাহকরা অবশ্য তাদের অনেক আগেই এখানে পেঁছে শেরিঙের জিনিস তাঁবুতে ফেলে উনুন ধরিয়েছিল। ওরা যখন পেঁছেছিল তখন গরম চা তৈরী। রোদ নেই। কিন্তু দিন আছে। আর সেই সঙ্গে হাওয়া। তার গর্জন শুনলেই বুক কাঁপে। রুমালটা পাওয়ার পর অরিন্দম সমস্তটা পথ তন্নতন্ন করে খুঁজেছে আর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা। সে হতাশ হয়েছে। আগের দলটার কোন অস্তিত্ব নেই। কথাটা ঠিক, ওরা একদিনের পথ এগিয়ে রয়েছে। তাঁবুতে পেঁছাবার পর ওদের গত রাত্রিবাসের চিহ্নগুলো দেখা গেল।

লাচেনের মত নিজস্ব তাঁবুতে বাস করার সুবিধে এখন নেই। বসন্ত ঠিক করে দিচ্ছিল কে কোন তাঁবুতে থাকবে। সারাদিন হাঁটার পর ওকে খুব কাহিল দেখাচ্ছিল। বসন্ত এল অরিন্দমের কাছে। সে পথ চলার সময় অরিন্দমের সঙ্গে

বেশী কথা বলেনি। বসন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, আপনি কোন তাঁবুতে থাকবেন ?'

'যেখানে রাখবে।' অরিন্দম একটা ছোট পাথরে পা ছড়িয়ে বসে ছিল।

'আপনি আমাদের তাঁবুতে থাকতে পারেন। মানে দুটো তাঁবুতে চারজন করে থাকতে হবে। আপনি আমাদের সঙ্গে থাকলে বিক্রম, মিস্টার সেন, বিদেশবাবু আর ঠক্কর দ্বিতীয়টায় থাকবে।'

'এক্ষেত্রে তোমাদের সঙ্গে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ মিস্টার সেনদের সঙ্গে থাকলে নাক ডাকার দাপটে রাত্রে ঘুমাতে পারব না।'

অরিন্দম তার পছন্দের কথা জানিয়ে দিতে বসন্ত চলে গেল। গরম চা এখন অমৃতের চেয়ে বেশী জীবনদায়ক। কিন্তু হাতের মুঠোয় গরম গ্লাস কত তাড়াতাড়ি মিইয়ে যায় এখানে। দিয়ে যাওয়া গ্লাস প্রায় এক চুমুকেই খালি করে ছেলেটিকে ফিরিয়ে দিয়ে অরিন্দম সামান্য হোঁচট খেল। বছর ষোল সতেরর ছেলেটির শরীরে যে গরম পোশাক তা পরে কলকাতার লোক দার্জিলিং-এ আসতেও সাহস করে না। নিজেকে ওর কাছে প্রায় জাম্বুবানের মত দেখাচ্ছে। অরিন্দম ছেলেটির সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করল, 'তুমি এখানে এর আগে কখনও এসেছ ?'

'জী।' মাথা নাড়ল ছেলেটি। কিন্তু তার ছোট্ট চোখজোড়া অরিন্দমের মুখ থেকে দৃষ্টি সরাচ্ছিল না।

'আর কত দূরে গেলে আমরা বরফ পাব ?'

ছেলেটি হাত তুলে একটা দিক দেখাল। তাতে যে দূরত্ব পার বুঝে নাও। অরিন্দম এবার না জিজ্ঞাসা করে পারল না, 'তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না ?'

ছেলেটি সরল হাসল। এর অর্থ কি সে নিজেই হয়তো জানে না। তারপর আচমকা জিজ্ঞাসা করল, 'আপ হিরো ?' বলেই একটা হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শূন্যে কয়েকবার চালালো মুখে ঢিসুম ঢিসুম শব্দ তুলে।

অরিন্দম হো হো করে হাসল। অনেকদিন বাদে মন খুলে এভাবে হাসতে পারল সে। ছেলেটি তখন সম্ভবত ঘাবড়ে গিয়েই দ্রুত হাঁটতে শুরু করেছে। ওর হাসির আওয়াজেই সম্ভবত এত ঠাণ্ডাতেও কল্পনা তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। অরিন্দম দেখল বেশ অবাক হয়েই সে আবার ফিরে গেল ভেতরে। এই আসা এবং যাওয়াটা অবশ্যই ছবির মত।

পাহাড়ে আলো নিভে যাওয়ার সময় বড় বিষণ্ণ হয় পৃথিবী। কেমন মায়াময়

একটা ছায়ার কড়াই যেন উপড়ে করে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা এবং বাতাস জোরালো হয়ে উঠছে। পাথরের ওপর বসে থাকাই এখন রীতিমত কষ্টকর। উঠে দাঁড়াল অরিন্দম। এবং তখনই সে জীবনে প্রথমবার অন্ধকারকে এগিয়ে আসতে দেখল। নিচের খাদ থেকে যেন কালো, জমাট কালো একটা ঢেউ তিরতিরিয়ে ওপরে উঠে আসছে। আর তার শরীরে সমস্ত চরাচর মিশে যাচ্ছে অসহায়ভাবে। দৃশ্যটা দেখামাত্র বুকের ভেতর বাতাস আটকে গেল এক লহমার জন্যে। এভাবেই কি মৃত্যু জীবনের দিকে থাবা বাড়ায়?

তাঁবুতে আজ চারটে হ্যামক। এবং সেগুলো বেশ নিচু করেই ঠাঙানো। কল্পনা নিজের হ্যামকে বসে ট্রাঞ্জিস্টার চালাতে চেষ্টা করছিল। কোন স্টেশনই ধরতে পারছে না বলে তার একাগ্রতা বাড়ছিল। অরিন্দম যে তাঁবুতে ঢুকেছে সেটাও লক্ষ্য করল না মেয়েটা।

হঠাৎ বসন্তর গলা কানে এল, 'দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কি ভাবছেন?'

'একটি কবিতার কথা।' অরিন্দম কথাটা শেষ করতেই দেখল কল্পনা চমকে মুখ তুলেছে। এবং শেষ পর্যন্ত বিস্ময় সে প্রকাশ না করে পারল না, 'আপনি কবিতা পড়েন?'

'এক জীবনে আর কত পড়া যায়!' কথাটা বলে অরিন্দম হ্যামকে বসল। কল্পনা মুখ নামিয়ে নিল।

বসন্ত বলল, 'যদি সব ঠিক থাকে তাহলে সহদেব বলছে পরশু সকালে আমরা স্পটের দিকে রওনা হতে পারি।'

সহদেব প্রতিবাদ করল, 'ঠিক হল না, স্পটটা লোকেট করতে পারলে তবেই ওরকম ভাবা যেতে পারে।'

কথাটাকে আমল দিল না বসন্ত, 'আমরা এত কাছাকাছি এসে গেছি, প্রচণ্ড টেনশন হচ্ছে। আপনি ভেবে দেখুন দাদা, স্যুটকেসটা পাওয়া গেলে এবং অফ-কোর্স যদি ক্যানগুলো ঠিক থাকে তাহলে কি রকম ব্যাপার হবে।'

সহদেব বলল, 'ক্যান পেলে ধরে নিতে পার ছবি সুপার হিট।'

বসন্ত গলা তুলল, 'ওটা এমনিতেই হত।'

'না পেলেও?' অরিন্দম হেসে ফেলল। সহদেব বলে উঠল, 'বসন্ত, শেরিঙের সঙ্গে কয়েকটা জরুরী কথা বলে নিতে হবে। তুমি আসবে?' বোঝা যাচ্ছিল বসন্তর এখন আর তাঁবু ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না। সে তবু উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করল, 'মিস্টার সেনের ব্রিফকেসে কি আছে দাদা?'

'হীরে।'

'এ্যাঁ?' চমকে উঠল বসন্ত। সহদেব মুখ ফেরাল।

'কি ধরনের ব্রিফকেস?' বসন্ত আবার জিজ্ঞাসা করল।

'আমি দেখিনি। মিস্টার সেনকে জিজ্ঞাসা কর।'

'ঠক্কর ব্যাপারটা জানে?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

'যেভাবে একটার পর একটা ঝামেলা হল, একটা খুনও হয়ে গেল, আমাদের আরও সাবধানে থাকা উচিত। আমি ডেফিনিট নই, কিন্তু লোকটাকে আমার আর সহ্য হচ্ছে না।'

'কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ বসন্ত, লোকটা আমাদের প্রচুর উপকার করেছে।' অরিন্দম হাসল, 'আর কে বলতে পারে হীরের ব্রিফকেসটা তুমিই হয়তো খুঁজে পেতে পার।'

চমকে তাকাল বসন্ত। তার মুখের অভিব্যক্তি সে লুকিয়ে রাখল না। ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর অরিন্দম যেন নিজের মনেই উচ্চারণ করল, অকারণ উদ্বিগ্নতা মানুষের পায়ের তলার মাটিকে বড্ড পিছল করে দেয়।

কল্পনা ট্রাঞ্জিস্টারে তখনও আঙুল রেখেছিল। এবার সেটাকে সরিয়ে রেখে আচমকা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

হ্যামকে শরীর এলিয়ে দিয়ে অরিন্দম বলল, 'স্বচ্ছন্দে।'

'আপনি নিজেকে এভাবে লুকিয়ে রাখেন কেন?'

'সে কি? আমার মত প্রকাশিত মানুষ আর কজন আছে!' অরিন্দম গলা তুলে হাসল, 'টিকিট কেটে হলে ঢুকলেই আমাকে বিভিন্ন রূপে দেখা যায়। মাঝে মাঝে এমন কথা বল কেন যার কোন অর্থ হয় না।

'তাই?' ছোট শব্দটি উচ্চারণ করল কল্পনা। অরিন্দম মুখ ফিরিয়ে ওকে দেখল।

'আমি ভেবে পাচ্ছি না আপনার মত প্রতিষ্ঠিত নায়ক কলকাতা ছেড়ে এরকম অভিযানে কোন টানে আসবেন? শুধু ওই ফিল্মের ক্যান খুঁজে পেতে? মনে হয় না। কেন একটার পর একটা ঝামেলায় আগ বাড়িয়ে জড়িয়ে পড়ছেন? এমনও মনে হয় অনেক কিছু জানার পর আপনি কারো কাছে প্রকাশ করছেন না।'

'চমৎকার। আর কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ। আপনি আমাকেও ভুল বুঝেছেন।'

'এসব কথা এখানে আলোচনা করার সময় নয় কল্পনা। তবু বলি, ভুল বোঝার ব্যাপারে চিরকাল তো আমিই শিকার হয়েছি। জন্মাবার পরেই ঈশ্বর আমার কপালে লিখে দিয়েছিলেন সে কথাটা। আমার কোন বন্ধু নেই। চারপাশে যারা ভিড় করে তারা বন্ধুর মুখোশ পরা কিছু সুযোগ-সন্ধানী। তোমাকে আমি ভুল বুঝতে যাব কেন? ধর তোমার সঙ্গে বসন্তর, আমি শুধু কথা বলার সুবিধের জন্যে নাম দুটো বলছি, নিজস্ব সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু বসন্তর আচরণে তুমি অপমানিত হয়ে তাকে ত্যাগ করে এলে। এই সময় আমার সঙ্গে তোমাকে দেখা গেলে মানুষেরা বলতে ভালবাসবেন যে আমি তোমাদের বিচ্ছেদের কারণ হয়েছি। প্রথম প্রথম এই ধরনের কথায় জ্বলতাম। এখন গায়ে মাখি না! হ্যাঁ, এ কথা ঠিক আমি প্রকাশ করতে চাই না নিজেকে। কারণ ওই একই। একজনকে আমি ভালবাসতাম। হ্যাঁ, আমি সেই ভালবাসার কথা বলছি যেখানে আঘাত পড়লে শরীরের প্রতিটি নার্ভে আলোড়ন ওঠে। তার কাছে আমি এত বেশী খোলা কথা বলতাম, নিজের প্রতিক্রিয়া এত উগ্রভাবে বুঝিয়ে দিতাম যে সে সহ্য করতে পারল না আমাকে। আমি আবিষ্কার করেছি আমাব মধ্যে এমন একটা উত্তাপ আছে যার সংস্পর্শে এসে জ্বলতে হয়। তাই এভাবেই থাকা ভাল। এই নিজের সঙ্গে কথা বলে চারপাশের মানুষগুলো নিত্য দেখে যাওয়া। এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হোক কল্পনা।' অরিন্দম উঠে দাঁড়াল কথা শেষ করেই, 'আমি একটু দিশি জিনিস পান করব। অনন্তকে দিয়ে লাচেনে আনিয়েছিলাম! তোমার আপত্তি আছে?

মাথা নাড়ল কল্পনা। তারপর হঠাৎই বলল, 'আপনার জীবনে প্রচুর নারী এসেছে, না?'

মাথা নাড়ল অরিন্দম, 'আবার ওসব কথা কেন?'

কল্পনা বলল, 'এটাই শেষ প্রশ্ন ছিল।'

অরিন্দম বোতলটা বের করে একটা গ্লাসে ঢালল খানিকটা, 'এসেছে। আমি তাদের ধরে রাখতে পারিনি। দোষ হয়তো আমারই! কারণ আমি আত্মসমর্পণ করার একটা সীমা আছে বলে মনে করি। তবে জেনো, আমি কখনও কোন নারীকে অপমান করিনি।' চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করল অরিন্দম। তারপর পানীয়টি গলা দিয়ে চালান করে বলল, 'বাঃ। চমৎকার গরম লাগছে। প্রয়োজন হলে চুমুক দিতে পার।'

ঝড়ো বাতাস এবং কড়া ঠান্ডা সত্ত্বেও এত পোকা কি করে আসছে তাই নিয়ে

কথা বলছিল সবাই। তাঁবুগুলোর গায়ে চাপ বেঁধে পড়ে রয়েছে ওরা। মিনি জেনারেটারের আলো টেনে এনেছে ওদের। সম্ভবত এই পরিবেশে কখনোই আলো জ্বলেনি। সন্ধ্যের পরেই খাওয়ার পাট চুকিয়ে যে যার স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়েছে। সাড়ে সাতটায় আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। তেল বাঁচিয়ে রাখতে হবে ভবিষ্যতের জন্যে। বিক্রম উশখুশ করছিল দ্বিতীয় তাঁবুতে। সারা দিনে সে বেশ কিছু ভাল দৃশ্য ধরতে পেরেছে। কিন্তু তবু মন ভরছে না। সে একটু বেশী কথা বলে। এই তাঁবুর লোকগুলো মুখে কুলুপ এঁটে পড়ে আছে। সে তবু কথা বলার চেষ্টা করল, 'পোকাগুলো যদি ভেতরে ঢুকতে পারে তাহলে হিচককের ছবি হয়ে যাবে। কি বলেন?'

অন্য হ্যামকগুলো থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মিনিট খানেক বাদে সে আবার বলল, 'সন্ধ্যেবেলায় ঘুম আসে? কারো কাছে হুইস্কি টুইস্কি আছে?'

এবার ঠক্করের গলা পাওয়া গেল, 'হিরোর কাছে দিশি মাল আছে।'

বিক্রম বলল, 'দিশি? যাচ্ছলে! ভাবা যায় টালিগঞ্জের নাক-উঁচু নায়ক দিশি খাচ্ছে! অবশ্য এই জায়গায় তাই বা কে দিচ্ছে। কিন্তু এই ঠাণ্ডায় বাইরে বেরিয়ে কে যাবে ওদের তাঁবুতে।' সে নিঃশ্বাস ফেলল, 'হিরোদের অনেক সুবিধে। নায়িকাও ওই তাঁবুতে আছে।'

বিদেশবাবু কথা বললেন অন্ধকারে, 'ওদের তাবুতে আরও দুজন পুরুষ আছে।'

'ছাড়ুন মশাই। একবার একটা ছবির আউটডোরে গিয়েছি। রাত্রে আমার ঘরে একটা উঠতি অভিনেতা ছিল। ভাল দেখ্যত। সবে নাম হচ্ছে। পাশের ঘরে টালি-গঞ্জের ঠাকুমা-নায়িকা ছিলেন একা। হঠাৎ মাঝরাত্রে এসে তিনি দরজায় নক করে আমায় বললেন, 'ওকে একটু আমার সঙ্গে দেখা করতে বলুন তো বিক্রমবাবু, আলোচনা আছে!' ছেলেটি যেতেই সেই যে দরজা বন্ধ হয়ে গেল, ভোরের আগে খুলল না। চক্ষুলজ্জার কোন বালাই মশাই ওদের নেই।'

বিদেশবাবু বললেন, 'না না। হিরোবাবু ওই মহিলার প্রতি ইণ্টারেস্টেড নয়।'

বিক্রম খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'লাচেনে কে খুন হল, কে খুন করল বুঝতেই পারলাম না।'

ঠক্কর জবাব দিল, 'আপনি দয়া করে চুপ করুন।'

বিক্রম জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কেউ রামি খেলতে পারেন। মাইরি একটুও

ঘুম পাচ্ছে না।'

কেউ জবাব দিল না। সে পাশ ফিরে শুল। তারপর টালিগঞ্জের নায়িকাদের মুখ গুনতে চেষ্টা করল। গোনাগুনি করলে নাকি ঘুম আসে। কিন্তু— ! বিক্রম নিঃশ্বাস ফেলল, টালিগঞ্জে এখন একটিও সুন্দরী নায়িকা নেই যাকে গুনতিতে আনা যায়।

কবজি চোখের সামনে নিয়ে এলেন মিস্টার সেন। ঘড়ির গোপন আলো বলছে রাত ন'টা। বিদেশের নাক ডাকছে। বিক্রমের কোন সাড়া নেই ঘণ্টা দেড়েক। শুধু ঠক্কর জেগে আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। অন্ধকারে তাঁবুর ভেতরটায় দৃষ্টি চলে না। বুকের ভিতর ড্রাম বাজছে। কিন্তু সারাদিন ভেবেছেন তিনি, ঝুঁকিটা নিতেই হবে। বাইরের ঠাণ্ডা অবশ্যই জিরোতে নেমেছে। রাত বাড়লে মাইনাসে পেঁছে যাওয়া বিচিত্র নয়। যা কিছু গরম জামাকাপড় আছে শোওয়ার আগে মাথার কাছে বের করে রেখেছেন। তবু ভয় হচ্ছে। যদি ঠাণ্ডায় জমে যান তাহলে উদ্যোগটাই অর্থহীন হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি এতদূরে পেঁছে বঞ্চিত হতে চান না। তাঁরই পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে চ্যাটার্জী এবং মহিলা বাকি জীবন ফুর্তিতে কাটাবে ভাবলেই মাথা গরম হয়ে যায়। তিনি শেরিঙকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন রাত্রে পাহাড়ে হাঁটায় বিপদ আছে কিনা। শেরিঙ অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। তারপর মাথা নেড়ে বলে-ছিল, 'কোন বিপদ নেই, শুধু ঠাণ্ডা নেমে আসবে আপনার মাথায়। তার চাপে আপনি মাটিতে শুয়ে পড়বেন। ব্যস।'

কিন্তু মিস্টার সেন একটা হিসেব করেছেন। পনের হাজার ফুট ওপরে যে ঠাণ্ডা পঁচিশ হাজারে তার চেয়ে অনেক বেশি। পনের হাজারের রাত আর পঁচিশের দিন যদি এক হয় তাহলে পঁচিশের পোশাক পরে পনেরর রাতে হাঁটা যাবে না কেন ? ওরা আছে একদিনের পথ এগিয়ে। এভাবে চললে তিনি কোনদিন ওদের ধরতে পারবেন না। তাঁকে ঝুঁকি নিতেই হবে।

স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এসে নিঃশব্দে পোশাক পরতে আরম্ভ করলেন মিস্টার সেন। অনেক চেষ্টার পর কলকাতা থেকে তিনি এই পোশাক সংগ্রহ করে-ছেন যা আটাশ হাজার ফুট ওপরেও ব্যবহার করা যায়। তাঁবুর ভেতরে নিঃশ্বাসের শব্দ পাক খাচ্ছে। তৈরি হতে বেশ সময় লাগল তাঁর। এবার হাত বাড়িয়ে খুঁজে নিলেন। বেশ কিছু টিনফুড, ওষুধ আর প্রয়োজনীয় জিনিস আলাদা সংগ্রহ করে-ছিলেন তিনি। সেই জিনিসগুলোর মধ্যে থেকে টর্চ আর ছুরি বের করে নিলেন এখন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। কোন প্রশ্ন ছুটে এল না। ওরা যদি

জানতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই বাধা দেবে। এই বাধাটাকেই এড়াতে চাইছেন তিনি। ধীরে ধীরে বিক্রমের পাশ দিয়ে হে'টে তাঁবুর দরজায় শেষ পর্যন্ত পে'ছে গেলেন মিস্টার সেন। এবং তখনই প্রশ্নটা বাজল, 'কোথায় যাচ্ছেন ?'

জিভ শুকিয়ে গেল মিস্টার সেনের। উত্তর দিতে কয়েক সেকেন্ড লাগল। যখন দিলেন তখন নিজের গলাই অপরিচিত ঠেকল, 'টয়লেট'। ঠক্কর আর কোন কথা বলল না। লোকটা কি অন্ধকারেও দেখতে পায় ? তাঁবুর দরজা খুলে বাইরে এসে মিস্টার সেন দরজাটা এ'টে দিলেন। লোকটা আবার পেছন পেছন আসবে না তো ? বাকি দুটো তাঁবু এখন অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আকাশে বিবর্ণ চাঁদ উঠেছে। হাওয়ার দাপটে একটু কে'পে উঠলেন তিনি। শেষ মুহূর্তে আর একবার দ্বিধা এল। এবং তখনই মহিলার মুখ মনে পড়তেই তিনি পা বাড়ালেন।

প্রায় ভূতে তাড়ানোর মত তিনি মিনিট পাঁচেক হে'টে পেছনে তাকালেন। তাঁবুগুলোকে আর দেখা যাচ্ছে না। উত্তেজনা ঠান্ডাকে চেপে রেখেছে। আজ বিকেলে শেরিঙের সংগে কথা বলে তিনি জেনেছিলেন কোন পথে যেতে হবে। যদিও পথ ভুল করার সম্ভাবনা সত্তর ভাগ কিন্তু তিরিশের সুযোগ নেবেন না কেন ? জোরে জোরে পা ফেলতে লাগলেন। ঢালু জমি শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি থমকে দাঁড়ালেন। এবার পাহাড় ভাঙতে হবে। টর্চ জ্বাললেন মিস্টার সেন। কিছুক্ষণ খোঁজার পর মনে হল একটা হালকা কিছু আছে পাথরের ওপর। হয় তো এ পথেই কেউ যাওয়া আসা করেছিল। ঘড়ি দেখলেন তিনি। সাড়ে দশটা বেজেছে। এক রাতে তাঁকে দূরত্বটা অতিক্রম করতে হবে। ভাগ্যিস কলকাতা থেকে এই পোশাক এনেছিলেন। নইলে এখনই ঠান্ডায় জমে যেতে হত। পাহাড় ভাঙতে শরীরের কষ্ট হচ্ছে কিন্তু ঠান্ডার চাপ সহ্য করতে হচ্ছে না। মিনিট পাঁচেক ওঠার পর হাঁপাতে লাগলেন তিনি। মাথার ওপরে পান্ডুর চাঁদ। পেছনে বা সামনে কোন প্রাণের চিহ্ন নেই। ব্যাটা ঠক্কর তাঁকে অনুসরণ করেনি। লোকটা খুনী। যেভাবে অকারণে ছুরি ছু'ড়ে একটা জল-জ্যান্ত মানুষকে খুন করল, শুধু খুনই নয় শরীরটাকে খাদে ফেলে দিয়ে এল তাতে লোকটার ওপর ভরসা করা যায় না। আততায়ীর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে তিনি সতর্ক হয়ে ওর গতিবিধি লক্ষ্য করতে গিয়ে খুনটাকে আবিষ্কার করলেন। এবং তার চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার অরিন্দম সমস্ত ঘটনায় সাক্ষী হয়েও প্রকাশ করেনি ঠক্করের কান্ডটা। মিস্টার সেন বুঝেছিলেন ব্যাপারটা যে জেনেছেন তা না জানানোই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু তাকে খুন করতে পাঠিয়েছিল কে ? এখনও এই অবস্থাতেও তিনি বিশ্বাস করতে

পারেন না মহিলা এই কাণ্ড করতে পারেন। চ্যাটার্জীর পক্ষে সবই সম্ভব। কিন্তু চ্যাটার্জীর হাতে ওই মহিলা যে নিরাপদ নয় সেটাই উনি বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভালবাসা এবং অহংকার এমন দুটি বস্তু যা সমস্ত বিবেচনা শক্তিকে অকেজো করে রাখে। তাঁকে বিবাহ করার পর মেনে নিতে পারেননি মহিলা। ওঁর রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনযাত্রার সঙ্গে নাকি তাঁর কোন মিল নেই। তিনি আলাদা হতে চাইলে মিস্টার সেন আপত্তি করেছিলেন। আর সেই থেকে সংঘাত। ওঁকে উপেক্ষা করে মহিলা তাঁরই বন্ধুদের সঙ্গে খেলায় মত্ত হলেন। এইরকম এক খেলার সঙ্গী চ্যাটার্জী। কিন্তু লোকটার আস্তিনে ছুরি লুকানো আছে তা মহিলা বুঝবেন হীরে খুঁজে পেলে। না। কারো বিরুদ্ধে মিস্টার সেনের অভিযোগ নেই। তিনি নিজের ব্রিফকেস খুঁজে পেয়ে ফিরে যেতে চান, ব্যস। মিস্টার সেনের যাত্রা আবার শুরু হল।

ভোরবেলায় চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল। সূর্যদেব তখনও ওঠেননি। পুব আকাশের অন্ধকারে তখন লাল আলোর বল সবে গড়াতে শুরু করেছে। আর পৃথিবী তার তীব্রতম শীত ছড়িয়ে রেখেছে প্রকৃতিতে। বসন্ত এবং সহদেব আপাদমস্তক মুড়ে বেরিয়ে এসে দেখল আগুন জ্বালা হয়েছে। কিন্তু বিদেশবাবু এবং ঠক্কর তাদের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে। ওদের দেখামাত্র বিদেশবাবু হাউ-মাউ করে কিছু বলে উঠলেন। ঠক্কর তাকে ধমকে থামাল। তারপর হিন্দীতে বলল, 'মিস্টার সেন মিসিং।'

চিৎকারে ঘুম ভেঙেছিল অরিন্দমের। কিন্তু স্লিপিং ব্যাগের আরাম থেকে শরীর বের করছিল না সে। ঠক্করের কথা তার কানে যাওয়া মাত্র কপালে ভাঁজ পড়ল। বসন্তর গলা শোনা গেল, 'মিসিং মানে? কি বলছেন?'

বিদেশ বললেন, 'ওরা নিশ্চয়ই ওঁকে খুন করেছে। হায়, হায়, এখন আমি কি করব।'

ঠক্কর ধমক দিল, 'চুপ করুন। কাল রাত্রে উনি চুপচাপ তাঁবু থেকে বেরিয়ে

যাচ্ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করায় বললেন টয়লেটে যাচ্ছেন। তারপরেও আমি আধ ঘণ্টা জেগেছিলাম কিন্তু উনি ফিরে আসেননি। বাইরে কোন শব্দ হয়নি সেই সময়।'

বিদেশ ক'কিয়ে উঠলেন, 'আধ ঘণ্টায় একটা লোক টয়লেট সেরে এল না আর আপনি চুপ করে রইলেন ?'

'যদি জানতাম উনি চলে যাচ্ছেন তাহলে চুপ করে থাকতাম না।'

বসন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'চলে গেছেন বলে মনে হচ্ছে কেন আপনার ?'

'কারণ উনি ওঁর একটা সাইডব্যাগ আর সমস্ত গরম পোশাক নিয়ে গেছেন।'

সহদেবের গলা শোনা গেল, 'অত রাত্রে এই পাহাড়ে উনি একা গেলেন কোথায় ?'

বিদেশ বলল, 'আমাদের উচিত এখনই ওঁর সন্ধানে যাওয়া।'

সহদেব জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবেন ? কেউ হারিয়ে যেতে চাইলে পাহাড়ে তাকে খ'ুজে পাওয়া যায় না।'

বিদেশ চে'চিয়ে উঠল, 'কিন্তু লোকটা তো মরে যেতে পারে। আমার মনে হয় উনি আগের দলটাকে ধরতে গেছেন। আপনারা তাড়াতাড়ি করুন, প্লিজ।'

সহদেবের গলা শোনা গেল, 'মাপ করবেন। একজনের জন্যে এতগুলো মানুষের জীবন বিপন্ন করতে পারি না। পাহাড় কাউকে দয়া করে না। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা রওনা হব। পথে যদি দেখা হয় হবে।'

বিদেশ চিৎকার করলেন, 'যেতে যেতে যদি আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি তাহলে আমাকে ফেলে যাবেন ?'

সহদেব জানাল, 'দুটো এক ঘটনা নয়। তবু যদি সেরকম ঘটে তাহলে একটা চিকিৎসার চেষ্টা হবে কিন্তু আপনার জন্যে যাওয়া আটকাবে না। যান, আপনারা তৈরি হয়ে নিন।'

বিদেশ প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'মিস্টার সেনকে যদি না পাওয়া যায় তাহলে আমি কি করব ?'

বসন্তর গলা পাওয়া গেল, 'আপনার কিছু করার নেই। মিস্টার সেন নিজের ইচ্ছেয় ঝ'ুকি নিয়েছেন আমি হলে এক্ষেত্রে লাচেনে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করতাম।'

'আমি ওঁকে ফেলে লাচেনে ফিরে যাব ?'

'সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। রাস্তাটা খারাপ নয়। এখন রওনা হলে বিকেলের আগেই পে'ছে যাবেন।'

কথাগুলো বলে বসন্ত তাঁবুতে ফিরে এল। তখনই জেনারেটার চালানোয় আলো জ্বলে উঠল। বসন্ত বুঝল অরিন্দম জেগে আছে। এরকম ঘটনা শোনার পরও অরিন্দম বিছানা ছাড়েনি দেখে সে অবাক হল। বসন্ত বলল, 'মিস্টার সেনের ব্যাপারটা শুনেছেন?'

'শুনলাম।'

'ভদ্রলোকের কি হল কে জানে? আপনার কি মনে হয় ওঁর স্ত্রী ট্র্যাপ পেতে-ছিলেন?'

'না।' নির্লিপ্তের মত জবাব দিল অরিন্দম।

'এটা তো সোজা আত্মহত্যার পথে এগিয়ে যাওয়া।'

'কখনও কখনও মানুষের এ ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না বসন্ত। ওঁর কথা ভুলে যাও। তাছাড়া তুমি তো ওদের বোঝা বইতেই চাইছিলে না। ভালই হল। দুটো বাড়তি লোক কমে গেল।' অরিন্দম পাশ ফিরে শুল।

বসন্ত এই শীতেও উত্তপ্ত হল। তার বিশ্বাস দৃঢ় হল অরিন্দম ইচ্ছে করেই তাকে অপমান করছে। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল কল্পনা চোখে হাত চাপা দিয়ে তার হ্যামকে পড়ে রয়েছে। সে হঠাৎ কড়া গলায় বলল, 'সবাই তৈরি হয়ে নাও। আমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেরুবো।' কিন্তু কেউ সারা দিল না।

চল্লিশ মিনিট হাঁটার পর ওরা ওপরে উঠতে লাগল। মিস্টার সেনের কোন চিহ্ন নেই কোথাও। পাথরের ওপর পা রেখে রেখে উঠতে হচ্ছে। মালবাহকরা যে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগোচ্ছে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রথম প্রথম বেদম হয়ে পড়েছিল অরিন্দম। বারংবার থামতে হচ্ছিল জিরিয়ে নেবার জন্যে। তুলনায় কল্পনা কিন্তু অনেক স্বচ্ছন্দ। বারংবার পিছিয়ে পড়ছে বিক্রম। সে তার ক্যামেরা খোলার চেষ্টা করছিল প্রথম দিকে। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। তাকে ছবি তোলার সুযোগ দিতে দলের কেউ যে দাঁড়াবে না বোঝার পর সে ওই চেষ্টা আর করেনি। সহদেব আর ঠক্কর পাল্লা দিচ্ছে সবার আগে। মালবাহকদের আর দেখা যাচ্ছে না।। শেরিঙ মাঝে মাঝে পিছিয়ে এসে ওদের তাগাদা দিচ্ছিল। প্রায় হাজার ফুট টানা উঠে আসার পর অরিন্দম দেখল নিচের দিকে তাকিয়ে। তার মাথা ঘুরতে লাগল। মিস্টার সেন যদি এই পথে গত রাত্রে এসে থাকেন তাহলে সেটা কি করে সম্ভব হল। দিনের বেলায় যা কষ্টকর তা রাতের অন্ধকারে অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু পাহাড় ভাঙার পরিশ্রমেই শীতের দাপট কমেছে। বরং ভারী পোশাকের নিচে একটু ঘাম জমছে।

বড় একটা পাথর দু'হাতে আঁকড়ে ওপরে নিজেকে তুলে নিয়ে হাঁপাতে লাগল অরিন্দম। শরীরটাকে অনেকটা ঘেঁষটে আনতে হয়েছে। সেই সময় পরিচিত শব্দটা কানে আসতেই সে মুখ ফিরিয়ে দেখল নিচে দাঁড়িয়ে বিক্রম দৃশ্যটাকে তুলে রাখছে। প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল অরিন্দমের। বিক্রম বলল, 'বিউটিফুল শট দিলেন দাদা।'

গালাগাল দেওয়ার বদলে হেসে ফেলল অরিন্দম, 'ওটাকে নিয়ে এখানে উঠবে কি করে?'

'আপনি একটু ধরবেন?'

'ধরতে পারি তবে এক শর্তে। তুমি আর ছবি তুলবে না।'

'পারলাম না দাদা। তার চেয়ে মরে যাব সেও ভাল।'

'দাও।' শরীর ঝুঁকিয়ে হাত বাড়াল অরিন্দম।

গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ এবার সামনে। সমস্ত পৃথিবী যেন ঠাণ্ডা ছায়ায় মাথামাখি। অবশ্য পায়ের তলার এই জলীয় বস্তুটি যে বরফ তা বুঝতে সময় লেগেছিল। ওরা খাওয়ার জন্যে থেমেছিল। সহদেব জানাল একে ঠিক বরফ বলা যায় না। রাতের ঠাণ্ডায় শিশির জমে আছে এই মাত্র। রোদ বাড়লেই গলে যাবে। তবে এগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে আসল বরফের দেখা পেতে দেরি হবে না।

বসন্ত খানিকটা দূরে বসে ছিল। হঠাৎ সে গলা তুলে কল্পনাকে ডাকল। কল্পনা বসেনি। অরিন্দমদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সহদেবের কথা শুনছিল। ডাক শুনে এগিয়ে গেল। অরিন্দম ওর যাওয়াটা দেখল। মেয়েটাকে এখনও সতেজ দেখাচ্ছে। মেয়েদের বুকে সম্ভবত দু'জোড়া ফুসফুস থাকে। পাহাড়ে উঠলেও হাঁপিয়ে ওঠে না তাই, ছেলেদের বেদম করেও নিজেরা শীতল থাকতে পারে সহজেই। বসন্ত কল্পনাকে কি বলছে বোঝা গেল না। এই দূরত্ব থেকে শোনা সম্ভব নয়। হঠাৎ পেছন ফিরে বসন্ত চিৎকার করে উঠতেই দেখা গেল বিক্রম ছবি তুলে যাচ্ছে। ক্যামেরা থামিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল, ক্ষেপে গেলেন কেন?'

'এখন ছবি তুলছ কেন?'

'কম্পোজিশনটা ভাল লাগল। আমার ছবিতে এখন পর্যন্ত রোমাণ্টিক দৃশ্য ছিল না, তাই—।'

'তুমি, তুমি আমাকে অপমান করছ বিক্রম।' চেঁচিয়ে উঠল বসন্ত।

আর তখনই কল্পনা ফিরে এল এদিকে। বিক্রম অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আবার কোথায় অপমান করতে গেলাম দাদা। আমি তো ক্যামেরা নিয়ে এসেছিলাম ছবি তুলব বলেই।'

কল্পনা মন্তব্য করল, 'অন্ধ হয়ে গেলে পৃথিবীর সব কিছু অন্ধকার হয়ে যায় বিক্রমবাবু। আপনি কিছু মনে করবেন না।' অরিন্দম হেসে ফেলল। জীবন বড় বিচিত্র! কিন্তু সে আর কোন উপলক্ষ হতে চায় না। কারণ এই কথার পর বসন্তর অভিযোগের আঙুল তার দিকেই উঠবে অবধারিতভাবে। সে সহদেবকে বলল, 'অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এবার হাঁটা যাক।'

তিনটে নাগাদ ওরা যেখানে পেঁছাল তার আশেপাশে কোন গাছপালা নেই। শীত কম লাগছে। হাওয়াও কমে এসেছে। এবং পায়ের তলায় বরফের গুঁড়োগুলো একটু একটু করে শক্ত হচ্ছে। হঠাৎ ঠক্কর চিৎকার করে উঠল। মাটি থেকে কুড়িয়ে সে যে জিনিসটা দেখাচ্ছে তা দেখে থমকে দাঁড়াল দলটা। অরিন্দম হাত বাড়িয়ে টর্চটা নিল। সহদেব জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কে টর্চ ফেলে যাবে? নিশ্চয়ই আগের দলটা এই বিলাসিতা করবে না।'

বিক্রম বলে উঠল, 'আরে এটা তো মিস্টার সেনের টর্চ। কাল সন্ধেবেলায় আমি নিয়েছিলাম।'

সবাই এ ওর দিকে তাকাল। কেউ শব্দ ব্যয় করল না। দলটা আবার হাঁটতে লাগল।

মিনিট দশেক হাঁটার পর পুরো দলটা থমকে দাঁড়াল। সামনে ধুধু বরফ। পড়ন্ত সূর্যের আলো সেই বরফে পড়ায় রঙের ফোয়ারা উঠেছে সর্বত্র। কল্পনা বলল, 'আঃ, কি সুন্দর।' অরিন্দম গাঢ় গলায় বলল, 'ভয়ঙ্কর সুন্দর।'

শেষ বিকেলের নরম রোদ সোহাগী নারীর মত এলিয়ে রয়েছে আদিগন্ত বরফের ওপর। আর তার ছোঁয়ায় আশ্চর্য রূপসী হয়ে উঠেছে পৃথিবী। অবশ্য এই পৃথিবীকে কখনও দ্যাখেনি অরিন্দম। সাদা বরফের শরীরে ওই রোদ যে রঙের ঝরনা বইয়ে দিচ্ছে তার কোন তুলনা তার জানা নেই। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হেসে ফেলল অরিন্দম। যে-কোন ভাল জিনিস দেখলেই তার কল্পনায় মহিলা এসে পড়ে! আর এই কারণে ক্রমাগত দায় বয়ে যেতে হচ্ছে তাকে। মেয়েদের সঙ্গ পেতে যে-কোন পুরুষেরই ভাল লাগে, কিন্তু যারা বঞ্চিত হয় তারাই নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মুখ মনে পড়ল কেন, যে বলেছিল, 'আমি যদি তোমায় না ভালবাসতাম তাহলে সারাজীবন তোমার সঙ্গে থেকে যেতাম অরিন্দম। তোমার ভালবাসায় অভিশাপ আছে। প্লিজ, একটা কথা রেখো, কাউকে তোমার ভালবাসা দিও না।' সমস্ত শরীরে কাঁপুনি এল। বুকের বন্ধ ঘরে বাতাস দরজা খুঁজে পাচ্ছে না। এই একটা কষ্ট, একটা দীর্ঘশ্বাস যে

কোন সন্দরের সঙ্গে উঠে আসে বকের পাঁজরায়, এসে ঘা মারে। সেই নারী তাকে বলেছিল, 'উদাসীনতা যে দরেত্ব বাড়ায় তা ভালবাসা দিয়ে পর্ণ করা যায় না। বরং এই ভাল। আমি থাকি আমার মত। তুমি সমস্ত কাজ শেষ কর। মনের বয়স আমার কোন কালে বাড়বে না, দেখো।'

এবার এখানে আসবার আগে মনে হয়েছিল দেখা করার কথা। প্রতি সপ্তাহে যার সঙ্গে শুধু টেলিফোনে যোগাযোগ সেই নারীর মুখোমুখি হতে পারেনি যে অন্তত দশটি বছর, সে বলেছিল, 'আমি তো আছিই। কে তোমার নামে কি বলল তাতে আমার কিছু এসে যায়নি যখন, তখন নিশ্চয়ই থাকব। শুধু ফিরে আসা পর্যন্ত নিজেকে ভাল রেখো।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল অরিন্দম। যাকে সে অনবরত ভুলে থাকতে চায় সে কেন যে কোন সন্দরের সামনে এসে দাঁড়ালে এমন দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে আসে।

শব্দটা কানে যাওয়ামাত্র চমকে পিছু ফিরল সে। বিক্রম ছবি তুলছে মনের আনন্দে। ক্যামেরা ঘুরিয়ে সে অরিন্দমকে ধরল, ধরে চেঁচিয়ে বলল, 'দাদা, একটু মুভ করুন।'

কয়েক পা হাঁটল অরিন্দম। তারপরেই সোজা ক্যামেরার দিকে এগিয়ে গেল। বিক্রম ওটাকে বন্ধ করে বলল, 'যা, আউট অফ ফোকাস হয়ে গেল।' অরিন্দম এক মুহূর্ত দাঁড়াল, 'ফোকাসেও ধরতে পারবে না। এই ধড়াচুড়ো পরার পর আমার সঙ্গে তোমার কোন পার্থক্য নেই, বুঝলে।'

রাত্রিবাসের আয়োজন সম্পূর্ণ। শেরিঙের লোকজন তৎপরতার সঙ্গে তাঁবু টাঙিয়ে ফেলছে একটা পাহাড়কে দেওয়াল রেখে। বরফের ওপর দিয়ে প্রায় সিকি মাইল হেঁটে এসেছে ওরা। এখন পর্যন্ত ভেঙে পড়া বিমানের কোন হদিশ চোখে পড়েনি। সহদেব অবশ্য বলছে জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে যে স্পটে পৌঁছে, তা এখনও অনেক দূরে। দ্বিতীয়ত, মিস্টার সেন অথবা অগ্রবর্তী দলটির সঙ্গে তাদের ফারাক কতটা তাও বোঝা যাচ্ছে না। ওদের কোন চিহ্নও নেই। হয় ওরা এগিয়ে যাওয়ার পর নতুন বরফ পড়েছে নয় ওরা এগিয়েছে ভিন্ন রাস্তায়। এখন দলের প্রত্যেকের পোশাকই পাল্টে গিয়েছে। পায়ে বরফের জুতো উঠেছে। শরীর এবং পোশাকের ভার একত্রিত হওয়ায় নিজের ওপর প্রথম দিকে নিয়ন্ত্রণ আনা যাচ্ছিল না। এই সিকি মাইল পথে তেমন কোন অসুবিধে হয়নি। কিন্তু সহদেব আগামীকাল আরও সতর্ক হয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কাল থেকে দলটাকে দড়ি ব্যবহার করতে হবে বলে সে জানিয়েছে। কোন বরফ কতটা পাতলা, কোথায় খাদ

লুকিয়ে আছে তা জানা সম্ভব নয়। আজ বরফের ওপর হাঁটার জন্য বিশেষ ভাবে তৈরি লাঠি ব্যবহার করেছে সবাই। জিনিসটা সত্যিই উপকারে এসেছে। এটাও সহদেবের আবিষ্কার।

যেন সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দেওয়ার মত সূর্য ডুবল। বসন্ত জেনারেটার চালিয়েছে। শেরিঙ প্রথম দিকে কিন্তু কিন্তু করছিল। বরফের ওপর জেনারেটার চালানোয় সে অভ্যস্ত নয়। শব্দ বিপত্তি ঘটাতে পারে। ঠিক হয়েছে এর পরের ক্যাম্পে যখন চারপাশে বরফের পাহাড় খাড়া হয়ে থাকবে সেখানে জেনারেটার ব্যবহার করা হবে না।

আজ একটু মজা হল। দুটো তাঁবুর একটায় আজ দুজন লোক কম। বেশ বোঝা যাচ্ছিল বসন্ত চাইছে ছয়জন সমান সংখ্যায় দুটো তাঁবুতে থাকুক। শেষ সিকি মাইল হাঁটার পর কল্পনা হঠাৎই বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল। এখানে পেঁছে একদমই হাঁটাহাঁটি করেনি। সে এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমি বিক্রমবাবুদের ওখানে যাচ্ছি।'

বসন্ত চমকে উঠল, 'তুমি যাবে মানে?'

'কথাটায় তো একটুও রহস্য নেই। আছে বলে মনে হচ্ছে সহদেববাবু?' কল্পনার গলা শীতল। সহদেব ম্যাপ নিয়ে আলোর সামনে বসে কি সব আঁকিবুঁকি কাটছিল, অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখল। বসন্ত ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'তোমাকে যেতে হবে না।'

'কেন, গেলে কি ক্ষতি হবে?'

'আঃ। বড্ড জিদ করছ। আমি চাই না তুমি ঠক্করের সঙ্গে এক তাঁবুতে থাক। লোকটাকে তো তুমিও পছন্দ কর না। মিছিমিছি সমস্যা তৈরি করো না।'

'পরিস্থিতি কি সব সময় একরকম থাকে? আর কে কি চাইছে সেটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমি কি চাইছি সেটাই বড় কথা।'

অরিন্দম কাঠের বাক্সে বসে ওদের সংলাপ শুনছিল। সে ঠিক বুঝতে পারছিল না কল্পনা যা বলছে তার পেছনে অভিমান কাজ করছে কিনা। সে উঠে দাঁড়াল, 'কল্পনা, ওই তাঁবুতে আমিই যাব ঠিক করেছিলাম। তুমি বরং এখানেই থাক, বসন্তও যখন চাইছে—।'

'আমি চাইছি মানে?' বসন্ত প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল, 'ঠক্করের সঙ্গে ওর থাকাটা উচিত হবে, আপনি বলুন?'

এই সময় শীতে কাঁপতে কাঁপতে বিক্রম তাঁবুতে ঢুকল, 'ইম্পসিবল্। আমি

ওই তাঁবুতে থাকতে পারব না।'

বসন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ? আবার কি হল ?'

'তাঁবুতে ঢোকার পর থেকে দেখছি কনস্ট্যান্ট আমার দিকে তাকিয়ে আছে। একদম খুনীর চোখ। এক মুহূর্তের জন্যেও নজর সরাল না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি দেখছে। ও শুধু একটু হাসল। কথা বলল না।'

বসন্ত বলল, 'রাবিশ। ঠিক আছে। আমিই থাকব ওখানে। আমি থাকলে তো তোমার কোন প্রব্লেম হবে না। চল, আমার সঙ্গে।' বসন্ত প্রায় জোর করেই বিক্রমকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে ভেঙে পড়ল কল্পনা। শব্দটা যেন ফোয়ারার মত ছিটকে উঠল। সহদেব জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল ? হাসছেন কেন ?'

হাসি থামাল কল্পনা, 'হাসি পেল। জানেন, রাগ সব সময় অপকার করে না। অরিন্দমদা, আজ আপনার সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করব। আপত্তি আছে ?'

মাথা নাড়ল অরিন্দম, 'আছে। আমি খুব টায়ার্ড। একটু মদ্যপান করে চটপট ঘুমিয়ে পড়তে হবে।'

'ধ্যুৎ। আপনি একদম বেরসিক।' কল্পনা তার ট্র্যাঞ্জিস্টার বের করল ব্যাগ থেকে। খুব মনোযোগ দিয়ে স্টেশন ধরার চেষ্টা করছে সে। অরিন্দম মেয়েটির দিকে তাকাল। হঠাৎ বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করল সে। নিজেকে বড় করে তোলার মধ্যেও এক ধরনের চোরা সুখ আছে।

মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল অরিন্দমের। সে চোখের সামনে হাতের কব্জি নিয়ে আসতেই সময়টা দেখতে পেল। এগারটা কুড়ি। অথচ মনে হচ্ছে মধ্যরাত। স্লিপিং ব্যাগের মধ্যেও একটা কনকনে ভাব যেন ঢুকে পড়েছে। তাঁবুর ভেতর এখন শুধু নিঃশ্বাসের শব্দ। বাইরে বাতাস বইছে। মাঝে মাঝে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। অনেক ভেবে মনে হল ওটা বরফ পড়ার হলেও হতে পারে। এবং এই রকম রাত্রে কেউ যদি হাঁটতে চায় তবে তার মৃত্যু অনিবার্য। মিস্টার সেনের জন্যে কষ্ট হল অরিন্দমের। শুধু হীরে না, সেই সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ভালবাসার পেছনেও ছুটেছিলেন ভদ্রলোক।

আজ লাচেন থেকে নিয়ে আসা দিশি মদ খুব কাজ দিয়েছে। কিন্তু এই যে ঘুম ভাঙল তার জোড়া লাগার তো আশু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। স্যাটিং-এর সময় তাদের পাহাড়ে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু এভাবে বরফের মধ্যে বাস করতে হয়নি। বরফে তারা যেত স্যাটিং-এর প্রয়োজনে। অরিন্দম একটু ঘুমের জন্যে

কাতর হল। তার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে। কলকাতায় তাকে প্রায়ই খেতে হয়। কিন্তু সেটাকে পেতে হলে শ্লিপিং ব্যাগ এবং হ্যামক থেকে নামতে হবে। যেটা এই মুহূর্তে ভাবা যাচ্ছে না। অন্তত মাইনাস চারে নেমে গেছে তাপমাত্রা। সে নিঃশ্বাসের শব্দগুলো আলাদা করার চেষ্টা করল। তারপরেই আবিষ্কার করল নিঃশ্বাস পড়ছে একজনেরই। হাসি পেল অরিন্দমের। জেনারেটার বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণ। তাঁবুর ভেতরে ঘন অন্ধকার। কিন্তু পৃথিবীর রহস্যময়ী নারীরা যে ঘুমের মধ্যেও শব্দহীন থাকেন এটাই তার অজানা ছিল।

শেষ পর্যন্ত ট্যাবলেট নিতে শ্লিপিং ব্যাগ থেকে শরীরটাকে বের করল সে। ঠান্ডা যেন আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরছে। যদিও এখন তার শরীরে দার্জিলিং-এর শীতের মোকাবিলা করার পোশাক, তবু মনে হচ্ছে এগুলো কিছুই নয়। যতটা সম্ভব ধড়াচুড়া পরে নিল অরিন্দম। ছোট্ট টর্চ জেবলে স্যুটকেসটাকে খুঁজল সহদেব সেনের ঘুম বেশ গভীর। কিছু কিছু মানুষ এরকম সুখী হয়। ট্যাবলেট বের করেই খেয়াল হল জল দরকার। এখন জল খাওয়ার চেষ্টা মানে আত্মহত্যার সামিল। খাবার দেওয়ার সময় শেরিঙ-এর লোক দু' বোতল গরম জল দিয়ে গিয়েছিল। তার অবশিষ্ট এখন বরফ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। সে বাতাসের শব্দ শুনতে শুনতে টর্চ জেবলে এগোতে গিয়ে নিজেই বরফ হয়ে গেল যেন। কল্পনা নেই। ওর হ্যামকটা খালি, শ্লিপিং ব্যাগ নিরীহের মত পড়ে রয়েছে। সে তাঁবুর ভেতরটা টর্চ ঘুরিয়ে দেখল। এত রাত্রে কোথায় গেল মেয়েটা? কি করবে প্রথমে ভাবতে পারছিল না অরিন্দম। প্রয়োজনে এই ঠান্ডায় বাইরে গেলে কেউ এতক্ষণ না ফিরে আসবে না। অনেকক্ষণ সে জেগে আছে কিন্তু কোন পায়ের আওয়াজ কানে আসেনি। সহদেবকে ডাকতে গিয়েও মত পাল্টালো সে। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় বসন্তর সঙ্গে যে গলায় কথা বলেছে, ঠক্করের সঙ্গে থাকবে বলে যেভাবে জেদ ধরেছিল তাতে বোঝা গেছে ওদের মধ্যে কোন ব্যাপারে চরম অশান্তি হয়ে গেছে। ট্র্যাঞ্জিস্টার খুলতে চেষ্টা করার পর মেয়েটা আর কারো সঙ্গে কথা বলেনি। অভিমানের সঙ্গে ক্রোধ মিশলে মেয়েদের বোধশক্তি সচরাচর অকেজো হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কল্পনা যদি আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করে তাহলে আধঘণ্টার জন্যে বাইরে হেঁটে বেড়ানোই যথেষ্ট।

দ্রুত বরফের জুতো এবং বাকি পোশাকগুলো গলিয়ে নিয়ে এক হাতে লাঠি অন্যহাতে টর্চ নিয়ে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল সে। হাওয়ার ধার এখন যে-কোন ব্লেডকেও হার মানাবে। নতুন বরফ পড়ছে চারধারে। তাঁবুটার শরীরে পুরু হয়ে

লেপ্টে আছে। অন্ধকার এখন অনেক ফিকে কিন্তু ঘন কুয়াশার মত ধোঁয়াটে। এমন কি আশেপাশের তাঁবুগুলোকেও ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় সে কোথায় খুঁজতে যাবে মেয়েটাকে। একমাত্র শেরিঙ্ তার লোকজন নিয়ে সাহায্য করতে পারে এসময়। বসন্তকে ডেকে তোলা উচিত। অরিন্দম টর্চ জ্বালিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই শরীরে তুষারের ছোঁয়া পেল। বাতাসে কি মিশে আছে ওগুলো! মাথা নিচু করে সে হাঁটছিল। ঠক্করদের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারল এখান থেকে চেঁচিয়ে ডাকলেও কারও ঘুম ভাঙবে না। সে তাঁবুর দরজাটা খোলার জন্যে হাতড়াতে লাগল। শোওয়ার সময় সন্ধ্যেবেলায় হাতে উলের গ্লাভস ছিল, এখন তার আঙুলের ডগা ভিজে উঠতেই বিদ্যুতের মত কনকনানিটা শরীরে ছড়াল। ভেতরে কি পায়ের আওয়াজ হল? কেন জানে না অরিন্দম চকিতেই নিজেকে সরিয়ে নিল অনেকটা। হয়তো লাচেনের রাতের স্মৃতি তাকে সক্রিয় হতে সাহায্য করল। দরজাটা খুলে গেল কিন্তু কোন মানুষের মুখ দেখা যাচ্ছে না। চাপা গলায় অরিন্দম ডাকল, 'বসন্ত!' সে নিজের গলার স্বর চিনতে পারছিল না।

'আরে ব্বাস! হিরো সাহাব! আপ?' ঠক্করকে দেখা গেল দরজায়। ছুরি হাতে এগিয়ে এসেছে, 'আমি ভাবলাম কোন নয়া দুশমন! খুব ঠাণ্ডা, কি বলেন!'

'বসন্তকে ডেকে দাও।' অরিন্দম আদেশের ভঙ্গিতে বলল।

'ঈশ্বর আর প্রেম যখন কোন মানুষকে ডাকে তখন সে আমাদের ডাক শুনবে কি করে!' ঠক্কর চাপা গলায় হাসল, 'আসুন হিরো সাহাব, ভেতরে আসুন নইলে আপনাকেও ডাক শুনতে হবে!'

তাঁবুর ভেতরে ঢুকে টর্চের আলো ঘুরিয়ে অরিন্দম বুঝতে পারল বসন্ত নেই। বিক্রম নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে মাথা মুড়ি দিয়ে। ঠক্কর আবার হাসল, 'ডাইরেক্টার সাহাব এখন হিরো হয়ে গিয়েছেন।'

'কখন বেরিয়েছে ও?' অরিন্দম টের পাচ্ছিল কল্পনার জন্যে তার উদ্বেগ এখন আগের মত নেই।

'কমসে কম আধঘণ্টা। আমি তো একটু আগে ড্রামা শুনে এলাম কিচেনের তাঁবুতে। ওটা তো খালি ছিল।'

'ড্রামা? কি যা তা বলছ? কিচেনের তাঁবুতে ওরা গিয়েছে?'

'ছেড়ে দিন ওসব কথা। হিরো সাহাব! আপনার সঙ্গে আমার একটা হিসাব আছে?'

'কি ব্যাপার!'

'আমি আমার কাজের কোন সাক্ষী রাখি না। সেটা একটা ব্যাপার। আর দু নম্বরটাই এখন সবচেয়ে জরুরী। এ শালা ফিলিমের বাক্স যে পাওয়া যাবে না তা সবাই জানে। আমাকে ভাল টাকা দেওয়া হয়েছে তাই যাচ্ছি। কিন্তু কেন যাচ্ছি তা আপনি জানেন। ফটো খি'চতে হবে। এ শালা ক্যামেরাম্যানকে তাই সঙ্গে রাখতে হবে। বাকি সব বিলকুল বাদ। হিসাবটা আমার ঠিক হবে সেইভাবে যা আপনি চান।'

'আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। ওরা কোথায়।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান। এর মধ্যে না বোঝার কি আছে। হীরের বাক্সটা যদি পাওয়া যায় তাহলে আপনি আমার সংগে আধাআধিতে আছেন ?' টর্চ জ্বালা ছিল। তার আলো সরাসরি ঠক্করের মুখে নয় তবু তার আদল দেখতে পাচ্ছিল অরিন্দম। সে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'হীরের খবর পেলে কোথায় ?'

'আপনি একা নিজেকে কেন শের ভাবছেন। মেয়েছেলেটা একটা কুত্তাকে নিয়ে এসেছিল, এখন সেই কুত্তা বাঘ হয়ে গেছে। লাচেনে আপনি বাঘের মুখে পড়তে গিয়েও বে'চে গেছেন।'

'তুমি আমাকে ফলো করেছিলে সে-রাতে।'

'এই টিমে আমি একমাত্র আপনাকেই—। ছোড় দিন। হিসাবটা ওইভাবে হবে ?'

'তোমার মাথা খারাপ। যাদের হীবে তারা চলে গেছে আমাদের আগে।'

ঠক্কর হাসল, 'যাক না। খু'জে যদি পায় তো বহুৎ আচ্ছা। আমাদের আর কষ্ট করে খু'জতে হবে না।'

এবার অরিন্দমের মেরুদণ্ডে যেন বরফের ছোঁয়া লাগল। স্পনসর কোম্পানি একজন খুনীকে পাঠিয়েছে দায়িত্ব দিয়ে ? এবং তখনই তার মনে পড়ল রিভলভারটা তাড়াহুড়োয় নিয়ে আসা হয়নি। ওটা রয়ে গেছে স্লিপিং ব্যাগের ভেতরেই। ছুরি হাতে লোকটার মোকাবিলা করার কোন ক্ষমতা তার নেই। এই সময় ঠক্কর প্রশ্ন করল, 'ফিন এক বাত হিরো সাহাব, লাচেনে সমস্ত ঘটনাটা দেখার পর আপনি কাউকে বলেন নি। কেন ?'

'তুমি সেদিন কাজটা না করলে মিস্টার সেনকে বাঁচানো যেত না।'

'এটা জবাব হল না। যাক। আপনি কি হিসাব করলেন, বলুন।'

'ভেবে দেখি ঠক্কর। এত জলদি কোন উত্তর হয় না।'

'বেশ। ভাবুন। আপনার সংগে রিভলভার আছে। কিন্তু আমার ছুরি রিভল-

ভারের চেয়ে কম জলদি কাজ করে না। হিসাবটা তাহলে কালকের রাত পর্যন্ত তোলা থাক।'

বাইরে বেরিয়ে এল অরিন্দম। কিন্তু সে প্রতি মুহূর্তে একটা দুর্ঘটনা আশঙ্কা করছিল। তাঁবু থেকে উড়ে আসতে পারে যে ছুরিটা তার কর্মক্ষমতা সে লাচেনে দেখেছে। সাক্ষীকে কোন খুনী বাঁচিয়ে রাখে না। কিন্তু যেহেতু তার কাছে রিভলভার আছে বলে লোকটার ধারণা তাই। অরিন্দম জোরে হাঁটতে লাগল।

তাঁবুর ভেতর ফিরে এসে অরিন্দম দেখল সহদেব তেমনি ঘুমাচ্ছে। কল্পনার হ্যামক এখনও শূন্য। হালকা হয়ে স্লিপিং ব্যাগের ভিতর ঢুকে যাওয়ার পরও কাঁপুনি যাচ্ছিল না। রিভলভারের শরীর ছুঁতেই মনে হল ওটা বরফ হয়ে রয়েছে। হাতের ঘষায় সেটাকে উত্তপ্ত করতে করতে ঠক্কর সম্পর্কে অস্বস্তিটা কেটে গেল। আজ হোক বা কাল, একটা ফয়সালা করতেই হবে। কিন্তু কোন কারণে কল্পনা এই মারাত্মক ঠাণ্ডাতেও কিচেনের তাবুতে বসন্তর সঙ্গে কথা বলতে গেল? যেরকম মনোমালিন্য চলছিল, বিকেলে যেভাবে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল তাতে এই রকম ঘটনা আশা করাই যায় না। কিন্তু কি কথা বলছে ওরা? বসন্ত কি ওকে ডাকতে এখানে এসেছিল? নাকি আগে থেকেই এরকম পরিকল্পনা করা ছিল?

ঘুম আসছিল না। এবং সেই সময় তাঁবুর গায়ে মানুষের ছোঁয়া লাগতে সে নিশ্চল হল। অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছে ভেতরে ঢুকেছে কেউ। তারপরেই চাপা গলায় কেউ বলল, 'ঠিক আছে?'

'হুঁ।' কল্পনার গলা, 'গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

আরও কয়েক মুহূর্ত। কল্পনা হ্যামকে উঠল। খুব চাপা গলায় একটা গুন-গুনানি বাজল। এটা কোন রবীন্দ্রসংগীতের সুর? পূজা আর প্রেম, দুঃখ আর সুখ যাঁর গানে একাকার হয়ে যায় তাঁর সুরের সূত্র খুঁজতে যাওয়াটাই বোকামি।

সকাল আটটায় রওনা হয়েছিল সবাই। আজও প্রত্যেকের শরীর আর একজনের সঙ্গে দড়িতে সংযুক্ত হয়নি। ফাঁপা তুষার বা আচমকা পা পিছলে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বন্ধ করতেই এই ব্যবস্থা নিতে চেয়েছিল সহদেব। কিন্তু শেরিঙ্ বলেছে সেরকম সম্ভাবনা এখনই নেই। এদিকের বরফ বেশ শক্ত এবং ওতে চলার গতি আরও শ্লথ হয়ে যাবে। প্রতি পদক্ষেপের আগে সামনের বরফ লাঠি দিয়ে পরীক্ষা করে নিলেই আপাতত চলবে।

রোদ উঠলে ঠাণ্ডা কমল। কিন্তু রঙিন চশমা ব্যবহার করতে হল প্রত্যেককে। আশেপাশে কোথাও কোন গাছপালা নেই। যেন সাদা পৃথিবীটা সটান উঠে গেছে আকাশে। অবশ্য সবটাই যে সাদা তা নয়। উঁচু উঁচু পাহাড়ের শরীরের অনেকটাই তুষারমুক্ত। জায়গাগুলোকে মোটেই সুশ্রী দেখাচ্ছে না। সুশ্রী নয় তবু ওইটুকুই পরিচিত বলে মনে হচ্ছিল। বরফ জমেছে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে এবং এই উপত্যকায়।

কিন্তু আরামের পথ ফুরোতে দেরি হল না। দশটা নাগাদ ওরা খাড়া পাহাড়ের গায়ে এসে পেঁছাল। শেরিঙের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল আগের বার সে যখন এই পথে এসেছিল তখন এত বরফ পড়েনি। ফলে পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়ার যে রাস্তাটা তার চেনা তা এখন পরিষ্কার নয়। এবং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এই পথে আগের দলটি যায়নি। শেরিঙ জানাল ওরা নিশ্চয়ই ঘুর পথে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে স্পটে পেঁছাতে ওদের বেশি সময় লাগবেই। খবরটা শোনার পর সবচেয়ে উৎসাহিত হল ঠক্কর। শেরিঙের সঙ্গে রাস্তা খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বরফের ওপর ওর হাঁটার ধরন এবং শারীরিক ক্ষমতা দেখে অরিন্দমের কেবলই মনে হচ্ছিল লোকটার পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা আছে। একজন সাধারণ খুনী এই কাজে দক্ষ হতে পারে না। স্পনসর খুঁজে খুঁজে ঠিক লোককেই বাছাই করেছে। আবার সাধারণ পর্বতারোহী এইভাবে ঠান্ডা মাথায় খুন করতে পারে না। কিন্তু ঠক্করের ইতিহাস এই মুহূর্তে জানার কোন উপায় নেই। এদিকে বসন্তর ব্যবহার আবার আজ সকাল থেকে আগের মত হয়ে গেছে। সেই সন্দিগ্ধ ভঙ্গি, একটু অমান্য করার চেষ্টা, নিজেকে নেতা হিসেবে দেখানোর প্রবণতা আর নেই। কথায় কথায় সে আসছে অরিন্দমের কাছে পরামর্শের জন্যে। কিন্তু কল্পনার মধ্যে সেরকম পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না।

বসন্ত কাছে এল, 'দাদা, কি করা যায়। এ পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা বোকামি।'

'কিন্তু এরকম পাহাড় যে সামনে পড়বে সেটা আমাদের জানা ছিল বসন্ত।'

'ছিল। কিন্তু ইটস টু মাচ। হিমালয়ান ইনস্টিটিউটের ট্রেনিং ছাড়া ইম্পসিবল।'

অরিন্দম জবাব দিল না। কথাটা তারও মনে হয়েছে। এত খাড়াই পাহাড়, যদিও এদিকটায় বরফ না জমায় পাথর বেরিয়ে, কিন্তু উঠতে গেলে রীতিমত অনু-শীলন থাকা দরকার। ঝুঁকি নিতে গেলে হাত পা তো ভাঙবেই, মৃত্যুও অস্বাভা-

বিক নয়। কিন্তু তার চেয়ে এখান থেকে শূন্য হাতে ফিরে যাওয়া আরও বোকামি হবে। ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এল শেরিঙ আর ঠক্কর। নিজের চেনা পথটা খুঁজে পেয়েছে শেরিঙ। পাহাড়ে উঠতেই হবে, কিন্তু এতটা নয়। এবং সবচেয়ে সুবিধে হল ওখানকার পাথরগুলো খুব খাড়াই নয়।

পুরো দলটা ওখানে পেঁছানোর পর মালবাহকরা খুশি হল। এখন ওদের মাত্র হাজার খানেক ফুট ডিঙোতে হবে। দড়িতে নিজেদের যুক্ত করে ওরা একে একে উঠে যেতে লাগল শেরিঙকে অনুসরণ করে। এরা পাঁচজন দৃশ্যটা দেখছিল বুকে কাঁপুনি নিয়ে। মালবাহকদের সঙ্গে ঠক্কর উঠছে। চকিতে ওর স্যুটকেসটার কথা খেয়াল হল বসন্তর। সেটা রয়েছে নিচে। মালবাহকরা সমস্ত মাল বেঁধে রেখে গেছে। খানিকটা ওপরে উঠে টেনে টেনে তুলছে দড়ির সাহায্যে সবাই মিলে। নিজের প্রয়োজনেই ঠক্করকে হাতছাড়া করতে হয়েছে স্যুটকেসটা। শেষ পর্যন্ত দলটা যখন চোখের আড়ালে চলে গেল তখন সহদেব বলল, 'দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। আপনারা আমাকে অনুসরণ করুন। কোনরকম ঝুঁকি নেবেন না। তাড়াহুড়ো করাব দরকার নেই। শরীরটাকে হালকা রাখার চেষ্টা করবেন। একটা দড়িতে সহদেব, বসন্ত এবং কল্পনা যুক্ত হল। দ্বিতীয়টায় অরিন্দম এবং বিক্রম। বুদ্ধি করে বিক্রম মালবাহকদের সঙ্গে তার ক্যামেরা পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রায় হামাগুড়ি দিয়েই অনেকটা উঠে আসার পর ওরা হাঁপাতে লাগল। সহদেব বলল, 'খবরদার, কেউ ভুল করেও নিচের দিকে তাকাবেন না।' যেখানে ওরা দাঁড়িয়েছিল সেখানে পাথরটা চওড়া। ওপর থেকে শেরিঙের গলার স্বর ভেসে এল। চিৎকার করে সে এদের অবস্থান জানতে চাইছে। সহদেব প্রতিধ্বনি বাঁচিয়ে তার জবাব দিল। কল্পনা বলল, 'কেউ বিশ্বাস করবে না আমি এভাবে উঠতে পারছি।'

কথাটা যেন সবাই মেনে নিল। কারণ সহদেব ছাড়া এটা সবারই মনের কথা। হঠাৎ বসন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু সহদেব, ওপরে পেঁছে যদি দেখি আমরা ভুল পথে এসেছি। যদি জায়গাটাকে খুঁজেই না পাই। আমাদের আগের দল তো এই পথে যায়নি।'

'হতে পারে। পাহাড়ে, বিশেষ করে বরফের পর ডেফিনিট না হলে স্পট খুঁজে পাওয়া মুস্কিল।'

'বাঃ। তুমি এখন একথা বলছ। কলকাতায় তুমি আমাকে বলেছিলে খুঁজে বের করতে অসুবিধে হবে না।'

'বলেছিলাম। কিন্তু পাবই এমন কথা বলিনি।'

'আই উইল কিল ইউ যদি স্পট না পাওয়া যায়।' চাপা গলায় বলে উঠল বসন্ত।

'পারো কিন্তু তাতে কি স্পট পাবে।'

কল্পনা বসন্তর হাত ধরল, 'এভাবে বলছ কেন? উনি তো চেষ্টা করছেন।'

হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে নিল বসন্ত, 'তুমি চুপ করো।'

'তুমি আবার ওভাবে কথা বলছ?' কল্পনা ফুঁসে উঠল।

বসন্ত থমকে গেল, 'আই অ্যাম সরি।' তারপরে সহদেবের দিকে ফিরে বলল, 'কিছু মনে করো না। আমার মাথা ঠিক নেই। কোথায় যাচ্ছি, ঠিক যাচ্ছি কিনা তাও জানি না—।'

সহদেব মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে। পাহাড়ে কখনও ইমোশনের শিকার হয়ো না।'

এবার আরও কষ্টকর হচ্ছিল ওঠা। সহদেব যতটা স্বচ্ছন্দ কল্পনা বা বসন্ত তার ধারে-কাছে নয়। অরিন্দম হাঁপিয়ে পড়ছিল। প্রতিটি মুভমেণ্টেই সারা শরীরে আতঙ্ক ছড়াচ্ছিল। বিক্রম কথা বলছে না অনেকক্ষণ থেকেই। কিন্তু ওর মুখ এখন সাদা। হঠাৎ ওপরে চিৎকার উঠল। কল্পনার পা পিছলে যাচ্ছে। প্রাণপণে দড়িটাকে টেনে ধরেছে সহদেব। এক মুহূর্ত। অন্ধের মত একটা খাঁজ আঁকড়ে ধরল কল্পনা। সহদেবের গলা শোনা গেল, 'ঠিক আছে। নার্ভাস হয়ো না। উঠতে পারবে?'

কল্পনার গলা শুনতে পেল না অরিন্দম। সে একটা পাথরের ওপর দুটো পায়ে শরীরের ভর রেখে দাঁড়িয়েছিল। অন্তত চারফুট নিচে বিক্রম পিঁপড়ের মত পাহাড় আঁকড়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ বিক্রমের গলা পাওয়া গেল, 'দাদা, আমাকে ছেড়ে দিন।'

মুখ নিচু করতে সাহস পেল না অরিন্দম, 'কি বলছ?'

'আমি পারব না। আমি নেমে যাচ্ছি।'

'নেমে কোথায় যাবে?' অরিন্দমের শরীরে কাঁপুনি এল।

'পাহাড়ের নিচে বসে থাকব।'

'মরে যাবে। কেউ নেই ওখানে।'

'কিন্তু উঠতে গেলে এখনই মরব। আমাকে একটা তাঁবু আর খাবার পাঠিয়ে দিন, ফেলে দিন ওপর থেকে। আমি একাই অপেক্ষা করব।' দড়িতে টান লাগল। অরিন্দম মুখ না নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি করছ? দড়ি ধরে টানছে কেন?'

'খুলে দিচ্ছি। উইশ ইউ গুড লাক দাদা।' বিক্রমের গলা কাঁপছে।

দড়িটা টেনে তুলতেই সেটা ওপরে উঠে গেল। ছোকরার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! কিন্তু এখন কিছু করা অসম্ভব। মনের জোর যার নষ্ট হয়ে যায় তাকে ঘাঁটানো কখনই উচিত নয়। শেরিঙই পারে বিক্রমকে ওপরে নিয়ে যেতে। অরিন্দম ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল ওরা অনেক এগিয়ে গেছে।

চল্লিশ মিনিট পরে সে যখন ওপরে পেঁছাল তখন শেরিঙ তার হাতে চায়ের গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছে। এই বয়সে ফিল্মের হিরো হওয়া যায়, প্রেম করা যায় কিন্তু অরিন্দমের মনে হল তার এক বিন্দু শক্তিও অবশিষ্ট নেই। নিজেকে ছিবড়ে বলে মনে হচ্ছে। পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে সে প্রায় ঝিমোতে লাগল। এত ঠাণ্ডাতেও গায়ে ঘাম জমেছে। মনে হচ্ছে প্রেসার কমে গেছে অনেকটা। সে দেখল না বসন্ত এবং কল্পনারও একই দশা। এই সময় সহদেবের গলা শুনতে পেল, 'চা খেয়ে নিন। ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু বিক্রমবাবু কোথায়?'

নিঃশব্দে নিচের দিকে হাতের ইশারা করল অরিন্দম। সহদেব জিজ্ঞাসা করল, 'তার মানে?'

নিঃশ্বাস এখনও স্বাভাবিক নয়, অরিন্দম বলতে পারল, 'ও ওপরে উঠতে চাইছে না।'

'সেকি! ওখানে উনি একা কি করবেন। আপনার পেছনেই ছিলেন তো।'

'হ্যাঁ। ও পারল না। দড়ি খুলে এগিয়ে যেতে বলল।'

সহদেব চিৎকার করল, 'বিক্রমবাবু!' প্রতিধ্বনি কমে গেলে চিনচিনে উত্তর এল, কিন্তু সেটা বোধগম্য হল না। শেরিঙ আর সহদেব আলোচনা করতে লাগল কি করা যায়। চা পেটে পড়ায় একটু ভাল লাগছে এখন। অরিন্দম দেখল শেরিঙের লোকজন এর মধ্যেই স্টোভ জ্বালিয়েছে। ঠক্কর ঝুঁকে নিচের দিকে দেখছে। তার পরেই সে চিৎকার করে উঠল, 'আরে মৎ উৎরাইয়ে।'

সহদেব আর শেরিঙ ছুটে গেল পাথরের কিনারে। উঠে দাঁড়িয়েও শরীরটাকে ধাতস্থ করতে দেরি হল অরিন্দমের। আর তখনই নিচ থেকে চিৎকারটা ভেসে এল। ওপরের মানুষগুলো যেন বোবা হয়ে গেল। ঠক্কর ধীরে ধীরে মুখ সরিয়ে নিল। অরিন্দম এগিয়ে গেল পাথরের কিনারায়। হাজার ফুট নিচে দুহাত ছড়িয়ে শুয়ে আছে বিক্রম। উপুড় হয়ে পড়ায় তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। এত ওপর থেকেও বোঝা যাচ্ছে কোন কাঁপুনি নেই। তর তর করে নামতে লাগল শেরিঙ। দুজন মালবাহক ওর কোমরের দড়ি ধরে সাহায্য করতে লাগল নামতে নামতে। একটু

একটু করে ছোট হয়ে গেল শেরিঙ। শেষ পর্যন্ত শরীরটার পাশে পেঁছে সযত্নে ওকে চিৎ করল। আর তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ভাষায় কিছু বলল। ওর দুজন সাহায্যকারী সেই কথা রিলে করে ওপরে পেঁছে দিতে একজন মালবাহক একটা কাপড় আর দড়ি বেঁধে নিচে ফেলে দিল। সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে শরীরটাকে ঢেকে ভাল করে বেঁধে রেখে আবার ওপরে উঠতে লাগল শেরিঙ।

মৃত্যুকে এত স্বাভাবিকভাবে জীবন ছিনিয়ে নিতে কখনও দ্যাখেনি ওরা। হয়তো পাহাড়ে মানুষের আচরণও পাল্টে যায়। কেউ চিৎকার করল না, কেউ কাঁদল না, কেউ জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করল না বিক্রম মরে গেছে কিনা। এমন কি ঠক্কর পর্যন্ত হাঁটু মুড়ে বসেছিল চুপচাপ।

পাহাড়ে কেউ কারো জন্যে অপেক্ষা করে না। স্মৃতি নিয়ে পিছিয়ে পড়ার অর্থ হল মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া। ওরা হাঁটছিল। এখন প্রতিটি শরীর পরস্পরের সঙ্গে দড়িতে বাঁধা। প্রতিটি পদক্ষেপ জরিপ করে ফেলা, মৃত্যুর ফাঁদ এড়িয়ে যাওয়া। আকাশে মেঘ জমছে। অথচ বিকেলের দেরি আছে অনেক। বড় দ্রুত ছায়া নেমে আসছে। অরিন্দমের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। এবং তখনই মনে হল তার সামনে যে যাচ্ছে সে যেন ককিয়ে উঠল। সামান্য ফোঁপানি। কল্পনা? অরিন্দম ঠোঁট কামড়াল, পেছন থেকে বিক্রম এখনও কি বলে যাচ্ছে, 'উইশ ইউ গুড লাক দাদা!'

সহদেব নিশ্চিত যে দুর্ঘটনাস্থলের দশ কিলোমিটারের মধ্যে ওরা এসে পড়েছে। যদিও খালি চোখে তার কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। বাংলা ছবির কোন ক্যামেরাম্যান এমন দৃশ্য তোলার সুযোগ পেয়েছে কিনা তা অরিন্দমের জানা নেই। যে পেতে যাচ্ছিল তার ক্যামেরাটা এখনও মালবাহকের দড়িতে বাঁধা রয়েছে। বরফের মধ্যে হাঁটা একটা কষ্টকর অভিজ্ঞতা। প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে পায়ের তলার তুষার দুলে উঠছে। প্রতি মুহূর্তেই শরীরটা ভুস করে তলিয়ে যেতে পারে। যদিও দড়ির বাঁধন পরস্পরকে সাহায্য করছে তবু আশংকা থেকেই যাচ্ছে। আজ বিক্রমের দুর্ঘটনার কারণেই হোক অথবা পরিশ্রমের জন্যেই হোক তাঁবু পড়েছিল দুপুর শেষ না হতেই। অবশ্য এখানে দুপুর সকাল বিকেলকে আলাদা করে চিনে নেওয়া বেশ কষ্টকর। আকাশের চেহারা এবং রোদের রঙ প্রায় দশ মিনিট অন্তর পাল্টে যাচ্ছে।

তাঁবুর ভেতরে কাগজপত্র নিয়ে হিসেব শেষ করে সহদেব জানাল, 'বড় জোর দশ কিলোমিটার। বুঝলে বসন্ত, এর মধ্যেই আমরা ধ্বংসস্তূপটাকে পেয়ে যাব

যদি বরফে চাপা না পড়ে গিয়ে থাকে।'

কল্পনা জিজ্ঞাসা করল, 'কত বরফ পড়লে একটা প্লেন ঢাকা পড়ে যাবে?'

সহদেব জিভে শব্দ করল, 'প্লেনটা তো আস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে গেছে হয়তো। কিন্তু আমি সিওর যে কাছাকাছি পেঁীছে গিয়েছি।'

এতক্ষণে অরিন্দম কথা বলল, 'তোমার কষা অঙ্ক বা কম্পাসের ওপর আমার কোন অনাস্থা নেই, কিন্তু কাছাকাছি এলে তো আমরা আগের দলটাকে দেখতে পেতাম। ওরা ও তো একই উদ্দেশ্যে যাচ্ছে।'

সহদেব কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে উত্তর দিল, 'হয় ওরা ভুল পথে চলে গেছে নয় ঘুর পথে আসছে।'

অরিন্দম তাঁবুর বাইরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল, 'শেরিঙ্ তো চারপাশ দেখে আসার জন্যে লোক পাঠিয়েছে। ওরা ফিরে এসে কি বলে শোন। আমার তো মনে হচ্ছে আমরা অনন্তকাল শুধু বরফের ওপর হেঁটে যাচ্ছি।'

সহদেব শব্দ করে হাসল, 'পারবেন না দাদা। হিমালয় আটকে দেবে। তাছাড়া পৃথিবীটা এত ছোট যে কেউ অনন্তকাল হাঁটতে পারে না। পারলেও বরফ পাবে না। এর পরেই তিব্বত।'

রসিকতাকে রসিকতা হিসেবেই নিল অরিন্দম। বাইরে বেরিয়ে সে ঠক্করকে দেখতে পেল। লোকটা একদৃষ্টিতে উত্তর দিকে তাকিয়ে আছে। ওপাশের দুটো তাঁবুতে মালবাহকদের মধ্যে যারা রয়ে গেছে তারা কাজ চুকিয়ে ফেলতে ব্যস্ত। রোদ আছে কিন্তু আকাশে মেঘ জমছে। খুবই সামান্য কিন্তু কালো। ঠক্কর মুখ ফেরাতেই তাকে দেখতে পেল। লোকটার মুখে মাঙ্কি ক্যাপ। চোখ এবং ঠোঁট দেখে দূর থেকে মানুষের মতলব বোঝা যায় না। অরিন্দম দেখল ঠক্কর এগিয়ে আসছে।

'বলিয়ে হিরো সাহাব। হাল ক্যায়সা হ্যায়।'

'মানে?' অরিন্দম সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। লোকটাকে তার কিছুতেই সহজ মনে হয় না।

'আপনার কি মনে হচ্ছে এ জায়গা ছেড়ে আমরা ফিরে যেতে পারব?' ঠক্কর হাসল।

'কেন পারব না। এসেছি যখন তখন যেতেও পারব।'

'কিন্তু মিস্টার সেন তো পারবেন না। আমি ওঁর কথাই ভাবছিলাম। এই বরফের কোথাও লোকটা মরে জমে আছে। মহব্বত বহুৎ বুড়া জিনিস হিরো

সাহাব। মানুষকে একদম পাগলা করে দেয়।'

'তোমাকে কে বলল উনি মহব্বতের জন্যে রাত্রে বেরিয়েছেন। কি জন্যে গেছেন তা এখন সবাই জানে।'

'ঝুট। হাঁ, হিরের ব্যাপারটা ছিলই, কিন্তু আউর ভি কুছ ছিল।' ঠক্কর প্রতিবাদ করল। তারপর হঠাৎ গলা পাল্টে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি কুলিদের মুখে ইনফরমেশন পাওয়ার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন?'

'কিসের ইনফরমেশন?' অরিন্দম না বোঝার ভান করল।

'হিরো সাহাব অ্যাকটিংটা আপনি আচ্ছা করলেন না।'

আর তখনই লোকগুলোকে দেখতে পাওয়া গেল। তিনটে লোক বরফের ওপর দিয়ে প্রায় টলতে টলতে এগিয়ে আসছে। পৃথিবীর ও-প্রান্ত থেকে যেন আচমকা উঠে এল ওরা। ভঙ্গীতেই বোঝা যাচ্ছিল অত্যন্ত ক্লান্ত।

লোক তিনটি যখন তাঁবুর সামনে পেঁছাল, তখন সবাই বেরিয়ে এসেছে। শেরিঙ প্রথমে ওদের দিশি মদ দিল। একদম সাদা হয়ে গেছে মুখগুলো। একটু সামলে ওঠার সময় দিয়ে শেরিঙ প্রশ্ন করতে লাগল আর বারংবার উত্তরের দিকে তাকাতে লাগল। ওদের কথাবার্তা চলছিল সম্ভবত সিকিমিজে। বিন্দু বিসর্গ বুঝতে পারছিল না এরা। শেষ পর্যন্ত লোক তিনটেকে তাঁবুতে পাঠিয়ে দিয়ে শেরিঙ বসন্তকে বলল, 'আমাদের আগের দলটা এখান থেকে আধঘন্টা দূরে তাঁবু ফেলেছে। এরা দূর থেকে দেখেছে কিন্তু কাছে যায়নি।'

বসন্ত উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'প্লেনটা কোথায় পড়েছে তা ওরা দেখতে পায়নি?'

'না। তবে ওই উত্তরের সাদা পাহাড়টার নিচে একটা অ্যালুমিনিয়ামের পাত পড়ে থাকতে দেখেছে। পাতটার ওপরে রোদ পড়ায় চকচক করছিল। যদি সেটা প্লেনের কিছু হয় তাহলে ধরে নেওয়া যায় আমরা কাছাকাছি এসে গেছি।'

কথাটা শোনামাত্র সহদেব চিৎকার করে উঠল, 'ওঃ গড। আমি যখন বলছিলাম তখন তোমরা বিশ্বাস করছিলেন। আমরা পেঁছে গিয়েছি। এখান থেকে জায়গাটা ঠিক কত দূরে বলল ওরা?'

'সময়টা বেচারারা গুলিয়ে ফেলেছে। তবে একঘণ্টার রাস্তা তো বটেই। আপনাদের দুঘন্টা লাগবে।' শেরিঙ চিন্তিত মুখে বলল, 'কিন্তু ওরা চকচকে জিনিসটার কাছে পেঁছাতে পারেনি।'

'কেন?' প্রশ্নটা তখন আর বসন্তর একার নয়।

'অনেকটা নিচে নামতে হবে খাদ বেয়ে। ওখানে চোরা গর্ত সব জায়গায় ছড়িয়ে। সেই খাদের বরফ ডিঙিয়ে আবার ওপরে উঠতে হবে। ওদের এসব করার শক্তিও ছিল না আজ।' শেরিঙ আকাশের দিকে তাকাল, 'তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। এখানে কোন আড়াল নেই। ঝড় উঠলে সামলানো অসম্ভব হয়ে যাবে।' লোকটাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। অরিন্দম দেখল মেঘটা বড় হচ্ছে। তবে এখনও ভীতিকর কিছু নয়। সে অনুযোগের গলায় বলল, 'এখানে তাঁবু ফেলাই ভুল হয়েছে।'

শেরিঙ মাথা নাড়ল, 'কদিন তো ঝড় ওঠেনি। এমন মেঘও দেখিনি।'

সহদেব জিজ্ঞাসা করল, 'আর কতক্ষণ আলো থাকবে বলে মনে হয়?'

শেরিঙ সূর্যের দিকে, দিগন্তের দিকে তাকাল। তারপর মেঘটাকে দেখল। দেখে বলল, 'বড় জোর দেড়ঘণ্টা।'

সহদেব ব্যস্ত হল, 'তাহ'লে আমরা যদি আর একটু এগিয়ে গিয়ে কোন আড়াল খুঁজে পাই—।'

বসন্ত প্রস্তাবটাকে বাতিল করল, 'এসব খুলে প্যাক করতেই তো আধ ঘণ্টা লাগবে।'

কয়েকবার মেঘটার দিকে তাকিয়ে শেরিঙ তার দলবলের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত স্থির হল এগিয়েই যাওয়া হবে। মালপত্র এখানেই একটা তাঁবুতে ভাল করে চাপা দিয়ে দুটো তাঁবু সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে। ওই খাদটার কাছে যদি পেঁছে যাওয়া যায় তাহলে ঝড়ের মুখে পড়তে হবে না। অথচ চকচকে জিনিসটার কাছাকাছি থাকা যাবে, যাতে কাল সকালেই রওনা হওয়া যায়।

পাহাড়টা যখন স্পষ্ট, তখনই রোদ 'চলে গেল। পাহাড়ে বরফের বুকে সূর্য যখন লুকিয়ে পড়ে তখন ভাল লাগার বদলে একটা অসহায়তাবোধ আক্রমণ করে বসে। সূর্য ডুবেছে কিন্তু আলো নেভেনি। এটাকেই কি রিফ্লেক্টেড গ্লোরি বলে? উত্তমবাবুর আলোয় যেমন অনেক পরিচালক আলোকিত হয়েছিলেন। কিংবা মৃত্যুর ছয় বছর পরেও তাঁর যে কোন ছবি রিলিজ হলেই হাউসফুল হয়। যতই মুখে রঙ মাখো আর চুল ফাঁপাও তোমার একার নামে যদি প্রথম সাতটা দিন হাউসফুল না হয় তাহলে বুঝবে ফিল্মস্টার হিসেবে তুমি একজন হরিদাস পাল। হঠাৎ হাঁটু পর্যন্ত তুষারে নেমে যাওয়ায় অরিন্দম প্রাণপণে লাঠিতে ভর দিয়ে নিজেকে সামলাতে চাইল। তার দড়ির অন্য প্রান্ত সহদেবের কোমরে বাঁধা। সেখানে টান পড়তেই সে চিৎকার করে উঠল, 'কি হল?'

হাত নেড়ে কিছু হয়নি বুঝিয়ে অরিন্দম ধীরে ধীরে এবং অনেক চেষ্টায় নিজেকে তুষারমুক্ত করে উঠে দাঁড়াল।

সহদেব বলল, 'নিশ্চয়ই অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিলেন। বি এ্যালার্ট দাদা।'

অরিন্দম কোন কথা বলল না। সূর্যটাকে দেখে এই সময় ও পরিবেশেও তার যে কেন টালিগঞ্জের কথা মনে পড়ল। ঢেঁকি কি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে। ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ি সান্যাল কি উত্তমবাবুকে পেয়ে সেখানেও নাটক ফিল্ম করছেন? না গেলে তো জানার উপায় নেই।

তাঁবু খুলে জিনিসপত্র প্যাক করতে আধঘণ্টা লেগে গিয়েছিল। যার ফলে মেঘটা এখন প্রায় অর্ধেক আকাশ ঢেকে ফেলছে। পেছনের দিকে তাকালে মনে হচ্ছে অন্ধকার যেন তাড়া করে আসছে ওদের।

ঠিক কোথায় যাওয়া হচ্ছে জানা নেই শুধু পেছনতাড়া করে আসা মেঘটার হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা। অথচ দৌড়াবার বা অবিবেচকের মত পা ফেলার কোন সুযোগই নেই এখানে।

আলো যে নিভছিল, রিফেল্কেক্টেড গ্লোরিরও যে এক সময় শেষ হয় তা বুঝতে দেরি হল না। দু'ঘণ্টার বদলে আরও তিরিশ মিনিট বেশি কেটেছে। ঝুপ ঝুপ করে নামছে অন্ধকার এবং সেই সঙ্গে মেঘের বার্তা নিয়ে আসা হিমবাতাস। এখন অনেকটা মনের আলোয় পথ খুঁজে চলা। আর সেই সময় শেরিঙ চিৎকার করে উঠল, খাদটা দেখতে পেয়েছে সে। শুধু চিৎকার নয়, আনন্দের উৎসাহ দিতে লাগল সে সবাইকে দ্রুত আসার জন্যে। দলগুলো বিভক্ত হয়ে ছাড়া ছাড়া হয়ে পড়েছিল। সহদেবের স্বচ্ছন্দ গতির সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না অরিন্দম। শুধু মনের জোরে হেঁটে যাওয়া। মেঘ এখন আকাশের তিন ভাগ দখল করে নিয়েছে।

খাদের এক পাশের পাহাড়টাকে দেওয়াল করে লোকগুলো যে দ্রুততার সঙ্গে তাঁবু খাটিয়ে ফেলল তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত ছিল। ওরা যখন তাঁবুর ভেতরে ঢুকতে পারল তখন পৃথিবীটা কালো কালিতে মোড়া। এইভাবে দ্বিতীয়বার তাঁবু তুলে আনা অবিবেচকের কাজ হয়েছে বলে কারো এক সময় মনে হলেও মেঘের চেহারা শেষ যা দেখা গিয়েছিল তা দেখার পর আর কেউ কথাটা তোলেনি। আজ আলো জ্বালার কোন উপায় নেই। জল বেশি আনা যায়নি এবং টিনের খাবার খেতে হবে। কিন্তু এসব চিন্তা কারো মাথায় আসছিলই না। প্রত্যে-কেই স্লিপিং ব্যাগের আশ্রয় চাইছিল রাতটার জন্যে।

বৃষ্টি পড়ছে না। অথচ বাতাস এখন উত্তাল। পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে খ্যাপা হাতির মত গর্জন করছে। ওদের সমস্ত অভিজ্ঞতা ছাপিয়ে গেছে আজকের ঠান্ডা। খুঁজে-পেতে একটা মোমবাতি জ্বালল সহদেব এবং তখনই দাঁতে দাঁত লাগার শব্দ পাওয়া গেল। সেই স্বল্প আলোয় দেখা গেল কল্পনা স্লিপিং ব্যাগের ভেতর শুয়েও ঠকঠক করে কাঁপছে। বসন্ত তার কাছে পৌছে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? ওরকম করছ কেন? কল্পনা।'

কল্পনা সাড়া দিতে পারছিল না। কয়েকবার নিজের নাম শোনার পর কোন মতে বলতে পারল, 'পারছি না। কি শীত, আমার শরীর বরফ হয়ে যাচ্ছে।'

বসন্ত অসহায় মুখে তাকাল। তার গলা ঘষঘষে শোনাল, 'কি করা যায়।'

সহদেব বলল, 'হাত পা ঘষে দাও। দেরি করো না।'

সংকোচ কাটিয়ে বসন্ত কল্পনার হাত তুলে গ্লাভস খুলে চিৎকার করে উঠল, 'বরফের মত ঠান্ডা!' তারপর প্রাণপণে নিজের হাত ঘষতে লাগল সেখানে। কল্পনার দাঁতে দাঁতে লাগার শব্দ বেড়েই চলেছে। এখন আর কথাও বলতে পারছিল না বেচারা। বসন্ত চিৎকার করল, 'একটুও গরম হচ্ছে না। আমি কি করব বলে দাও তোমরা। কল্পনা, কল্পনা শক্ত হও।'

সহদেব বলল, 'ওকে জড়িয়ে ধর বসন্ত, আমি দেখছি আগুন জ্বালানো যায় কি না।' তলায় ত্রিপল পাতা হলেও আগুন জ্বালার কোন উপকরণ আজ এই তাঁবুতে নেই। বসন্ত পাগলের মত স্লিপিং ব্যাগ থেকে কল্পনার মাথা বের করে এনে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। তার কনকনে নাক গাল কপালে হাত ঘষতে লাগল। তারপর প্রায় অসহায় গলায় কেঁদে উঠল, 'কিছুই হচ্ছে না।'

'হঠ যাইয়ে।' ঝড়ো বাতাস ডিঙিয়ে শব্দ দুটোকে চিৎকারের মত শোনাল। বসন্ত দেখল ঠক্কর ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। অদ্ভুত এক অসহায়তাবোধই তাকে কল্পনার মুখের কাছ থেকে সরিয়ে আনল। অন্য সময় সে কিছুতেই ঠক্করকে কল্পনার পাশে হাঁটু গেড়ে বসতে দিত না। খুব যত্নের সঙ্গে কল্পনার গালে আঙুল রেখে ঠক্কর মাথা নাড়ল। তারপর অরিন্দমের দিকে ফিরে চিৎকার করে উঠল, 'এ মেয়ে কেমন করে এতটা হাঁটল ঈশ্বর জানেন। এ একদম বরফ হয়ে যাচ্ছে।' তারপর নিজের রুকস্যাক থেকে একটা মাঝারি বোতল বের করে ছিপিটা খুলল। বাকি তিনজন কোন কথা বলছিল না। ঠক্কর দুটো আঙুলে কল্পনার যুক্ত-দাঁতের পাটি খোলার চেষ্টা করল। এখন আর সেগুলো শব্দ করছে না। মুখ সামান্য ফাঁক হতেই সে বোতলের তরল পদার্থের খানিকটা কল্পনার জিভের ওপর ঢেলে দিল। জিভ

নড়ে উঠল। মুখ দুহাতে সামান্য তুলে ঠক্কর কল্পনাকে গিলতে বাধ্য করল। মুখে সামান্য কুঞ্চন। ঠক্কর দ্বিতীয়বার একই চেষ্টা করল। তারপর কল্পনার প্রায় নীল হয়ে আসা গালে মৃদু চড় মারতে লাগল। বসন্ত দ্রুত চলে এল কাছে, 'কি খাওয়ালে ওকে ?'

ব্রান্ডির বোতলটা সামান্য ওপরে তুলে কিছু না বলে ফিরে গেল ঠক্কর। আর পাগলের মত কল্পনাকে চৈতন্যে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে যেতে লাগল বসন্ত। শেষ পর্যন্ত সে নিজেই ডুকরে কেঁদে উঠল। সহদেব চিৎকার করে উঠল, 'ডোন্ট গেট আপসেট বসন্ত।'

মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে বসন্ত বলল অভিযোগের গলায়, 'কল্পনা মরে যাচ্ছে।' তারপরই সে উঠে টলতে টলতে নিজের হ্যামকের কাছে ফিরে গেল। বাইরে ঝড়, মেঘের ডাক আর তাঁবুর ভেতর স্বল্পালোকে কয়েকটি মানুষ নিজেদের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনেছে। অরিন্দম এতক্ষণ চুপচাপ দেখছিল। আগুন আর ভালবাসা যে চাপা থাকে না এটা আর একবার সত্য হল। বসন্ত এখন আর কোন সংকোচ মানেনি। কিন্তু একটা মানুষ চোখের সামনে স্রেফ শীতে জমে মরে যাবে ? সে ধীরে,ধীরে উঠে কল্পনার সামনে এসে দাঁড়াল। রক্তহীন মুখ নিয়ে মেয়েটা শুয়ে আছে, শরীর নিশ্চল। এমন কি এই মুহূর্তে ও জীবিত কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। অরিন্দম হাঁটু গেড়ে বসে ওই মুখের দিকে তাকাল। আহা, মানুষ কখন এমন নির্মোহ হয়ে যায় ? সে আচমকা চিৎকার করে দুহাতে কল্পনাকে ঝাঁকাতে লাগল। ওর চোখের পাতা কি নড়ছে ? একটু কি ঠোঁট ফাঁক হল ? মাথাটা নামিয়ে আঙুল রাখল নাকের নিচে অরিন্দম। একটু কি নিঃশ্বাসের স্পর্শ। কল্পনাকে ভাল করে ঢেকে সরে এল অরিন্দম। আর তখনই বসন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'বেঁচে আছে ?'

'হ্যাঁ। ওকে ওর মত বেঁচে উঠতে দাও বসন্ত।'

'ওঃ। ভগবান। ও আপনাকে দাদার মত শ্রদ্ধা করত।'

'করত ?' চিৎকার করে উঠল অরিন্দম। এবং তখনই মনে হল বাইরে গুমগুম শব্দ হচ্ছে। শব্দটা যে বৃষ্টির, তা বুঝতে সময় লাগল। মুখ ফিরিয়ে অরিন্দম দেখল হ্যামকে শুয়ে ঠক্কর ব্রান্ডির বোতলটা গলায় ঢালছে। পৃথিবী আরও শীতল হয়ে উঠেছে।

রোদ উঠল দুপুরে। পাহাড়ের আড়াল না থাকলে গতরাত্রে কাউকে যে বেঁচে থাকতে হত না এই সত্য আজ সকালেই বোঝা গেছে। ভোর হয়েছিল বৃষ্টি ছাড়াই। কিন্তু মেঘ সরেনি তখন, আলো ছিল না থাকার মত হয়ে। বসন্ত একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে। ঠক্কর যদি শেরিঙের সঙ্গে উৎসাহ নিয়ে ব্যবস্থা না করত তাহলে এই দুপুরেও কল্পনা তার স্লিপিং ব্যাগে শুয়ে থাকত। ওরা যখন কল্পনাকে বরফের নিচে চিরকালের মত শুইয়ে দিচ্ছে, তখন তাঁবু থেকে বের হয়নি অরিন্দম। বসন্ত গিয়েছিল। কিন্তু সে কাঁদেনি। কান্নার কোন শব্দ এই বরফের পাহাড়ে বাজেনি। একটা মেয়ে তার সবরকম ভাবনা এবং সংস্কার নিয়ে কাল পর্যন্ত বেঁচে-বর্তে ছিল, একদম বিনা নোটিসে চলে গেল চুপচাপ। চিত্রনাট্যে এরকম মৃত্যু থাকলে সমালোচকরা বলতেন আরোপিত, সাজানো, বড্ড জার্ক হয়ে গেল। সাধারণ মানুষ বলতেন অবিশ্বাস্য। হায়, জীবন যে বিশ্বাসের নিয়ম মেনে চলে না। লক্ষবার ভালবাসার শপথ নিয়েও কেন এক নারী হঠাৎই অন্য পুরুষের জন্যে বেদনার্ত হয়! অরিন্দম তার মুখ মনে করল। এই মুহূর্তে সেই নারীকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল তার।

দুপুরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এগিয়ে যেতে হবে। কারণ ওপারের সেই ধাতব পদার্থের ওপর আলো পড়ায় এপার থেকে দেখতে অসুবিধে হচ্ছে না। সহদেব, শেরিঙ এমনভাবে কথা বলছিল, যা থেকে মনেই হচ্ছিল না একটু আগে একজন দল থেকে চিরকালের জন্যে সরে গেছে। বসন্ত বসে আছে উদাস হয়ে। সহদেব বোঝাচ্ছিল এই বৃষ্টিতে যদি কিছু তুষার সরে যায় তাহলে যেমন ভেঙে পড়া প্লেনের টুকরোগুলো দেখতে পাওয়া যাবে, তেমনি পায়ের তলার বরফ নরম হয়ে যেতে পারে। অতএব এগোতে হবে খুব সাবধানী পায়ে। কিভাবে খাদের ভেতর নেমে ওপারে ওঠা যায় তাই নিয়ে জল্পনা করছিল ওরা। সহদেব দূরবিনের সাহায্যে ধাতব খন্ডটা দেখে প্রায় নিশ্চিত হয়েছে ওটা ভেঙে পড়া প্লেনের একটা অংশ। তাঁবু খাটিয়ে রওনা হতে হতে কিছুটা দেরি হয়ে গেল। বসন্ত বারংবার পেছন ফিরে

তাকাচ্ছে। তার আর সহদেবের কোমর এখন এক দড়িতে যুক্ত। ঠক্কর এগোচ্ছে অরিন্দমের সামনে। তাঁবু গোটাবার সময় কল্পনার ট্রাঞ্জিস্টারটা হঠাৎ যান্ত্রিক শব্দ তুলেছিল। ওটা সারারাত খোলা থাকা সত্ত্বেও নিশ্চুপ ছিল, সকালে আচমকা জানান দিল। অরিন্দম দেখেছিল বসন্ত ছুটে গিয়ে যন্ত্রটাকে স্তব্ধ করে দিল। শোকের ছায়া মালবাহকদের ওপরেও। দুটো মানুষের এত অল্প সময়ে চলে যাওয়াটা কারোরই সহ্যের মধ্যে পড়েনি।

ওরা হাঁটছিল সাবধানে। বরফের কুচি ছিটকে উঠছে বুটের ঠোকায়। ধীরে ধীরে নেমে যেতে হবে অন্তত তিনশো ফুট। তারপর আবার ওঠা খাড়া পাহাড় বেয়ে। এখন আর ধাতব খণ্ডটি দেখা যাচ্ছে না। ওরা অনেকটা ঘুরপথে নামছে। হঠাৎ ঠক্কর দাঁড়িয়ে পড়তেই অরিন্দম মুখ তুলে তাকাল। ঠক্কর যেন কিছু দেখার চেষ্টা করছে উত্তর দিকে। সে হাত নেড়ে অরিন্দমকে ইশারা করল কাছে আসতে। দূরত্বটা ঘুচিয়ে অরিন্দম দেখার চেষ্টা করল। অন্তত আধ কিলোমিটার দূরে বরফের ওপর দিয়ে চারটে মূর্তি ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। ওদের এত ছোট দেখাচ্ছে যে খালি চোখে ঠাওর করা মুশকিল। দূরবিন রয়েছে সহদেবের কাছে। ওরা অনেকটা নেমে গেছে। ঠক্কর বলল, 'মিসেস সেনের পার্টি। আঃ তাহলে ওরা আমাদের আগে পৌঁছয়নি।'

অরিন্দমেরও তাই মনে হল। যদিও এত দূর থেকে কিছুই চেনা যাচ্ছে না তবু আর কোন দল এদিকে আসবে? ঠক্কর বলল, 'আমাদের আরও জলদি যেতেই হবে।'

অরিন্দম বলল, 'ইচ্ছে হলে তুমি যেতে পার। আমার সেরকম কোন বাসনা নেই।'

কাঁধ ঝাঁকাল ঠক্কর। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল।

ওরা যখন ধাতব খণ্ডের কাছে পৌঁছাল তখন এই ঠাণ্ডাতে ঘাম জমবার উপক্রম, নিঃশ্বাস দ্রুত পড়ছে। দুটো দুর্ঘটনা হতে হতে হয়নি। একবার বসন্ত পা পিছলে অনেকটা নিচে গড়িয়ে পড়তে পড়তে সহদেবের দড়ির টানে রক্ষে পেয়েছিল। আর একবার একটি মালবাহক ভুল করে এক বুক নরম তুষারের ভেতর তলিয়ে যাচ্ছিল। এখনও রোদ মরতে ঘণ্টা দুয়েক বাকি। সহদেব চাইছিল আজকের রাতটা এখানেই কাটিয়ে দিতে। যদিও আকাশে মেঘ নেই তবু বলা যায় না। এখানে পাহাড়ের আড়াল পাওয়া যাবে। কিন্তু ঠক্করের জেদের জন্যে আবার চলা শুরু হল। ধাতব খণ্ডটি যে ভেঙে পড়া প্লেনের তাতে আর সন্দেহ নেই। যদিও দুর্ঘটনাস্থল থেকে

আধমাইল দূরেও খণ্ডটি ছিটকে আসতে পারে তবু সবাই খুশি হয়েছিল এই ভেবে যে, তারা ভুল পথে আসেনি।

সন্ধের আগে ওরা চূড়ায় উঠে এল। এখান থেকে আর পাহাড় ভাঙতে হবে না। প্রায় ফুটবল মাঠের মত সমান বরফের ওপর দিয়ে কয়েক মাইল যাওয়া যাবে। আর তখনই সহদেব দূরবিনে চোখ লাগিয়ে চিৎকার করে উঠল, সে দেখতে পেয়েছে। দূরবিন নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সবাই দেখতে চায়। অরিন্দম আশেপাশে তাকিয়ে কোথাও পিঁপড়ের মত চারটে মূর্তি দেখতে পেল না। ওরা কোন পথে আসছে? সহদেব শেষ পর্যন্ত অরিন্দমকে দূরবিনটা দিল, 'দেখুন দাদা।'

আলো প্রায় নেই বললেই চলে। অরিন্দম চোখ রেখে বলল, 'ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না।' সহদেব কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'একটু ডানদিকে ঘোরান। পেয়েছেন?' অরিন্দম মাথা নাড়ল। প্লেনের ধ্বংসাবশেষ যদি ওগুলো হয়, তাহলে ইতিমধ্যে বেশ বরফ জমেছে তার ওপর। সে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'দূরত্ব কতটা?' সহদেব উত্তর দিল, 'সিকি মাইল তো হবেই।'

অরিন্দম নিঃসন্দেহ হল স্যুটকেস খুঁজে পাওয়া যাবে না। একটা প্লেনের শরীর যদি বরফে আধচাপা হয়ে পড়ে থাকে তাহলে স্যুটকেস পাওয়ার কথা চিন্তা করা যায়? এই সময় সে ঠক্করের গলা শুনল, 'দেন লেটস মুভ, এই রাস্তাটুকু যেতে কোন অসুবিধা হবে না।'

সহদেব প্রতিবাদ করল. 'ইম্পসিবল। এই অন্ধকারে এগোতে যাওয়া মানে সুইসাইড করা। কোথায় চোরা খাদ আছে জানি না। বরফের সঙ্গে জেদ চলে না। তাছাড়া ওখানে অন্ধকারে গিয়ে লাভ হবে কি! কিছু দেখতে পাবেন? আর ওই ওপ্‌ন স্পেসে রাত কাটানো সম্ভব নয়।'

শেরিঙ কথাগুলোকে সমর্থন করল। ঠক্কর কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। বসন্ত চুপ করে আছে। অরিন্দম দূরবিন ঘুরিয়ে চারপাশ দেখছিল। পৃথিবীটা ঘোলাটে হয়ে আসছে। সে উত্তর দিকে দূরবিন ফেরাতেই লোকটাকে দেখতে পেল। পাহাড়ের গা ঘেঁষে ইতিমধ্যে তাঁবু ফেলা হয়ে গিয়েছে। লোকট একা দাঁড়িয়ে আছে দুর্ঘটনাস্থলের দিকে মুখ করে। তারপর তাঁবুর ভেতর ঢুকে গেল। জায়গাটা এখান থেকে বেশি দূরে নয়।

আজ মেঘ নেই। কালকের অমন ঝড়বৃষ্টির পর আজ মাখনের মত নরম জ্যোৎস্না যে কোত্থেকে পৃথিবীতে পাঠান তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। সামান্য কিছু খেয়ে সবাই শুয়ে পড়েছিল। হঠাৎ বসন্তর গলা পাওয়া গেল, 'দাদা, আমরা

কি স্যুটকেসটা খুঁজে পাব ?' আজ সারাদিন যে লোকটা একটাও কথা বলেনি তাকে সত্যি বলতে বাধলো অরিন্দমের, 'চেষ্টা করব বসন্ত।'

বসন্ত বলল, 'পেতেই হবে দাদা। ওই ফিল্মের মধ্যে কল্পনা বেঁচে থাকবে চিরকাল।'

সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল। এক মুহূর্তের জন্যে নিঃশ্বাস ভারী হল অরিন্দমের। মহুয়া একটা ছবিতে তার নায়িকা হিসেবে অভিনয় করেছিল। মৃত্যুর পরে ছবিটা রিলিজ করে। সেটা দেখতে গিয়ে উঠে এসেছিল সে। স্মৃতি যতক্ষণ জড় হয়ে থাকে ততক্ষণ তা সহনীয়। কারণ জড় বিলোপ পাবেই। কিন্তু সচল ছবি, গলার স্বর কখনই স্মৃতিকে মরতে দেয় না। এক জীবনে দেখা সব মৃত্যু যদি এভাবে সজীব থাকত তাহলে মানুষ পাগল হয়ে যেত।

তখনও ভাল করে ভোর হয়নি। শরীরে স্পর্শ পেয়ে ঘুম ভাঙল অরিন্দমের। চোখ খুলে অন্ধকারে যে মূর্তিটিকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে যে ঠক্কর বুঝতে অসুবিধে হল না একটু বাদে। তাঁবুর ভেতর যদিও এখন অন্ধকার কিন্তু ঠক্করের চাপা গলা ওকে চিনিয়ে দিল, 'লেটস গো।'

'কোথায় ?' অরিন্দমের মস্তিষ্ক তখনও সচল নয়।

'এখনই আলো ফুটবে। ওরা পেঁছিবার আগেই আমাদের স্পটে যেতে হবে।'

'ওঃ নো। যেতে হয় তো একা যাও।'

'সেটা সম্ভব নয়। তুমি হীরেগুলো চাও না ?'

'না। ছবিটা চাই।'

'ওঃ। ছবিটা পেলে লাভ হবে প্রোডিউসারের। তোমার কি ? লেটস গো।'

'সবাইকে ডাকো।'

'ওরা পরে আসবে। হীরের কথা বাদ দিলেও আমরা এগিয়ে গেলে ক্ষতি কি।'

'আই অ্যাম সরি। এখন যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।' অরিন্দমের কথা শেষ হওয়ামাত্র ঠক্কর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করল। এবং অরিন্দমকে কিছু করার সময় না দিয়েই তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে গেল। শব্দটা কানের ভেতর পাক খাচ্ছিল অরিন্দমের। শেষ পর্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সে। তৈরি হয়ে নিচে নেমে লাঠি আর রিভলবারটাকে সঙ্গে নিল। ওই বস্তুটির কথা ইদানিং মাথাতেই ছিল না। সহদেব আর বসন্ত ঘুমোচ্ছে। সে তাঁবুর বাইরে এসে দেখল সূর্যদেবের কোন চিহ্ন নেই। জ্যোৎস্নাও নেই এবং অদ্ভুত আঁধার এক নেমে এসেছে পৃথিবীতে। ঠক্করকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। লোকটাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার

জন্যে তার মন যেভাবে তৈরী হয়েছিল এখন এই পরিবেশে তার কোন উপায় খুঁজে পেল না। আর তখনই সে দূরে বরফের মধ্যে আগুন জ্বলতে দেখল। কাল দূরবিনে যে তাঁবু ধরা পড়েছিল আগুনটা জ্বলছে সেখানেই।

'সরি হিরো সাহাব। এখানে একা যাওয়া যায় না।'

কথাগুলো কানে আসামাত্র চমকে মুখ ফিরিয়ে অরিন্দম ঠক্করকে এগিয়ে আসতে দেখল। এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে ঘুষি মারল লোকটার মুখে। উল্টে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিল ঠক্কর। অরিন্দমের প্রতি আক্রমণের আশংকা করেছিল। কিন্তু ঠক্কর প্রায় তিরিশ সেকেণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শব্দ করে হাসল, 'যাক, শরীরটা গরম হয়ে গেল।' তারপরেই গলাটা পাল্টে বিষাক্ত স্বরে উচ্চারণ করল, 'রিভলবারটার জন্যে এ যাত্রায় বেঁচে গেলে। তবে আমি কথা দিচ্ছি, মিনিমাম যে চান্স পাব তাতেই তোমাকে ওপারে পাঠাবো। ঠক্করকে মেরে কেউ বেঁচে থাকতে পারেনি।'

এর উত্তরে অরিন্দম কি বলতে পারে। পাশ কাটিয়ে লোকটা চলে গেল ভেতরে। হাতঘড়ির সময় অনুযায়ী এতক্ষণে সূর্যদেবের উঠে পড়ার কথা। তবে কি আবার মেঘ জমল? অরিন্দম দেখল আগুনটা নিভে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আর দেখা গেল না।

সকাল নটাতেও আলো নেই। তবে অন্ধকারের বদলে ঘন ছায়ায় পৃথিবী জড়ানো। পথে বৃষ্টি নামলে বিপদ হবে বলে সহদেব আজকের দিনটাও এখানে কাটাতে চাইছিল। ঠক্কর বোঝাতে চাইল একবার দুর্ঘটনাস্থল থেকে ঘুরে এলে ক্ষতি কিছু নেই, সময়ও বেশি লাগবে না। অনুসন্ধানের কাজ না হয় আগামী কাল শুরু করা যাবে। হঠাৎ বসন্ত ঠক্করকে সমর্থন করে বসায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেই হল। ঠিক হল সবাই যাবে না, বসন্ত ঠক্কর সহদেব এবং শেরিঙ ঘুরে আসবে। শুধু দর্শনের জন্যে যাওয়ার বিন্দুমাত্র বাসনা নেই অরিন্দমের। কাল যখন অনুসন্ধান চালানো হবে তখনই সে যাবে। এবং আজ এরা কেউ বিমানের ধ্বংসাবশেষে হাত দেবে না। বেরুবার আগে ঠক্কর অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসল।

চারটে লোক বরফের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। শেরিঙ ঠক্কর এবং সহদেব বসন্ত। তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে ওদের হাত নেড়ে বিদায় জানাল অরিন্দম। একবার মনে হয়েছিল বসন্তকে ঠক্করের মতলবটা জানিয়ে দেবে। কিন্তু সে অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করল।

সাদা বরফের ওপর ছায়া পড়ায় ময়লাটে দেখাচ্ছে। ধীরে ধীরে ওদের চেহারা

ছোট হয়ে আসছে। শেরিঙের যে লোক দুটো ওদের যাওয়া দেখছিল তাদের চা বানাতে বলল অরিন্দম। এখন তার কিছু করার নেই। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে তাঁবুতে ফিরে এল। এবং তখনই তার মিস্টার সেনের কথা মনে পড়ল। লোকটা কি সত্যি মারা পড়েছে ঠান্ডায়? না ওই চারটে লোকের মধ্যে মিস্টার সেনও রয়েছে। সে রুমালটা বের করল। এখনও মিষ্টি গন্ধটা লেগে আছে এর গায়ে। ঘ্রাণ নিল সে।

মিনিট দশেক পরে চা খাওয়ার পর অরিন্দম একজন মালবাহককে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে হাঁটছিল। কাল যেখানে সে দূরবিনের সাহায্যে তাঁবু দেখেছে সেখানে পেঁছাতে খুব ঝামেলা হবে না। তবু সাবধানের মার নেই বলে সে লোকটিকে সঙ্গে নিয়েছে। বসন্তদের আর খালি চোখে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ওরা নিশ্চয়ই এদের যেতে দেখেছে। অবশ্য যদি সকাল হতেই ওরা রওনা হয়ে যায় তাহলে আলাদা কথা। সেক্ষেত্রে দুর্ঘটনাস্থলে দুটো দল মুখোমুখি হবেই। অরিন্দম নিজেই ঠিক জানল না কেন সে ওই তাঁবুর দিকে যাচ্ছে। হঠাৎ পাহাড়ের আড়াল সরে যেতেই সে তাঁবুটাকে দেখতে পেয়ে হাত তুলে সঙ্গীকে থামতে বলল। তাঁবু রয়েছে কিন্তু কোন মানুষের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে না। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষার পর অরিন্দম এগোল। তার হাতে এবার রিভলবার। সেটা লক্ষ্য করে ওর সঙ্গী যেন বেশি সতর্ক হয়ে উঠেছে। যে কোন পরিস্থিতির জন্যে তৈরী হয়ে অরিন্দম তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়াল। কোথাও কোন শব্দ নেই। সে তাঁবুর দরজা সরিয়ে ভেতরে মুখ বাড়াল।

কেউ নেই। জিনিসপত্র দেখে বোঝা যায় আজ সকালেই ওগুলো ব্যবহৃত হয়েছিল। তাঁবুর ভেতরে কোন মেয়েলি গন্ধ নেই। রুমালে যে বাস ছিল তা যেন রয়ে গেছে রুমালেই। চারজন মানুষ এই তাঁবুতে ছিল। চারজনের মধ্যে দুজন মালবাহক বলে অনুমান করা যায়। জিনিসপত্র খুবই অল্প কিন্তু এই তাঁবুটাকেও তো বহন করতে হয়েছিল। বোঝা যাচ্ছে কি কারণে এগিয়ে থেকেও ওরা প্রায় একই সময়ে এখানে পেঁছেছে! কিন্তু মিসেস সেন, সেই অহংকারী নারী, একই তাঁবু ব্যবহার করতে পারছেন! অরিন্দম বাইরে বেরিয়ে এল।

অরিন্দমের সঙ্গী মালবাহকটি দাঁড়িয়েছিল উদগ্রীব হয়ে। সে বাইরে বেরিয়ে আসামাত্র লোকটা হাত তুলে আকাশ দেখাল। বুকের ভেতর ধক্ করে উঠল অরিন্দমের। হু হু করে ছুটে আসছে কালো মেঘ। যেন বরফের ওপর কালো মোষের দল প্রাণভয়ে ছুটছে। আলো কমে এসেছে আরও। এবং মেঘ পেঁছে যাওয়ার আগে

বাতাসের ধাক্কা লাগল শরীরে। পড়িমড়ি করে ওরা তাঁবুর ভেতরে ঢুকে যাওয়া-মাত্র মনে হল ওটা এখনই উড়ে যাবে। প্রচন্ড টান পড়েছে তাঁবুর বাঁধনে। যে দিকটা খোলা সেদিকটাই বেছে নিয়েছে হাওয়ারা। অরিন্দম বুঝতে পারছিল না কি করা যায়। এটা তো স্পষ্ট আটজন মানুষ এখন ওই ভাঙ্গা প্লেনের কাছে পৌঁছেছে। এই রকম কিছুক্ষণ চললে কাউকে জীবন্ত আশা করা যাবে না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সে আজ ওই দলের সঙ্গে যেতে চায়নি।

এই সময় পরিত্রাহি চিৎকার শুনতে পেল অরিন্দম। সে তার সঙ্গীর দিকে তাকাল। তারপর তাঁবুর দরজাটা সরিয়ে বাইরে মাথা বের করল। এ দৃশ্য সে কখনও দ্যাখেনি। তুষার উড়ছে বাতাসে। সমস্ত পৃথিবী যেন দখল করে নিয়েছে তুষার ঝড়। আর সেই ঝড় যেন আটকে রাখছে চারটে মানুষকে। ওরা এই তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসতে চাইছে প্রাণপণে। একজন বসে পড়ল। তার দিকে নজর নেই বাকিদের। যেন সাঁতরে সাঁতরে ওরা একটু একটু করে এদিকে আসছে। তাঁবুর ভেতর পৌঁছে তাকে দেখে ওরা ক্ষেপে উঠতেই পারে। কিন্তু ওই অবস্থার মধ্যে দিয়ে এসে কিছু করার ক্ষমতা কারো থাকতে পারে না। মুখোমুখি হওয়াই এক্ষেত্রে উচিত কাজ। অরিন্দম বাইরে বেরিয়ে এল। প্রথম যে লোকটা তাকে দেখল তার পরিচয় বোঝার উপায় নেই, কারণ চোখে রঙিন চশমা, মুখের চামড়া খোলা নেই। কিন্তু এক মুহূর্ত থমকে গেল লোকটা। বোঝা গেল দ্বিতীয় চিন্তা করার সামর্থ্য নেই বলে সে ভেতরে ঢুকে গেল কোন মতে। দ্বিতীয় লোকটি তাকে দেখামাত্র বিড়বিড় করে কিছু বলল। বলে ভেতরে চলে গেল। তৃতীয় লোকটিকে অপেক্ষাকৃত শক্ত বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু ওরও শরীর টলছে। অরিন্দমের পাশে দাঁড়িয়ে লোকটা যেভাবে তাকাল তাতে ঠক্করের কথা মনে পড়ল। ঠক্কর এই দলে? অরিন্দম কিছু বোঝার আগেই লোকটা ভেতরে চলে গেল। চতুর্থ জন তখনও অন্তত পনের গজ দূরে। এখন সে মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে টলছে। বোঝা যাচ্ছে এগিয়ে আসার সামর্থ্য অবশিষ্ট নেই। অরিন্দম তার সঙ্গীর উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল, 'ওদের দ্যাখো।'

লোকটা মাথা নেড়ে তাঁবুর ভেতর ঢুকেই চিৎকার করতে লাগল। সেদিকে নজর ছিল না অরিন্দমের। ঝড় বরফ নিয়ে ছুটে যাচ্ছে সমান বেগে। কালো মেঘ যেন এবার সেই ঝড়ের বুকে মিশছে। একটা মানুষ চোখের সামনে মারা যাবে, মাথায় ঢোকামাত্র অরিন্দম ছুটল। কয়েক পা যাওয়ামাত্র শক্ত বরফে সে আছাড় খেল। বাতাস যেন সামনে অদৃশ্য পাঁচিল গড়ে তুলছে একটার পর একটা। সমস্ত

শরীরে বরফের টুকরো ছিটকে পড়ছে। অরিন্দম নিচু হয়ে ছুটল। একটু ঢালু বলেই শরীরের ভার রাখতে হচ্ছে পেছনে। শেষ পর্যন্ত লোকটার কাছে পেঁছে হাত বাড়িয়ে কনুই ধরে চিৎকার করল, 'চলে আসুন।'

এই সময় আর্তনাদটা ছিটকে উঠল, 'আমি পারছি না, আর পারছি না।'

আর দিন দুপুরে যেন ভূত দেখল অরিন্দম। প্রচণ্ড শক্তিতে সে শরীরটাকে টেনে আনতে লাগল তাঁবুর দিকে। হাওয়ার তীব্র বেগ এবং আর একটি শরীরের ভার গতি শ্লথ করছিল এবং এই সময় সঙ্গী মালবাহক যদি বেরিয়ে না আসত তাহলে ভোগান্তির চুড়ান্ত হত। দুজন দুপাশে দাঁড়িয়ে মিসেস সেনকে তাঁবুর ভেতর নিয়ে আসতেই তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। যে সুন্দরী মহিলাকে এয়ারপোর্টে, গ্যাংটকের হোটেলে এমন কি লাচেনের বাংলোয় সে-রাতে দেখেছিল তাঁর সঙ্গে এঁর কোন মিল নেই। সেই অহঙ্কারী সুন্দরী এই মুহূর্তে শীতের পোশাকে সর্বাঙ্গ মুড়ে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ ঘুচিয়েছেন।

কিন্তু এই তাঁবুতে শেরিঙ্ কেন ? মুখের আড়াল সরিয়ে লোকটা সামনে এসে বলল, 'সাহাব, হাম লোক মর গিয়া থা।'

'কি হয়েছিল ? তোমরা এখানে কেন ?' অরিন্দম শক্ত গলায় প্রশ্ন করল।

শেরিঙ্ খুব নার্ভাস গলায় যা জানাল তা হল, আজকের এই আবহাওয়ায় তার এবং সহদেববাবুরও যাওয়ার কোন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ওই ঠক্কর সাহেবের জেদ মেটাতে ওরা কোনমতে প্রাণে বেঁচে এল। তাঁবু ছেড়ে কিছুদূর যেতে কোন অসুবিধে হয়নি। কিন্তু তারপরেই বোঝা যাচ্ছিল মাঝে মাঝেই বরফ নরম হয়ে আছে। বেজায়গায় পা পড়লে তলিয়ে যেতে হবে। সহদেববাবু তখন বলেছিলেন আজ ফিরে আসতে। এবার বসন্ত জেদ ধরেছিল। ডাইরেক্টারের কথা ফেলতে না পেরে ওরা এগিয়েছিল। দলটা যখন দুর্ঘটনাস্থলের প্রায় কাছাকাছি তখন দ্বিতীয় দলটাকে দ্যাখে ওরা। এই দলটা পালিয়ে আসছিল। কারণ ওদের একজন বরফের নিচে তলিয়ে গেছে। প্লেনের ভাঙ্গা শরীরের সামনে তুষার চাপা খাদ ছিল যা লোকটা বুঝতে পারেনি। সে সময় আকাশে মেঘ দেখা যাওয়ায় খোঁজাখুঁজির ঝুঁকি নিতে চায়নি। শেরিঙ্ তখন বলেছিল ফিরে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু ঠক্কর আর বসন্ত জেদ ধরল এত কাছে এসে না দেখে ফিরে যাবে না। সহদেব আর শেরিঙ্ যখন ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল তখন ওরা এগিয়ে গেল। আর ফেরার পথেই ঝড়, তুষার ঝড় শুরু হয়ে গেল। কোথায় যাচ্ছে, কোন পথে যাচ্ছে তা কারো বোধে ছিল না। হঠাৎ এই তাঁবুটা চোখে পড়ায় এদিকেই দুটো দল এক হয়ে এগিয়ে এসেছিল।

অরিন্দম নিঃশ্বাস ফেলল। দুদলে মোট আটজন লোক ছিল। একজন তলিয়ে গেছে, দুজন এগিয়েছে, তাহলে এখন থাকার কথা পাঁচজনের। অথচ দেখা যাচ্ছে পাঁচজনকে। প্রশ্নটা করতে শেরিঙ্ মাথা নেড়ে জানাল সে এ ব্যাপারে কিস্যু জানে না। তার সরল অর্থ একটি মানুষ আসার পথে নিখোঁজ হয়েছেন।

অরিন্দম বাকি দুজনের দিকে এগিয়ে গেল। ঝড়ের দাপট সমানে চলছে। যে কোন মুহূর্তে তাঁবু উড়ে যেতে পারে।

তাকে এগিয়ে যেতে দেখে একজন মানুষ যেন কিছুটা কুঁকড়ে গেল। তার সামনে দাঁড়িয়ে অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে?'

লোকটির সর্বাঙ্গ ঢাকা। মুখের আধ ইঞ্চিও দেখা যাচ্ছে না। পাশের লোকটি সিকিমিজ ভাষায় চিৎকার করে উঠতে শেরিঙ্ তাকে সান্ত্বনার কথা বলল! অর্থাৎ মিসেস সেন, শেরিঙ, মালবাহক আর—।

অরিন্দম দেখল লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে কোনমতে। তারপর চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি চান?'

'ওঃ। না কিছু চাই না। সহদেব কোথায় গেল জানেন?'

'নো। কিন্তু আপনি এখানে কেন? এটা আমাদের তাঁবু। লেট আজ স্টে ইন পিস।'

অরিন্দম অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'আপনি আমাদের এখনই চলে যেতে বলছেন চ্যাটার্জী!'

'এখানে আপনার আসার কথা নয়।'

হঠাৎ ওপাশ থেকে একটি কণ্ঠস্বর ছিটকে উঠল, 'নো। ইউ মাস্ট স্টে হিয়ার। আপনি যাবেন না।'

চ্যাটার্জী যেন হুঙ্কার দিতে পারল, 'আঃ। দে আর আওয়ার কম্পিটিটার। তুমি কেন নাক গলাচ্ছ আমার কথায়?'

'দিস ইজ টু মাচ চ্যাটার্জী। তুমি কি ভাবছ নিজেকে? ওঃ, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এসে কি ভুল করেছি!'

'হা হা হা। আমি সঙ্গে না থাকলে এতদূরে তুমি আসতেও পারতে না ডার্লিং। ওয়েল, আমি আগামীকাল পর্যন্ত চুপ করে থাকব। এতদিন অন্ধের মত শুধু আশা করে যাচ্ছিলাম। আজ স্পটে গিয়ে মনে হল ভুল করিনি।'

অরিন্দম দুজনের দিকে তাকাল। সহদেব কোথায়? বসন্ত এবং ঠক্কর না হয় মৃত্যুর দিকে এগিয়েছে। কিন্তু সহদেব? তার তো পাহাড়ে অভিজ্ঞতা আছে।

এমন হতে পারে তুষার ঝড়ে দলছুট হয়ে সে নিজেদের তাঁবুতে ফিরে গিয়েছে। অরিন্দমের মনে হল এখনই সেখানে যাওয়া দরকার। সহদেবের সঙ্গে কথা বলে বসন্তদের সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব জরুরী। কিন্তু—। সে চ্যাটার্জীর দিকে তাকাল, 'মিস্টার চ্যাটার্জী, আপনি কি মিস্টার সেনকে খুন করেছেন ?'

'হোয়াট ?' মিসেস সেন চিৎকার করে উঠলেন, 'কি বলছেন আপনি ?'

'উত্তরটা ওঁর দেওয়া উচিত।'

'হোয়াই শুড আই ? তাছাড়া ওঁকে আমি পাব কোথায় ?' চ্যাটার্জীর গলা নির্লিপ্ত।

'আপনাদের ধরতে উনি আমাদের ক্যাম্প থেকে এক রাত্রে বেরিয়ে পড়েছিলেন। আপনি তার আগে ওঁকে খুন করবার জন্যে যে লোক পাঠিয়েছিলেন তা আমি জানি। আমি সন্দেহ করছি সেন যদি জীবিত অবস্থায় আপনাদের কাছে পেঁছাতো তাহলে দ্বিতীয়বার আপনি ব্যর্থ হতেন না।'

'সেন এসেছিল এখানে ? আমি বুঝতে পারছি না।' মিসেস সেন উঠে দাঁড়ালেন।

'ইয়েস মিসেস সেন। তিনি দুটো ভাঁড় নিয়ে গোয়েন্দার ছদ্মবেশে এসেছিলেন, মাথায় উইগ পরে, কিন্তু আপনার বন্ধুর নজর এড়াতে পারেননি। আই অ্যাম এ্যাফ্রেড হি ইজ ডেড।'

'আমি জানি না। ওকে আমি আর দেখিনি। বিশ্বাস করুন।' চ্যাটার্জী চিৎকার করে উঠল।

'আই নেভার ওয়ান্টেড দ্যাট। চ্যাটার্জী, তুমি আমাকে প্রতারণা করেছ। আমি সেনের স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারছিলাম না, তার মানে এই নয় আমি ওর মৃত্যু চেয়েছিলাম। আমি জানি হিরেগুলো পেলেই ইউ উইল কিল মি। আজ ফেরার সময় তুমি আমাকে সাহায্য করার চেষ্টাও করনি। কিন্তু আমি বাঁচতে চাই। অরিন্দমবাবু, আমাকে দয়া করে আপনাদের তাঁবুতে নিয়ে যাবেন। এ কথা শোনার পর আমি আর এখানে থাকতে পারব না।' মিসেস সেন বিষণ্ণগলায় বললেন।

চ্যাটার্জী চিৎকার করল, 'নো। তুমি কোথাও যাবে না।'

'নো।' আমি তোমাকে একটা কেন্নো মনে করতাম, কিন্তু তুমি একটা বিষাক্ত বিছে।'

'আই সি। ইউ বিচ্। ইউ, ইউ, অলওয়েজ চেঞ্জ ইওর ম্যান, বাট আই কান্ট এ্যালাউ ইউ দিস টাইম।' ক্ষিপ্ত মানুষটি এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ থমকে

দাঁড়াল। অরিন্দম হাত তুলেছে।

দুজনের মাঝখানে দেওয়ালের মত দাঁড়িয়েছে। চাপা গলায় সে বলল, 'ইটস এনাফ চ্যাটার্জী।'

পনের সেকেন্ড দাঁড়াল চ্যাটার্জী। তারপর পেছন ফিরল।

সহদেব সেন ফেরেননি। এখন ঘড়ির সময় অনুযায়ী বিকেল। তুষার ঝড় আপাতত কিছুটা কমে এলেও সূর্যদেবের দর্শন পাওয়া যায়নি। সময়টা এখন এমন যে বসন্তদের ফিরে আসাও অনিশ্চিত হয়ে এসেছে। মালবাহকদের সাহায্যে মিসেস সেনকে এই তাঁবুতে এনে শেরিং স্লিপিং ব্যাগের ভেতর শুইয়ে দিয়ে যথেষ্ট পরিচর্যা করেছে। শেষ পর্যন্ত ওদের সঙ্গে আনা দিশি মদ জোর করে মহিলাকে গিলতে বাধ্য করেছে। এবং তাতে কাজ হয়েছে। মহিলা ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু শেরিঙের দলবল খুব ভেঙে পড়েছে। ওদের একজনের পায়ে ইতিমধ্যে ক্ষত দেখা দিয়েছে। সঙ্গে আনা ওষুধ কতটা কাজ করবে বোঝা যাচ্ছে না। যখন রাত হয়ে এল তখন বৃষ্টি আরম্ভ হল। ঠিক কত ডিগ্রি মাইনাসে ঠান্ডা নেমেছে তা জানবার আগ্রহ কারো নেই। নিজের স্লিপিং ব্যাগে শুয়ে দিশি মদ খাচ্ছিল অরিন্দম। বসন্ত ঠক্কর অথবা সহদেব যে আর ফিরবে না তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। শেরিও রাত নামলে বলল এবার তাদের ফেরা উচিত। কারণ নবীন তুষারে পথ আরও অনিশ্চিত হয়ে যাবে। সর্বত্র পাতা হয়ে যাবে মৃত্যুর ফাঁদ। যে মালবাহকটি চ্যাটার্জীদের সঙ্গে গিয়ে জীবন্ত ফিরে এসেছে সেও এখন শেরিঙের দলে যোগ দিয়েছে। তার কাছে খবর পাওয়া গেছে ভেঙে পড়া বিমানের অবশিষ্ট অংশ বলতে চোখে পড়েছে একটা ঘরের মত খাঁচা। মালপত্র নিশ্চয়ই ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। আর সেসব চাপা পড়েছে বরফের তলায়। কয়েকটা মানুষের পক্ষে সেসব খুঁজে বের করা একদমই অসম্ভব। প্রকৃতি যদি আরও খারাপ হয়ে পড়ে তাহলে লাচেনে ফেরাই যাবে না।

কোন উত্তর দেয়নি অরিন্দম। সারাদিনে এই প্রথমবার সামান্য উত্তাপের ভেতর

থেকে সে বৃষ্টির শব্দ শুনেছিল। ফিরে যদি যেতে হয় তো সেটা আগামীকাল সকালে ভাবা যাবে। তাঁবুর ভেতরে একটা হ্যারিকেন জ্বলছিল। ঘড়িতে এখন মাত্র পাঁচটা। কিন্তু মনে হচ্ছে গভীর রাত। হ্যারিকেনের শিখাটা কাঁপছে। চোরা হাওয়া ঢুকছে নিশ্চয়ই। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল অরিন্দমের।

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। ঘোরটা কাটতেই প্রথম বুঝতে পারল বৃষ্টি নেই। কোন শব্দ হচ্ছে না। অথচ যে স্বপ্ন সে এতক্ষণ দেখছিল তাতে বৃষ্টি ছিল। সে একা বরফের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কোনক্রমে হাঁটছে। অথচ এখন পৃথিবী চুপচাপ। হ্যারিকেনটা নিভে গেছে। চোখের সামনে জমাট অন্ধকারের দেওয়াল। অরিন্দম কবজি চোখের সামনে নিয়ে এল। তিনটে বেজে বারো। ঈশ্বরও এখানে জেগে থাকতে ভয় পাবেন এই সময়ে। অরিন্দম আবার ঘুমাবার চেষ্টা করতেই খস-খস আওয়াজটা শুনতে পেল। ইদানীংকার অভ্যস্ত হাত দ্রুত চলে গেল মাথার পাশে যেখানে কালকে ঠান্ডা রিভলভারটাকে সে তৈরী রেখেছিল শোওয়ার সময়। কিন্তু অন্ধকারে হাতটা শুধুই হাতড়াল। চমকে উঠল অরিন্দম। মাথা তুলে সে তন্নতন্ন করে খুঁজল। কোথাও রিভলভার নেই। সঙ্গে সঙ্গে এই হিম ঠান্ডা ছাপিয়ে আর একটি শীতল স্রোত তীব্রবেগে আছড়ে পড়ল শিরায় শিরায়। কেউ তার ঘুমের সুযোগে রিভলভারটা সরিয়েছে।

খসখস শব্দটা এখন থেমে গেছে। ধীরে ধীরে উঠে বসল অরিন্দম। এবং তখনই অন্ধকার ফুঁড়ে সেই খসখসে গলাটা ভেসে এল, 'ব্যস্ত হবেন না, ওটা আমার কাছে রইল।'

অরিন্দম চুপ করে রইল। তার মাথা কাজ করছিল না। শুধু সে বুঝল ওই গলা এখন স্থির, আর অসহায় ভাব নেই।

'এটা নিতে হল কারণ আমি পুরুষদের আর বিশ্বাস করি না।' দ্বিতীয়বার গলাটা ভেসে এল।

অরিন্দম এবারেও কথা বলল না। কিছুটা সময় চলে যাওয়ার পর সে ধীরে ধীরে স্লিপিং ব্যাগের ভেতর হতাশ ভঙ্গীতে ঢুকে পড়ল। ওপাশ থেকে কোন আওয়াজ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সে শুধু বলতে পারল, 'শুয়ে পড়ুন।'

সকাল হল অনেক বেলায়। অন্তত অরিন্দমের কাছে। ঘুম ভেঙে যাওয়ার পরও মুখ বের করতে ইচ্ছে করছিল না। শেরিঙের গলায় তাকে জানান দিতেই

হল। শেরিঙ বলল, 'আজ ওয়েদার একটু ভাল হয়েছে। দলের সবাই চাইছে ফিরে যেতে। ওরা তিনজন যে বেঁচে নেই বুঝতেই পারছেন।'

অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি করতে বল?'

'বুদ্ধিমান লোকরা এসব ক্ষেত্রে ফিরেই যায়।'

'না।' চিৎকারটা ভেসে এল তাঁবুর ও প্রান্ত থোক; মিসেস সেন বললেন, 'ফিরে যাওয়ার জন্যে আমি আসিনি।'

অরিন্দম মাথা নাড়ল, এরা চলে যেতে চাইছে। এদের হেল্প ছাড়া আমরা ফিরতে পারব না।'

মিসেস সেন প্রচণ্ডভাবে মাথা নাড়লেন, 'এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়ার কি আছে? আমরা কি আর দু-একদিন অপেক্ষা করতে পারি না। এত কাছে এসে—, প্লিজ, এই ডিসিসন নেবার আগে আর একবার চিন্তা করুন।'

এই মহিলা গতরাতে তার রিভলভার চুরি করেছেন। যাঁকে সে তুষারঝড় থেকে বাঁচিয়েছে, যাঁকে এই তাঁবুতে এনে শুশ্রূষা করা হয়েছে তিনি তার উপযুক্ত দাম দিয়েছেন। এখন এইরকম কাঁদুনি তিনি কাঁদলে কি এসে যায়! এই সময় মিসেস সেন কাতর গলায় বলে উঠলেন, 'বেশ, আপনারা যদি চলেই যান তাহলে আমাকে ওই তাঁবুতে রেখে আসুন।'

'সেকি? ওখানে গেলে আপনি—।' অরিন্দম যা বলতে যাচ্ছিল তা শেষ করতে পারল না শেরিঙের বাধা দেওয়ায়, 'ওই তাঁবুটাকে আজ সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে না সাহাব।'

'সেকি?' চমকে উঠল অরিন্দম। আর সশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়লেন মিসেস সেন। কোন সুন্দরী মহিলা ওভাবে কেঁদে উঠলে স্বয়ং ঈশ্বরও বিচলিত হন। অরিন্দম বলল, 'শেরিঙ, আমরা আগামীকাল পর্যন্ত ফিরে যাওয়াটা বন্ধ রাখতে পারি না? আজকের দিনটা বিশ্রাম নিলে কেমন হয়?'

'তাই হবে সাহাব।' শেরিঙ সরে গেল সামনে থেকে।

অরিন্দম ক্রন্দনরতাকে দেখল। সকালে নিশ্চয়ই মুখে ক্রিম দিয়েছেন কিন্তু কান্নাটা সত্যি। সে একটু বাঁকা স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'মিসেস সেন, আপনার স্বামীর মৃত্যুর আশঙ্কা সত্ত্বেও আপনি কাঁদেননি, কিন্তু চ্যাটার্জীর তাঁবু উড়ে যাওয়ার খবর পেয়ে এভাবে ভেঙে পড়ছেন কেন? ওই লোকটা তো আপনাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল।'

মিসেস সেন জবাব দিলেন না। নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করলেন। অরিন্দম

আর কথা বাড়াল না।

এই ঠান্ডায় নিজেকে পরিষ্কার এবং হালকা করার কাজটা খুবই কষ্টকর। সেসব চুকিয়ে ফেলার পর অরিন্দম বাইরে বেরিয়ে সোনালি রোদ দেখল। আকাশ এত নীল যে চোখ রঙিন হয়ে যায়। দূর বহুদূর বিস্তৃত সাদা বরফের ঢেউ-এ সেই সোনা রোদ এক স্বর্গীয় ছবি এঁকে যাচ্ছে। পরশু যেখানে আলো জ্বলেছিল সেখানে শুধু বরফ। চ্যাটার্জীর হদিশ কোথায় পাওয়া যাবে কে জানে। এখন এই প্রকৃতির দিকে তাকালে কে বলবে গত দুদিন কি মারাত্মক চেহারা হয়েছিল আকাশ বাতাসের। এবং তখনই তার স্যুটকেসটার কথা মনে পড়ল। ওই স্যুটকেস খুঁজতে এসে কয়েকটা প্রাণ চলে গেল। অথচ অনন্ত স্বপ্ন দেখেছিল যে স্যুটকেস খুঁজে পাবে। বুকেব ভেতর দ্রিমি দ্রিমি বাজনা শুরু হয়ে গেল তার। যদি সে খুঁজে পায়। এত কাছে এসে আর একবার চেষ্টা না করে ফিরে যাবে? সে নিজে তো একবারও স্পটে গেল না। বাকি জীবনটা বেঁচে থাকার সময় নিজেকে কি কৈফিয়ৎ দেবে? প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে পেঁছে ওরা তো বিভ্রান্ত হতেই পারে। অরিন্দম মুখ তুলল। সমস্ত মেঘ চেঁছে আকাশটাকে তকতকে করে রাখা হয়েছে এখন। অন্তত একবার ওখানে পেঁছে খুঁজে দেখলে কেমন হয়? ওই রোদ অরিন্দমকে ক্রমশ উত্তেজিত করে তুলল।

সে তাঁবুর ভেতর ঢুকে দেখতে পেল মিসেস সেন দুহাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন। কাছে এগিয়ে গিয়ে সে বলল, 'ভাবছি একবার চেষ্টা করলে কেমন হয়। আবহাওয়া খুব ভাল।'

চমকে মুখ তুলে তাকালেন মিসেস সেন। যেন কথাগুলোর অর্থ বুঝতে পারছিলেন না। অরিন্দম বলল, 'আপনার যদি মনে হয় শরীর পারমিট করছে তাহলে আমার সঙ্গে আসতে পারেন।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মিসেস সেন। দুহাতে অরিন্দমকে জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। ব্যাপারটা এত আকস্মিক যে অরিন্দম কোনক্রমে নিজের শরীরের ব্যালান্স আনতে পারল। মিসেস সেনের চুলের বাস, মুখের ক্রিমের গন্ধ তার নাকে এল। তার দুটো হাত শরীরটাকে জড়িয়ে ধরল। প্রচণ্ড শীতের মোকাবিলা করতে যে পোশাক তারা ব্যবহার করছে তা ভেদ করে হৃদস্পন্দন অনুভব করা অসম্ভব। নারী এবং পুরুষের স্বাভাবিক শারীরিক স্পর্শ থেকেও তারা বঞ্চিত। কিন্তু অরিন্দমের ভাল লাগল। এ যেন আর এক ধরনের উত্তাপ যা হৃদয়কে উৎসাহিত করছিল। হঠাৎ মিসেস সেন মুখ তুললেন, 'আমি, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ'।

দু'হাতে ওঁর গাল স্পর্শ করল অরিন্দম। কিন্তু হাতে গ্লাভস থাকায় ত্বকের ছোঁওয়া পেল না। তারপর প্রায় জোর করেই নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বলল, 'শেষ-পর্যন্ত আমরা তুমি-তে নামলাম। এবার তৈরী হও। দুপুরের পরই ফিরে আসতে হবে।'

মিসেস সেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘাড় কাৎ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুযোগ পেয়েও রিভলভারটা ফেরত নিলেনা?'

'থাক না। পুরুষদের হঠাৎ বিশ্বাস করার কোন কারণ তো ঘটেনি।' অরিন্দম হাসল।

কিন্তু শেরিঙ প্রথমে কিছুতেই রাজী হচ্ছিল না। যতই রোদ উঠুক কিংবা আকাশ নীল হোক, তার মতে গত ঝড়ের পর পাহাড়ের সর্বত্র ফাঁদ পাতা হয়ে গেছে তুষারের। চেনা পথ নইলে বিপদ অনিবার্য। অরিন্দম যখন সাহায্য ছাড়া যাবে বলে ঠিক করল তখন শেরিঙ সঙ্গী হল। পাহাড়ের টান যাদের রক্তে একবার ঢোকে সে কিছুতেই হার স্বীকারের লজ্জা বেশীক্ষণ পেতে চায় না। ঠিক জায়গায় খোঁচা লাগলে বাধাগুলোকে পেরিয়ে যেতে মরীয়া হয়।

শেরিঙ প্রথমে, মিসেস সেন অরিন্দমের আগে। আজ একই দড়িতে তিনজন। নিজেদের ছায়া বরফের ওপর পড়ছে।

মিসেস সেন হেসে বললেন, 'তুমি যে মিথ্যে ভয় পাচ্ছিলে তা এখন বুঝতে পারছ শেরিঙ?'

শেরিঙ উত্তর দিল না। তার চোখ প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলার আগে লাঠি দিয়ে যাচাই করে নিচ্ছে সামনের বরফটা কতটা নির্ভরযোগ্য। মিনিট পনের হাঁটার পর শেরিঙ ওদের দেখাল। দ্বিতীয় তাবুটা এখন কোথাও নেই। শুধু এক ফালি তাঁবুর কাপড় নেতিয়ে পড়ে আছে। অরিন্দম মিসেস সেনের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি ভাগ্যবতী।'

মিসেস সেন বলল, 'নাকি বস। ভাগ্যবতী কথাটা সেইসব মেয়ের কথা মনে করিয়ে দেয় যারা লক্ষ্মীমন্ত। আমি তা নই।'

অরিন্দম চমকে তাকাল। নিজের সম্বন্ধে এমন স্বচ্ছ ধারণা যে এই মেয়ে পোষণ করে তা কে জানত!

ঘড়িতে যখন এগারটা তখন ওরা ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেল। সামনের খাদটা বেশী নিচে নামেনি। হঠাৎ অরিন্দমের নজরে পড়ল একটা কিছু যেন বরফের আস্তরণ ভেদ করে উঁকি মারছে। সে এগিয়ে গিয়ে পা দিয়ে বরফ সরাতে চমকে

এক পা পিছিয়ে গেল। বাকিটা শেরিঙ সাহায্য করলে বসন্তর নীল শরীরটা প্রকাশিত হল। মুখে প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে বসন্ত শুয়ে আছে। মিসেস সেন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন এখন। শেরিঙ বসন্তকে উপুড় করে শুইয়ে দিল। কতদিন ও এভাবে থাকবে ? এই হিম বরফের রাজ্যে বসন্ত তার বিখ্যাত পরিচালক হবার বাসনাকে কি জমিয়ে রাখতে পারবে ?

টুকরো টুকরো জিনিসপত্র বরফের মধ্যে গেঁথে রয়েছে। চালু কোম্পানির কিছু স্যুটকেস শতচ্ছিন্ন অবস্থায় আটকে আছে বরফে। তাদের স্যুটকেস কিংবা ব্রিফকেস এখন কোথায়। মিসেস সেন জিজ্ঞাসা করলেন হতভম্ব হয়ে, 'কি করে খুঁজে বের করব ?'

অরিন্দম হাসল, 'সত্যি কি খুঁজে বের করার চেষ্টা কখনও করেছ ?'

'না। আমি জীবনে কখনও কিছু পেতে এফর্ট দিইনি। অমনি পেয়েছি।

'এবার দাও।'

শেরিঙ শেষ পর্যন্ত একটা পথ বের করল। ডান দিক দিয়ে সামান্য ওপরে উঠতে হবে। খাদ ডিঙ্গিয়ে ভাঙ্গা প্লেনের কাছে পেঁছাতে ঘড়িতে সাড়ে বারোটা বাজল। বিশ গজ দূরে থেকে ওরা ধ্বংসস্তূপ দেখল। এখানে যে হেলিকপ্টার নেমেছিল মৃতদের সরিয়ে নিয়ে যেতে তা আর বোঝার উপায় নেই। প্লেনটা খুব বড় ছিল না। কিন্তু তার অর্ধেক উড়ে গেছে। যা আছে এখন বরফে আটকে তার গায়ে পোড়া দাগ স্পষ্ট। জানা না থাকলে প্লেন বলে চিনতে পারা কষ্টকর। ভাঙচুর হওয়া শরীরটার একটা অংশ খাঁচার মত এখনও বেঁচে রয়েছে। হঠাৎ মিসেস সেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। ওর চিৎকার কানে আসা মাত্র অরিন্দম এগিয়ে গেল কাছে। কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ?'

লাঠি ফেলে দিয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন মহিলা, 'কেন এলাম ? কেন এলাম ?'

'আশায়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়লে ফিরে যাওয়া কষ্টকর হবে।'

'কি হবে ফিরে গিয়ে ? আমার জন্যে, আমার জন্যেই, দু-দুটো মানুষ মরে গেল।' কথাগুলো থরথরিয়ে কাঁপছিল।

শেরিঙ অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখছিল। সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেও ভদ্রমহিলাকে শান্ত করা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত অরিন্দম বেশ জোরে চেঁচিয়ে বলল, 'আমরা এবার ওখানে যাব শেরিঙ ?'

শেরিঙ হাঁটা শুরু করলে দড়িতে টান পড়ল। মিসেস সেন হাঁটতে বাধ্য হলেন ভাঙ্গা প্লেনের টুকরো অংশগুলোর নিচে এখনও অনেক কিছু চাপা রয়েছে

শেরিঙ বলল, 'এটা একদিনের কাজ নয় সাহাব। পুরো ক্যাম্প এখানে তুলে এনে তিন চার দিন ধরে সবাই মিলে খুঁজতে হবে।' বলতে বলতে সে আচমকা থেমে গেল। তারপর আঙুল তুলে অরিন্দমকে দেখাল। একটু দেরিতে বুঝতে পারল অরিন্দম। এইসব ধ্বংসাবশেষ যেন কেউ সরিয়েছে। দীর্ঘ সময় বরফ চাপা থাকার পর নবীন সরানোর দাগ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। হঠাৎ বরফের ওপর বসে পড়ল শেরিঙ। যেন জুতোর ছাপ এখানে ওখানে। তারপরেই সে চিৎকার করে উঠল।

এক রাত্রের তুষার ঝড়ে যেটুকু সাদা হওয়া সম্ভব তাই হয়ে পড়ে আছে স্যুট-কেসটা। ধ্বংসাবশেষ-এর পাশে পড়ে থাকা স্যুটকেসটা তুলে নিল অরিন্দম। এই কোম্পানির স্যুটকেসই ব্যবহার করা হয়েছিল ক্যান পাঠাতে। না খুললে—। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল সে। দুমড়ে মুচড়ে গেছে বস্তুটি। ওপর থেকে পড়েছে বোঝাই যায়। যদি এটাই সেই স্যুটকেস হয় তাহলে আর দেরি করার কি দরকার। শেরিঙ কিছুতেই খুলতে পারছিল না। পকেট থেকে একটা ছোট ছুরি বের করে সে মোচড়ানো অংশটিতে ঢুকিয়ে গর্ত করার চেষ্টা করল। মিনিট তিনেক বাদে ভেতরের ধাতব পদার্থে ছুরি লাগল। বস্তুটা যে চকচকে তা বোঝা গেল উঁকি মেরে।

অরিন্দমের হৃদপিণ্ড যেন গলায় আটকে গেছে আনন্দে। মিসেস সেন অদ্ভুত গলায় বললেন, 'ভাগ্যবান।'

'বুঝতে পারছি না। কিন্তু, কিন্তু, ব্যাপারটা—আমি পাগল হয়ে যাব!' চিৎকার করে উঠল অরিন্দম। শেরিঙ উঠে দাঁড়িয়ে নিজের কোমর থেকে দড়িটা খুলল। তারপর পায়ের চিহ্ন ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল সামনে। অরিন্দম যখন স্যুটকেসটা নিয়ে আবার ব্যস্ত তখন আর্তনাদটা কানে এল। এ এমন এক আওয়াজ যা রক্ত হিম করে দেয়। সে চটপট উঠে সামনে এগোতেই শেরিঙকে বরফের ওপরে পড়ে থাকতে দেখল। জায়গাটা অটুট খাঁচার আড়ালে বলে ওদের নজর যায়নি। অরিন্দম চিৎকার করল, 'শেরিঙ!' উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা শেরিঙের একটা হাত কাঁপল। অরিন্দম আর একটু এগোতেই ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে দেখতে পেল। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। টলে পড়ে যেতে যেতে আবার কোনমতে সামলে নিচ্ছে। এবার ওর হাত ওপরে উঠতে লাগল। এবং অরিন্দম দেখল হাতে ধরা ছুরির গায়ে রক্তের দাগ। কিন্তু ছুরি ছোঁড়ার শক্তি ওর আর নেই। আর তখনই পৃথিবী নাড়িয়ে দেওয়া শব্দ উঠল। কুঁকড়ে গেল লোকটা। এবং একটি শব্দ উচ্চারণ না করে পড়ে গেল বরফে। তখনই পাশে ছুটে এলেন

মিসেস সেন, 'লোকটা আপনাকে খুন করতে যাচ্ছিল। আমি-আমি—।'

মিসেস সেনের হাতের রিভলভারের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ মাথা নাড়ল অরিন্দম। তারপর নিচু গলায় বলল, 'থ্যাংকস।'

'লোকটা কে ?' মিসেস সেন জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর কম্পিত হাত থেকে রিভলভার পড়ে গেল বরফের ওপর।

অরিন্দম জবাব না দিয়ে শেরিঙের কাছে চলে এল। একেবারে বুকের ওপর আঘাত হওয়ায় আর করার কিছু নেই। কিন্তু এখনও চেতনা রয়েছে লোকটার, 'সা-হা-ব !'

ওকে কোনমতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে—। অরিন্দম নিঃশ্বাস ফেলল। যেখানে নিজেদের পক্ষে সহজভাবে হাঁটা অসম্ভব সেখানে—! তাছাড়া হাসপাতাল বলতে গ্যাংটক। সেটা যেন পৃথিবীর ওপারে। কিন্তু শেরিঙের বদলে সে যদি এই খাঁচার কাছে প্রথমে আসতো তাহলে—! এই সময় মিসেস সেন মৃত শরীরটা থেকে ছিটকে সরে এলেন। অরিন্দম এগিয়ে গেল। মুখের আড়াল মুক্ত করতে সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। লোকটা বেঁচে ছিল ? বেঁচে এই দুর্গম জায়গায় পেঁছেছিল ?

ভালবাসা আর লালসা কি চিরকাল এমনি যেকোন অসম্ভবকে সম্ভব করে দেয় ? গত রাতে তাঁবু উড়ে গিয়েছিল বলে তাদের বিশ্বাস ছিল লোকটা জীবিত নেই, সে এখানে এল কি করে ? কিন্তু লোকটা সুস্থ ছিল না। থাকা সম্ভব নয়।

সে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তুমি আমার জীবন ফিরিয়ে দিলে, শোধবোধ হয়ে গেল।'

'ও, ও এখানে কি করে এল ?' মিসেস সেন তখন পাথর।

অরিন্দম নিচু হয়ে ছুরিটা কুড়িয়ে নিল। মিসেস সেন ফিস ফিস করে বললেন, 'এ ছুরি চ্যাটার্জীর নয়।'

জিনিসটা হাতে নিয়ে খাঁচার ভেতর উঁকি মারতেই ঠক্করকে দেখতে পেল। ওর শরীর থেকে গরম পোশাক খুলে নেওয়া হয়েছিল। দুহাত বুকের ওপর ভাঁজ করে লোকটা, সেই শক্তিশালী মানুষটা খাঁচার ছাদের তলায় বরফ বাঁচিয়েও ঠান্ডায় কুঁকড়ে শক্ত হয়ে রয়েছে লোকটা। ওর জ্যাকেট এবং টুপি নিশ্চয়ই চ্যাটার্জীর সাহায্যে এসেছিল, কারণ সেগুলো নিচেই পড়ে আছে। এবং তখনই সোজা হয়ে দাঁড়াল অরিন্দম। ওটা কি ঠক্করের সুটকেস ? সে মনে করতে পারছিল না আসবার সময় ওটাকে বয়ে এখানে এনেছিল কিনা ঠাকুর। তা যদি হয় ! হঠাৎ যেন মাটিতে নেমে এল সে। যে বেলুন ফুলে উঠেছিল তার হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

মিসেস সেন এই সময় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই লোকটা কে ?'

অরিন্দম জবাব দিল, 'আমাদের দলের। কাল জেদ করে এগিয়ে এসেছিল বসন্তর সঙ্গে। এখানে আশ্রয় নিয়েও বাঁচতে পারেনি।' খাঁচার ভেতরে ঢুকে পড়ল অরিন্দম। এবং তখনই সে স্যুটকেসটাকে দেখতে পেল। বাইরে যেটা রয়েছে এটা যেন তার ডুপ্লিকেট। ঠক্করের শরীরের আড়ালে রয়েছে সেটা। ভেতরে আরও অনেক জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে। কোনমতে ভারী স্যুটকেসটা টেনে সরাল অরিন্দম। আবার তার কলজে থরথর করে কাঁপছে। এটাই কি সেই স্যুটকেস। ঠক্কর কি এটাকে খুঁজে বের করেছে ? কোত্থেকে ?

শব্দ শুনে মুখ তুলল অরিন্দম। মিসেস সেন পাগলের মত এলোমেলো হয়ে থাকা জিনিসপত্র খুঁজছেন। খাঁচার ভেতর বলেই এখানে বেশী বরফ জমেনি। অরিন্দম বলল, 'মিথ্যে চেষ্টা করছেন। এটা প্লেনের ক্যারিয়ার। আপনাদের ব্রিফ-কেস নিয়ে ভদ্রলোক সিটে বসেছিলেন। ওটাকে এখানে পাবেন কি করে !'

'তবু— । বলা যায় না— ।' মিসেস সেন খুঁজেই যাচ্ছিলেন।

ছুরিটা নিয়ে প্রাণপণে কিছুক্ষণ চেষ্টার পর একটা পাশ কাটতেই ধাতব পদার্থ দেখতে পেল সে। সঙ্গে সঙ্গে রোমাঞ্চিত হল। এখনও যখন স্যুটকেসের হ্যাণ্ডেলে বিমান কোম্পানির লকেট আটকানো রয়েছে তখন আর সন্দেহ করার কিছু নেই। বাইরেরটা ঠক্করেরই। কেউ স্যুটকেসের ভেতরে আর একটা ধাতব বাক্স নিয়ে প্লেনে উঠবে না। আর ওই বাক্সের ভেতরেই আছে ক্যানগুলো। অত ওপর থেকে নিচে পড়েও যখন স্যুটকেসটা ভেঙে যায়নি তখন ধাতব বাক্সের ভেতরে ক্যানগুলো কেন অটুট থাকবে না ? সেই ক্যানগুলো যার ভেতরে এক্সপোজড নেগেটিভ রয়েছে। যা ল্যাবে গেলে একটি চিরকালের ভাললাগার ছবি বেঁচে থাকবে। এতগুলো মৃত্যু কি কখনও ব্যর্থ হতে পারে ?

অরিন্দম কোনক্রমে স্যুটকেসটাকে তুলে বাইরে নিয়ে এল। তারপরে বুদ্ধি এল মাথায়। শেরিঙ-এর শরীর পর্যন্ত যে দড়ি ছিল, যা সে খুলে রেখেছিল তার বাকি অংশটি ছুরিতে কেটে স্যুটকেসের সঙ্গে বাঁধল। বরফের ওপর দিয়ে ওটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া বয়ে নেওয়ার চেয়ে অনেক বেশী সুবিধেজনক।

কোমরের দড়িতে টান পড়তেই মিসেস সেন চিৎকার করে উঠলেন, 'আঃ।'

অরিন্দমের খেয়াল হল ওঁর কথা। তিনি এখনও ভেতরেই রয়েছেন। সে চিৎকার করে ডাকল। সাড়া এল না। দড়িতে যে টান পড়েছিল তা না বাড়িয়ে সে ভেতরে ঢুকল। হঠাৎ থমকে গেল সে। ভদ্রমহিলা কি নর্মাল ? নর্মাল মানুষ ওভাবে

হাতড়াতে পারে ? সে কাছে গিয়ে পিঠে হাত রাখল, 'চলুন।'

'বলা যায় না—পাব—এখানেই পাব।' বিড়বিড় করলেন মহিলা।

অরিন্দম দুহাতে ওকে তুলে ধরল। মুখের মাথার আবরণ টেনে খুলে ফেললেন মহিলা, 'বড্ড গরম।'

অরিন্দম চমকে উঠল। এই ঠান্ডাতে কি করে গরম লাগছে। সে দৃঢ় গলায় বলল, 'চলুন। দেরি হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যে হয়ে গেলে আমরা পেঁছিতে পারব না।'

আচমকা মুখ তুললেন মহিলা। ঘোলাটে চোখে তাকালেন। তারপরই চোখ বন্ধ করে চুমু খেলেন অরিন্দমের ঠোঁটে। কিন্তু এমন শীতল চুম্বন যে অরিন্দমের মনে হল রক্ত হিম হয়ে যাবে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার ?'

মহিলা বললেন, 'পেয়ে যাব দেখো, আজ না হলে কাল, কাল না হলে পরশু।'

ছিটকে সরে এল অরিন্দম। মহিলা কি পাগল হয়ে গেছেন ? সে দেখল আবার মিসেস সেন বসে পড়েছেন খাঁচার মধ্যে, বসে বিড়বিড় করছেন, 'এখানেই আছে। কই দেখি, না, ওখানে। এই তো, না।'

হঠাৎ অরিন্দম চিৎকার করে উঠল, 'উঠুন, যাবেন তো উঠতে হবে।'

মহিলা মুখ ফিরিয়ে ফিক করে হেসে আবার হাতড়াতে লাগলেন। অরিন্দম আর পারল না। দ্রুত কাছে গিয়ে এক ঝটকায় মহিলাকে টেনে তুলে বাইরে বের করে আনল। আর সঙ্গে সঙ্গে মহিলা জান্তব চিৎকার করে দুহাতে অরিন্দমের মুখ চোখ খিমচে ধরল। যন্ত্রণায় কোন মতে দূরে সরিয়ে নিতে পারল অরিন্দম। মহিলা ততক্ষণে আবার ভেতরে ঢুকে বসে পড়েছেন। ওঁর হাত হাতড়াচ্ছে জিনিসপত্র।

নিঃশ্বাস ফেলল অরিন্দম। কি করবে সে এখন। একটি পাগলকে সঙ্গে নিয়ে এই বরফের পথ হাঁটা মানে মৃত্যুকে ডেকে আনা। কিন্তু ওকে এখানে রেখে যাওয়া মানে—। কয়েক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত রইল সে। জোর করে ওকে নিয়ে যেতে চাইলে স্যুটকেসটাকে ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু স্যুটকেসটাকে কলকাতায় পেঁছে দিতে পারলে! অরিন্দম ধীরে ধীরে দড়িটা ধরে এগোতে লাগল। টান লাগতেই স্যুটকেসটা পিছলে সরে আসছিল। এখন ওটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া ঢের সহজ। অরিন্দম আবার দাঁড়াল। মিসেস সেন ফিরেই তাকাচ্ছেন না। তার হাত আর নড়ছে না। একই জায়গায় বসে শূন্যে হাত তুলে আছেন। আর কয়েক ঘণ্টা। তাপাঙ্ক ইতিমধ্যে নামতে শুরু করেছে।

অনন্ত স্বপ্ন দেখেছিল কেউ যদি পায় তো অরিন্দমই স্যুটকেস পাবে।

সন্ধ্যের আগে তাঁবুতে পে'ছিতে হবে এমন তাগি'দ হাঁটতে হাঁটতে অরিন্দম হাসল। কে বলেছে ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়? হল তো। তারপরেই তার সেই মুখ মনে পড়ল। কত ভোরেই না তাব স্বপ্ন দেখেছে সে। কলকাতায় যে আছে অপেক্ষা করে, নিজেই নিজের চারপাশে অদৃশ্য দেওয়াল তৈরী করে তার কাছে পে'ছি একটু জিরোতে ভীষণ ইচ্ছে হল তার। দ্রুত হাঁটল সে।

স্যুটকেসটা আসছে পেছন পেছন। নাচতে নাচতে। রোদ পড়ে আসছে। বসন্তর শরীরের পাশে পে'ছে একটু থমকে দাঁড়াল অরিন্দম। বিড়বিড় করে বলল, 'বসন্ত, আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমার সৃষ্টি। তুমি এর মধ্যে বে'চে আছ।' আর একটু নামার পর তাঁবুটা ঠাওর কবল সে। সুইচ টিপে নেভানোর মত আলো চলে গেল। এখন ছায়া। অরিন্দম হাঁপিযে পড়ছিল। আরও দ্রুত হাঁটতে হবে। এখনই ঠাণ্ডা ঢুকছে শরীরে এত আড়াল সত্ত্বেও। হঠাৎ হে'াচট খেল সে। স্যুটকেসটা আটকে গেছে বরফের চাঙড়ে। দড়িটা বেশী লম্বা হয়ে গেছে? হাত থেকে সরিয়ে কোমরে বে'ধে নিল সে। তারপর একটু ঘুরে চাঙড়ের দিকে এগিয়ে গেল স্যুটকেসটাকে মুক্ত করতে।

আর তখনই তার পা ভুস করে ডুবে গেল বরফে। হাঁটু, কোমর, বুক। প্রাণপণে সেই চোরা তুষারের হাত থেকে নিজেকে সরাতে চেষ্টা করছিল অরিন্দম। তুষার সরে যাচ্ছে। পিঠ ঘাড় মাথা নেমে যাচ্ছে। হঠাৎ পিছনে গর্তের ভেতর দুলতে লাগল অরিন্দম। দড়ির বাঁধন স্যুটকেসের সঙ্গে থাকায় আর সেটা ওপরের বরফের চাঙড়ে ঢুকে যাওযায এক সময আর নিচে গড়িযে পড়ল না সে। কিন্তু সেই দড়িতে আটক অরিন্দম গর্তের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায প্রাণপণে ওপরে ওঠার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল। তার শরীর অবশ হযে আসছে। ঠাণ্ডা বেড়ে যাচ্ছে ভয়ানকভাবে। কোনমতে সেই অন্ধকার গুহায় ঝুলে থাকা অরিন্দম মুখ তুলল। নীল আকাশের টুকরোটা ক্রমশ কালো হয়ে আসছে।

রহস্য রোমাঞ্চ, প্রেম অথবা ঘৃণায় জড়ানো কাহিনী নিয়ে এ্যাকশন প্যাক ছায়াছবির রিল বুকে নিয়ে স্যুটকেস পড়ে রইল বরফের ওপরে, তুষারের প্রতীক্ষায়।

—শেষ—